বৈপ্লবিক দৃষ্টিতে ইসলাম

শামসুল হক

বৈপ্লবিক দৃষ্টিতে ইসলাম

শামসুল হক

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

বৈপ্লবিক দৃষ্টিতে ইসলাম
শামসুল হক

ইফাবা প্রকাশনা ঃ ২৩/৩
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭·৭
ISBN : 984—06—0296—9

তৃতীয় সংস্করণ
মার্চ ১৯৮৭

চতুর্থ (ইফাবা দ্বিতীয়) সংস্করণ
জুন ১৯৯৪
আষাঢ় ১৪০১
যিলহজ্জ ১৪১৩

প্রকাশক
এম. আতাউর রহমান
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ
কাজী শামসুল আহসান

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ মুনসুর-উদ-দৌলাহ্ পাহ্লোয়ান
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

মূল্য ঃ ৪৬·০০ টাকা

BAIPLOBIC DRISHTITEY ISLAM (Revolutionary Concept of Islam) : written in Bengali by Shamsul Haque and published by Islamic Foundation Bangladesh, Baitul Mukarram, Dhaka-1000.
June 1994

Price : Tk 46·00 ; US Dollar : 2·50

www.pathagar.com

মহাপরিচালকের কথা

বর্তমান বস্তুতান্ত্রিক বিশ্বে ধর্ম ও জীবনকে পৃথকভাবে বিবেচনা করা হয়। এ মতের অনুসারীদের ধর্ম সম্পর্কে ধারণা হচ্ছে—ধর্ম একটি আধ্যাত্মিক বিষয় এবং এটি পরকালের শান্তি অর্জনের পাথেয়। শুধুমাত্র উপাসনাতেই এর সীমাবদ্ধতা। অন্যদিকে জীবন হচ্ছে বাস্তব ও ব্যাপক। এটি সম্পূর্ণরূপে ইহকালীন এবং বস্তু নির্ভরশীল। অর্থাৎ ব্যক্তি জীবন আল্লাহ্‌র আর সমাজ জীবন হচ্ছে রাষ্ট্রের।

ইসলামে এ ধারণা স্বীকৃত নয়। ইসলাম একটি সামগ্রিক সমাজ ব্যবস্থা ও বিধান। একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ইসলাম এমন একটি বিজ্ঞান ও মানব বিধান যা' মানুষের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব—এক কথায় মানব জীবনের ইহকাল ও পরকালের সুষ্ঠু ও সুন্দর সমন্বয় সাধন করে। উপরন্তু, মানব ও প্রকৃতির মধ্যে সমন্বয় সাধন মাধ্যমে ইসলাম মানুষকে সুখ, শান্তি, প্রগতি ও পূর্ণতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে অগ্রসর করিয়ে দেয়। শামসুল হক রচিত 'বৈপ্লবিক দৃষ্টিতে ইসলাম' গ্রন্থে ইসলামের এই বর্ণাঢ্য, কান্তিময় রূপটিই সুন্দররূপে পরিস্ফুট হয়েছে।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ মাধ্যমে গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ জ্ঞানপিপাসু পাঠক সমীপে উপস্থাপন করতে পেরে পরম করুণাময় রাব্বুল আলামীনের নিকট জানাই হাজার শুকরিয়া। আমীন।

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

লেখক পরিচিতি ঃ শামসুল হক জন্মগ্রহণ করেন টাঙ্গাইলের নিভৃত পল্লীতে, এক মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারে এবং কিশোর বয়স থেকেই জমিদার, মহাজন, পুঁজিপতি প্রভৃতি শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হয়ে উঠেছিল তাঁর দৈনন্দিন জীবনে নিত্য সহচর। মজলুম মানবতার প্রতি এ একাত্মতাই যুবক শামসুল হককে একদিন টেনে নামিয়েছিল পাকিস্তান আন্দোলনে। বিপ্লবী মনীষী জনাব আবুল হাশিম বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার পর পূর্ববঙ্গে মুসলিম লীগের বাণীর ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে ঢাকায় লীগের একটা আঞ্চলিক দপ্তর স্থাপিত হয় এবং তরুণ সমাজের অবিসম্বাদিত নেতা শামসুল হককে এই দপ্তরের দায়িত্ব দেয়া হয়। জনাব হক অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সাফল্যের সাথে এ দায়িত্ব পালন করেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর শামসুল হক মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রমুখের সহায়তায় এদেশের সর্বপ্রথম বিরোধী রাজনৈতিক দল "পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ" গঠন করেন এবং সর্বসম্মতি-ক্রমে এর প্রতিষ্ঠাতা-সাধারণ নির্বাচিত হন। এ সময় টাঙ্গাইলে একটি উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে তিনি সরকার দলীয় প্রার্থী জমিদার খুররম খান পন্নীকে বিপুল ভোটাধিক্যে পরাজিত করেন। শামসুল হকের ন্যায় প্রায় কপর্দকহীন রাজনৈতিক কর্মীর এই অভূতপূর্ব বিজয় তাঁর অসাধারণ জনপ্রিয়তারই প্রমাণ বহন করে। যা হোক, এই উপনির্বাচনের ফলাফল ছিলো সুদূরপ্রসারী এবং আওয়ামী মুসলিম লীগের সেই প্রথম দিকের সংগঠনে শামসুল হককে এই বিজয় বিপুলভাবে সহায়তা করেছিল। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনেও শামসুল হক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন

www.pathagar.com

করেন। উনিশশো বায়ন্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দানের অভিযোগে শামসুল হককে গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। দীর্ঘ আড়াই বৎসর পর শামসুল হক যখন কারাগারের বাইরে এলেন, দেখা গেল, তিনি এক কঠিন মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত। অনেকের মতে কারাগারের মধ্যেই দেশের এই দরদী সেবককে একটা দ্বিমুখী ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সুপরিকল্পিকভাবে বিরোধী দলের নেতৃত্ব হতে অপসারণের কাজ সুসম্পন্ন করা হয়।

এর পরের ইতিহাস যেমনি করুণ, তেমনি বেদনাদায়ক। পরবর্তীকালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারে যখন তাঁর দল ক্ষমতায় আসীন, তখন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শামসুল হক সামান্যতম চিকিৎসার অভাবে ঢাকার রাস্তাঘাটে পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং নিঃস্ব, অসহায় অবস্থায় তিলে তিলে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাচ্ছেন। শামসুল হকের শেষ পরিণতি আজও রহস্যাবৃত, তবে শোনা যায় যমুনা নদীর একটা সাধারণ ডিঙ্গি নৌকায় কে বা কারা একদিন তাঁর লাশ দেখতে পায়।

তবে অনেকেই জানেন না, তিনি একজন শক্তিশালী লেখকও ছিলেন। রাজনীতিতে না নামলে তিনি একজন শক্তিশালী লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতেন। 'বৈপ্লবিক দৃষ্টিতে ইসলাম'ই তাঁর একমাত্র রচনা নয়। উনিশশো পাঁচচল্লিশ থেকে বায়ান্নর মধ্যে এদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এবং সংকলনে তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশ পেতো। আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে "মূল দাবী" শীর্ষক যে পুস্তক এই দলের খসড়া মেনিফেষ্টো হিসাবে তিনি পাঠ করেন তারও রচয়িতা ছিলেন তিনি নিজে। এতেও দার্শনিক লেখক হিসাবে তাঁর মৌলিকত্বের প্রমাণ মিলবে। বিভাগপূর্ব আমলে তাঁর লেখা 'ইসলাম দ্য অনলি সলুশন' শীর্ষক একখানি ইংরেজী গ্রন্থ ১৫০, মোগলটুলী, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

তিনি ছিলেন আল্লামা আজাদ সোবহানী ও জনাব আবুল হাশিমের প্রত্যক্ষ ভাবশিষ্য। 'বৈপ্লবিক দৃষ্টিতে ইসলাম' এর অকাট্য প্রমাণ। তবে একজন চিন্তাশীল লেখক হিসাবে তাঁর লেখায় ইমাম গাযালী, শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী, মুজাদ্দিদে আলফেসানী, আল্লামা ইকবাল প্রমুখ মনীষীর প্রভাবও সুস্পষ্ট। ইসলামের সর্বাঙ্গীন জীবনদর্শনের একজন সার্থক রূপকার হিসাবে শামসুল হকের লেখনী ছিল ক্ষুরধার।

'বৈপ্লবিক দৃষ্টিতে ইসলাম' প্রকাশিত হয়েছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকখানি সুধী সমাজে অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করে। বাংলা ভাষায় এর পূর্বে বা পরে আধুনিক যুগের আলোকে ইসলামী জীবনদর্শনের উপর এমন সুলিখিত গ্রন্থ খুব কমই বেরিয়েছে। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন এই মূল্যবান পুস্তখানির চতুর্থ সংস্করণ [ইফাবা তৃতীয়] প্রকাশ করতে পেরে গৌরব বোধ করছে।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

ইসলামের পরিচয়	১
ইসলামের উৎস	১২
ইসলামের শিক্ষা ও জ্ঞান	১৭
ইজতিহাদ ও ইজমা	২৮
আল্লাহ্‌র পরিচয়	৩৯
আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ	৫০
রুবিয়াৎ-এর স্তর	৫৪
আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের বিভিন্ন স্তর	৫৭
ঈমান ও আমল	৬৩
কলেমার রূপ	৬৯
মানুষের কর্তব্যঠ	৮২
সালাত কায়েম	৮৫
যাকাত দান	১১৫
রমযান মাস	১২৯
হজ	১৩২
জিহাদ ও তবলিগ	১৩৫

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলামের পরিচয়

'আরবী শব্দ 'দীন' সাধারণ এবং ব্যাপক অর্থে যেসব কঠোর ও অপরিবর্তনীয় নিয়ম এই সৃষ্টিকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে, সেসবকেই বোঝায়। সমগ্র বস্তুজগত এবং বস্তুজগতের বাইরে ও ভেতরে অন্য সব জগতও এসব কঠোর ও অপরিবর্তনীয় নিয়ম দ্বারাই পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। বিশেষভাবে এটা স্রষ্টা ও প্রকৃতির সেসব নিয়মকে বোঝায়, যা মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ উভয় জীবনকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। সংস্কৃত শব্দ 'ধর্ম'- বোধ প্রায় আরবী দীন শব্দের সম অর্থবোধক। সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহে ও দ্বিধাহীন চিত্তে দীন পালন করার নির্দেশ দিয়ে পবিত্র কুরআন শরীফে দীনকে আল্লাহ্‌র ফিতরৎ বা প্রকৃতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আরও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র ফিতরৎ দিয়েই মানুষকে সৃজন করা হয়েছে। অন্যত্র দীনকে আল্লাহ্‌র 'সুন্নাহ্' বা নিয়ম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সবশেষে অবতীর্ণ আয়াতে মানুষ এবং জীনকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, 'আজ তোমাদের দীনকে পূর্ণ এবং ইসলামকে তোমাদের দীন সাব্যস্ত করলাম।' পবিত্র কুরআন মানুষ ছাড়া জীনকেও নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু জীন সম্পর্কে এখনও বস্তুজগৎ ওয়াকিফহাল নয়। জীন আগুন হতে সৃষ্ট।'

দীন

দীন সমগ্র বিশ্ব ও সৃষ্টিকে পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং ভৌতিক বা আধ্যাত্মিক অথবা সৃষ্টির কোন অংশবিশেষ কোনক্রমেই দীনের প্রভাবমুক্ত হতে বা এর আওতার বাইরে টিকতে পারে না। এই অবিচ্ছিন্ন এবং গোটা বিশ্ব সৃষ্টির বিভিন্ন প্রকারের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর স্বাধীন অংশের সমষ্টি নয়। সৃষ্টির ভেতর যত রকমের স্বতন্ত্র দ্রব্য, বিষয়, জাতি ও শ্রেণী আছে, দীন অর্থাৎ স্রষ্টার ও প্রকৃতির নিয়ম ততভাগে বিভক্ত করা চলে না। একের সাথে আর সম্পূর্ণ অবিচ্ছিন্ন। সৃষ্টির ক্ষুদ্রতম শ্রেণী, দ্রব্য বা বিষয় হতে শুরু করে বৃহত্তম শ্রেণী, দ্রব্য বা বিষয় প্রধানত কোনো বিশেষ এবং সুনির্দিষ্ট ঐশ্বরিক ও প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এর প্রত্যেকটিই একটি বিজ্ঞান। দীনের যে অংশ গ্রহ ও তারা নিয়ন্ত্রণ করে, তা খগোল-বিজ্ঞান, যে অংশ

www.pathagar.com

গাছপালা নিয়ন্ত্রণ করে তা উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, জীব- বিজ্ঞান এবং ভূ-বিজ্ঞান ভূমিকে নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং দীনের যে অংশ মানুষকে নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবিত করে এবং মানুষের ভবিষ্যত নির্ধারণ করে তা অবশ্যই বিজ্ঞান। পবিত্র কুরআনে এই বিজ্ঞানকেই ইসলাম বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

বর্তমানে ধর্ম অর্থে কতকগুলি ধর্মমত ও নীতিতে অন্ধ বিশ্বাস এবং আনুষ্ঠানিক উপাসনা বোঝায়। এর সাথে মানুষের বাস্তব এবং বস্তু জীবনের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু বর্তমান সভ্যজগত ধর্ম সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে ধর্ম সম্পর্কে ইসলামের ধারণা তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র। আধুনিক অর্থে ধর্ম হলো সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যাপার এবং এটা শুধু আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব এবং তাঁর সাথে মানুষের সম্পর্ক নিয়েই ব্যস্ত ও সীমাবদ্ধ। মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক এবং মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য ধর্মের আওতার বাইরে। বর্তমান বস্তুজগত হতে সম্পর্কহীন ধর্ম নিছক পারলৌকিক এবং ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও চিন্তাভাবনার ব্যাপার। 'ইহকাল রাষ্ট্রের উপর এবং পরকাল ধর্মের উপর ন্যস্ত—ব্যক্তি জীবন স্রষ্টার এবং সমাজ জীবন রাষ্ট্রের।'—ধর্মের এরূপ ধারণা এবং অর্থই এখন বিশেষ প্রচলিত এবং সার্বজনীন।

ইসলাম

ধর্মের এই অর্থ সাফল্যের সাথে ধর্মের ইসলামী অর্থকে সভ্যজগতের দরবার হতে বিতাড়িত করেছে। ধর্মে অবিশ্বাস ধর্ম সম্পর্কে এই প্রচলিত অর্থ হতেই উদ্ভূত। ধর্মের এই সাধারণ ও প্রচলিত অর্থে ইসলাম ধর্ম নয়। ইসলাম একটি সামগ্রিক মানব সমাজ ব্যবস্থা এবং জীবনের একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি। এটা এমন একটি বিজ্ঞান এবং জীবন-বিধান যা মানুষের আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক এবং ইহকাল ও পরকাল, এক কথায় মানব জীবনের সবদিকের সুষ্ঠু ও সুন্দর সমন্বয় সাধন করে। ইসলাম মানুষ এবং তার প্রকৃতির ভেতর সমন্বয় সাধন করে এবং মানুষকে সুখ, শান্তি, প্রগতি ও পূর্ণতা প্রাপ্তির দিকে এগিয়ে দেয়। ইসলামের সত্যিকার জ্ঞান এবং মানব জীবনের প্রতিক্ষেত্রে এর বাস্তব প্রয়োগ মানুষের চিরন্তন সুখ, শান্তি, কল্যাণ ও মুক্তি নিয়ে আসে এবং আদর্শ সভ্যতা ও মানবগোষ্ঠী গড়ে তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু ইসলাম অন্যান্য মতবাদের ন্যায় মানুষকে নিজের খুশি মত গড়ে না তুলে, স্রষ্টার ইচ্ছা এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি অনুসারেই গড়ে তোলে। কারণ শুধু মানুষের তৈরী উপায় ও পদ্ধতি দ্বারা মানব জীবন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা কোনক্রমেই সর্বাঙ্গীন

www.pathagar.com

সুন্দর হতে পারে না।

অপর দিকে বস্তুবাদ মানুষের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা হতে প্রেরণা ও জ্ঞান লাভ করে মানব জীবনের বৈষয়িক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য শুধু বৈষয়িক সমস্যার সমাধান করে এবং মানব জীবনে আধ্যাত্মিক বিকাশ ও প্রকাশকে সম্পূর্ণ অস্বীকার ও অবহেলা করে। বস্তুবাদের স্বাভাবিক পরিণতি দুটি—পুঁজিবাদ ও মার্কসবাদ। পুঁজিবাদ ব্যক্তিকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে এবং ধনতান্ত্রিক ও শোষণমূলক সমাজব্যবস্থা কায়েম করে। মার্কস্‌বাদ জীবনের ব্যক্তিকেন্দ্রিক পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি এবং ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতি-উপপাদ্য হিসেবে মানবজাতির উন্নতি, প্রগতি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাসে বিপ্লব সাধন করেছে বটে, কিন্তু এটাই পূর্ণ ও চূড়ান্ত নয়, হতেও পারে না। মানুষের শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সীমাবদ্ধ। সুতরাং মার্কসীয় পদ্ধতি ও সমাধানের ভুলত্রুটি থাকা খুবই স্বাভাবিক। ফলে মার্কস্‌বাদ যে-ধরনের মানবগোষ্ঠী গড়ে তুলবে তা আপাত-দৃষ্টিতে খুব সুখ, শান্তি ও কল্যাণের দিকে অগ্রগতি বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা তার মানব-স্রষ্টার ইচ্ছা অনুসারেই গড়ে ওঠে। বস্তুত এটা পূর্ণতা-প্রাপ্তির দিকে স্বাভাবিক এবং সত্যিকার ক্রমবিকাশ নয়। মার্কস্‌বাদ তাদের পর্যবেক্ষণ প্রকৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে।

ইসলাম এ উপায়ের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেও এর প্রেরণা, শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও পরিপক্ক জ্ঞানের জন্য আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে। ইসলাম আধ্যাত্মিক এবং বৈষয়িক সমস্যাকে সমান চোখে দেখে, একের চেয়ে অপরকে বেশি গুরুত্ব দেয় না এবং মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সব সমস্যার সমাধানে উভয়বিধ উপায় এবং পদ্ধতিরই সাহায্য নেয়। খৃস্ট ধর্মের ন্যায় সম্পূর্ণ অধ্যাত্মবাদ এবং মার্কসবাদের ন্যায় সম্পূর্ণ বস্তুবাদ পৃথকভাবে এর কোনটাতেই ইসলাম বিশ্বাস না করে উভয়ের সমন্বয় সাধন করে। বস্তুত একটি হতে অপরটি সম্পূর্ণ অবিচ্ছিন্ন। এটাই প্রকৃতি। প্রকৃতি কারুর নামের অপেক্ষা না করে কাজ করে চলেছে। মানুষ প্রকৃতি হতে দূরে সরে যেতে এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করারও চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু প্রকৃতি তার কাজ করেই যাবে। আর প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে নিষ্ঠুর প্রকৃতি কঠোর শাস্তি বিধান করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করে না। ফলে মানুষ নিত্যনতুন সংঘাত ও সমস্যার ভেতর দিয়ে মানব জীবনে ডেকে আনে দুর্বিষহ দুঃখকষ্ট ও দুর্গতি। প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করে মানুষ যদি

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র সৃষ্টি প্রকৃতি বা নিয়মের সাথে সম্পূর্ণ সমন্বয়সাধন করে চলত তাহলে কতই না সুন্দর হত !

বস্তু সমস্যার সমাধান যেমন বৈজ্ঞানিক উপায়ে করার চেষ্টা করা হচ্ছে, তেমনি আধ্যাত্মিক জগতকে স্বীকার করে ইসলাম বৈজ্ঞানিক উপায়ে তার প্রমাণ ও সমাধান করার চেষ্টা করে । রূহ্ দেহকে প্রভাবান্বিত করে । আবার দেহ রূহ্‌কে প্রভাবান্বিত করে । কাজেই দু'টিকে পাশাপাশি উন্নত ও বিকশিত করতে হবে । একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি পূর্ণ উন্নত ও বিকশিত হতে পারে না । একটিকে অস্বীকার করলেই তা উড়ে যাবে না, যেতে পারে না । তা থেকেই যাবে ।

এই মহাসত্য সম্পর্কে সম্যক ও সত্য জ্ঞান না থাকার দরুনই দেহ ও রূহ্, জড় ও চৈতন্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পাশ্চাত্য দার্শনিক ও পণ্ডিতগণ মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন । যাঁরা চৈতন্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন, তাঁরা অধ্যাত্মবাদী বা ভাববাদী, আর যাঁরা জড়কে প্রাধান্য দিয়েছেন তাঁরা জড়বাদী বা বস্তুবাদী ।

ভাববাদীরা বলেন ঃ এই বস্তুজগতের কোন প্রকৃত সত্তা নেই । আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাইরে আর একটা অশরীরী ভাবজগত আছে, বস্তুজগত তারই রূপান্তর মাত্র । যা কিছু আমরা বাইরে বস্তুজগতে ঘটতে দেখি তা আগেই আমাদের মনের গভীরে ঘটে । আমাদের মনে যা ঘটে তা-ই বাইরের জগতে রূপ পায় । কাজেই, সমস্ত ঘটনারই মূল কারণ ও উৎস থাকে আমাদের মনে । বাইরের জগতে কোথাও কোন বিপর্যয় দেখলে ভাবতে হবে, এ বিপর্যয় আগেই আমাদের মনে এসেছে । এক কথায় মনের ধারণা বা ভাবই হচ্ছে সত্য, বস্তু তার ছবি মাত্র । কোন সুদূর হতে ধ্যান, ধারণা ও ভাবের লীলাখেলা বিশ্ব প্রকৃতির চিত্রপটে ছায়া ফেলেছে ; তারই ফলে এ দৃশ্যজগত আমাদের নয়নকোণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে । আমরা শুধু ছায়াচিত্রই দেখছি, আসল বস্তু দেখছি না । আসল বস্তুটি কি আমরা জানি না, বস্তুর আসল সত্তা অজ্ঞেয় । আমাদের ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের অতীতে আছে সেই ধ্রুবলোক । কাজেই বস্তুজগত মায়াময়, আর ধ্যান-জগতই একমাত্র সত্য ।

ভাববাদ

বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক ক্যান্ট ছিলেন এই মতাবলম্বী । ধ্যান, ধারণা বা ভাবকেই তিনি মুখ্য বলে মনে করতেন, বস্তুকে দিতেন তিনি গৌণ স্থান । এর জন্যই তাঁর দর্শনকে অধ্যাত্মবাদ বা ভাববাদ বলে ।

www.pathagar.com

হেগেল এই মতকে আরো উন্নত ও পরিবর্ধিত করে বলেন যে, আমাদের জ্ঞান জন্মে দ্বন্দ্বমূলক ধারণা হতে । সমস্ত ধারণাই দ্বন্দ্বমূলক । প্রতি ধারণার মাঝে তার বিরুদ্ধ ধারণাটিও নিহিত থাকে । এই পরস্পরবিরোধী ধারণার মাঝে প্রতিনিয়ত সংঘর্ষ চলে এবং পরিণামে উভয়ের মাঝে একটি সমন্বয় হয় । কোনো ধারণাই বিচ্ছিন্ন অবস্থায় নেই । কাজেই কোনো বিষয়ে ধারণা করতে গেলেই তার সঙ্গে তার বিপরীত ধারণাটিও আমাদের মনের গভীরে জেগে ওঠে । সুখ বললেই দুঃখের, আলো বললেই অন্ধকারের ধারণা সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মনের ভেতর জাগে। ধারণায় ধারণায় এই যে বিরোধ ও সংঘর্ষ এবং পরে পরস্পরের মাঝে সমন্বয় একেই বলা হয়েছে ডায়লেকটিক বা দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি । ডায়লেকটিক শব্দটির মূল অর্থ বিতর্ক। গ্রীক দার্শনিকরা বলতেন ঃ বিতর্ক দিয়েই সত্য আবিষ্কার ও প্রমাণ করা যায় । দুপক্ষ যখন তর্ক করে তখন দু'পক্ষেরই মতামত তর্কের ভেতর দিয়ে বদলাতে থাকে, অবশেষে নতুন আবিষ্কৃত হয় । মতের বিরোধ হতে এভাবে নতুন তত্ত্বের উদ্ভব হয় ।

হেগেল এই পদ্ধতিকেই গ্রহণ করে বললেন, ধারণাসমূহ এ উপায়ে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয় এবং এই ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে বস্তুজগতেও পরিবর্তন ও পরিবর্ধন আসে। আমাদের বস্তুজগতের পরিবর্তন ও বিকাশ তাই আমাদের বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত সেই বৈষম্য ও পরস্পর বিরোধী শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতেরই ফল । সুতরাং হেগেল ডায়লেকটিককে কেবল মনোগত রাখলেন না । ডায়লেকটিক বিরোধ প্রকৃতি-জগতে, মানুষের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে সর্বত্রই আছে । তাহলে দেখা যাচ্ছে, মানব ইতিহাসে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা অন্য যেকোনো পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে, হেগেলের মতে তার মূল কারণ রয়েছে মনে বা ধারণায় । ধ্যান-ধারণা বা চিন্তা-ভাবনার ওলট-পালটের ফলেই সমাজ ও রাষ্ট্রে ওলট-পালট দেখা দিচ্ছে। দুনিয়ার সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহ ও বিপ্লব মানুষের ধ্যান-ধারণা বা চিন্তাভাবনার পরিবর্তন বা বিকৃতিরই ফল । এক কথায় বস্তুজগত মনোজগতেরই একখানি প্রতিবিম্ব মাত্র । সুতরাং হেগেলের বস্তুজগত মূলত বস্তুজগতই নয়, সার্বজনীন প্রজ্ঞার প্রকাশমাত্র । এর জন্য হেগেলের ডায়লেকটিকও মূলত মনের উপর নির্ভরশীল । এটাই হলো ভাববাদীদের কথা ।

www.pathagar.com

পক্ষান্তরে জড়বাদীরা বলেন ঃ ধারণা বলে স্বতন্ত্র কিছুই নেই । বস্তুই আসল সত্য, ভাব নয় । বস্তু হতেই ধারণা, ধারণা হতে বস্তু নয় । আগে বস্তু, পরে ভাব । ভাব বলে স্বতন্ত্র কিছুই নেই । বস্তুই উন্নত অবস্থায় চিন্তা বা মননশক্তি লাভ করে । বস্তু মনের সৃষ্ট নয়, মনই হলো বস্তুর সৃষ্ট । কাজেই এই দৃশ্যমান জগতের পেছনে যে অজ্ঞেয় কোনো রহস্যলোক বা অশরীরী কোনো ধারণা থাকতে পারে, জড়বাদীরা তা স্বীকার করেন না । এই বিশ্ব-জগতকে তারা প্রকাণ্ড একটি মেশিন মনে করেন । এমনকি মানুষও তাদের কাছে একটা মেশিন ছাড়া আর কিছুই নয় । জড়বাদীর কাছে তাই আল্লাহ্‌র স্থান নেই । যেকোনো ব্যাপারকেই যন্ত্রবিজ্ঞানের আলোকে তাঁরা ব্যাখ্যা করতে পারেন, এটাই তাঁদের বিশ্বাস।

জড়বাদ

এই জড়বাদের সাথে মার্কস্ হেগেলের ডায়লেকটিক পদ্ধতি জুড়ে দিয়ে বললেন ঃ জড় জগতের সবকিছুই ডায়লেকটিক পদ্ধতিতে সংগঠিত হচ্ছে। বিচ্ছিন্ন অবস্থায় একা কোন ঘটনা ঘটছে না । কোন ঘটনা বুঝতে হলে তাই তার পরিবেশকেও বুঝতে হয় । বস্তুজগতের সবকিছু পরস্পর নির্ভরশীল—একের সাথে অপরের সম্পর্ক রয়েছে । বস্তুজগতের মাঝে পরস্পর-বিরোধী শক্তি আছে । এই বিরোধী শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত, সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের ফলেই পরিবর্তন হচ্ছে এবং বস্তুজগত বিকাশ লাভ করছে । সংঘাত ও সংঘর্ষ তাই দোষের নয়, এটা বিকাশেরই ধর্ম । যে কোন ঘটনা বা বস্তু তার বিপরীতধর্মী বৈষম্যকেও সঙ্গে নিয়ে আসে। একটা কিছু ঘটলে বুঝতে হবে তার বিপরীতটিও এর ভেতর নিহিত আছে । এই আত্ম-দ্বন্দ্বের ফলেই একবস্তু অপর বস্তুতে রূপান্তরিত হয় । জগতের সব দ্বন্দ্ব কোলাহল ও যুদ্ধবিগ্রহ এই সংঘাত সংঘর্ষ ও সমন্বয়েরই ইতিহাস। সবকিছুর মূলে যে সত্যই একটা দ্বিত্বভাব আছে, একথা মিথ্যা নয় । ইসলামও একথা স্বীকার করে । পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ "সেই আল্লাহ্‌র মহিমা যিনি জগতে যা কিছু উৎপন্ন হয় এবং যা তারা (মানুষ) জানে না—এমন সব বস্তুর প্রত্যেকটিকেই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন ।"

মার্কস্‌বাদ

'এটাই হলো জগৎ সৃষ্টি সম্পর্কে ইসলামের কথা । সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, হ্যাঁ-না, আলো-আঁধার, দিবা-রাত্র, আকাশ-পৃথিবী, স্বর্গ-নরক—ইত্যাদি প্রত্যেক জিনিসই এইরূপ জোড়া বাঁধা । শুধু বাইরের চোখে নয়, পদার্থের মূলেও বৈজ্ঞানিকরা দেখতে পান—এই দ্বৈতভাব । যাঁরা বলেন ঃ

www.pathagar.com

সমস্ত পদার্থের মূলে আছে দুই প্রকার বিদ্যুৎঃ ইলেকট্রোনস্ এবং প্রোটনস্ । ইলেকট্রোন ঋণাত্মক বা না-মূলক বিদ্যুৎ, আর প্রোটন হলো ধনাত্মক বা হ্যাঁ-মূলক বিদ্যুৎ । এদের স্ত্রী-পুরুষ বিদ্যুৎও বলা যেতে পারে । প্রত্যেক বিদ্যুৎ কণিকায় এই দুই বিপরীতধর্মী বিদ্যুতের মিলন বা সমন্বয় দেখতে পাওয়া যায় । সেখানে কেউ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় নেই—জোড়ায় জোড়ায় মিশে আছে । সুতরাং সংঘাত ও সমন্বয়ের কথা মিথ্যাও নয়, নতুনও নয় ।

পরস্পর বিরোধী বস্তু বা ধারণার ভেতর শুধু যে সংঘর্ষই চলছে তা নয়, সংঘাত ও সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে একটা ঐক্যের সুরও বেজে উঠছে । অসঙ্গতি, বিরোধ, বৈচিত্র্য ও বৈষম্যের ভেতরে তাই আছে একটা সঙ্গতি, মিলন ও সমন্বয় । এই যে হ্যাঁ-না, এর ভেতর সমন্বয়, একেই মার্কস্ 'থিসিস্', 'এন্টি-থিসিস্', ও 'সিন্থিসিস্' অর্থাৎ প্রস্তাবনা বা সঙ্গতি, বৈপরীত্ব বা অসঙ্গতি এবং সমন্বয় বলে ব্যাখ্যা করেছেন । তবে মার্কসের ডায়লেকটিক মূলত বস্তুজগতের, মনোজগতের নয় । তিনি বলেন ঃ বস্তু-নিরপেক্ষ, ধারণাজগত বলে কিছুই নেই, ওটা মনের খেয়াল মাত্র । বস্তু ছাড়া আর কোন কিছুই সত্য নয় । মার্কসের এই সিদ্ধান্ত একথাই প্রমাণ করে যে, তিনি ও তাঁর সমসাময়িক এবং পূর্ববর্তী অন্যান্য ইউরোপীয় দার্শনিকের দু'টি বিপরীত মতকে এক করতে পারেননি । এক কথায়, চিরন্তন সংঘাত ও সংঘর্ষের মূলসূত্র ধরে তার চিরন্তন সমন্বয় বা সমাধান তিনি দিতে পারেননি । কারণ জড়ের বিপরীত হলো চৈতন্য, জড় ও চৈতন্যের সমন্বয়ই হলো আমাদের জীবন । এর একটি বাদ দিয়ে অপরটিকে উন্নত ও বিকশিত করা চলে না । একটি হতে অপরটি বিচ্ছিন্ন নয় এবং একটি নেই বললেই তা উড়ে যাবে না—একথা আগেই বলেছি । কাজেই, শুধু জড় অথবা শুধু চৈতন্য এর কোনোটির উপর ভিত্তি করে আমাদের জীবনকে দাঁড় করাতে গেলে ডায়লেকটিক পদ্ধতির সবকিছুই নড়চড় হয় । জড় ও চৈতন্যের ভেতর সমন্বয় খুঁজে বের করতে অক্ষম হয়ে অন্যান্য বস্তুবাদীর ন্যায় মার্কস্ শুধু বস্তুকেই গ্রহণ ও পরীক্ষা করেছেন, চৈতন্যকে একদম উড়িয়ে দিয়েছেন ।

তাছাড়া আরো একটি দিক বিবেচনা করলে দেখা যাবে—মার্কস্ মানবজীবনের চিরন্তন সংঘাতের সত্যিকার সমন্বয় বা সমাধান দিতে পারেননি । শুধু জড় জগতে তাঁর দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ প্রয়োগ করলেও তাঁর মতবাদের অন্তর্নিহিত দোষ ধরা পড়বে । বস্তুবাদীর মনোভাব দু'রকমের ঃ

www.pathagar.com

আত্মকেন্দ্রিক ও সমাজকেন্দ্রিক । আত্মকেন্দ্রীয় বস্তুবাদী মনোভাবের বাইরের প্রকাশই আমরা সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার ভেতর দেখতে পাই । সমাজকেন্দ্রিক বস্তুবাদী মনোভাবের চরম পরিণতিই হলো মার্কস্‌বাদ । এই বিপরীত মনোভাব এবং সমাজবিধানের কোন সমন্বয় মার্কস্ দিতে পারেননি । আত্মা এবং আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবকে অস্বীকার করে মার্কস্ মানুষের ব্যক্তিগত অধিকারকে হরণ করেছেন । মার্কস্‌বাদের চাপে পড়ে মানুষ হবে একটা যন্ত্র বিশেষ । যন্ত্র-যুগের চরম পরিণতি মার্কস্‌বাদ তাই মানুষকে মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে না ।

বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন জাতি ও পরিবেশের ভেতর যেসব সমস্যা ও সংঘাত মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় তার সমাধানকল্পে যেরূপ নতুন নতুন সমাধান, মতবাদ ও ধর্ম গড়ে উঠেছে মার্কস্‌বাদও তেমনি একটি মতবাদ । পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ, ফ্যাসিবাদ, নাৎসীবাদ, সমাজবাদ ইত্যাদি সমস্ত মতবাদই খণ্ড খণ্ড রূপে কোন না কোন সমস্যার সাময়িক সমাধান মাত্র । সমস্ত খণ্ড সমাধানের ভেতরও আবার বিরোধ ও বৈষম্য আছে । মার্কস্‌বাদও এরূপ একটি সাময়িক সমাধান । আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব এবং এর স্বাভাবিক পরিণতি সাম্রাজ্য-বাদী ও পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার প্রতি-উপপাদ্য বা বিপরীত সমাধান হিসেবে মার্কস্‌বাদ মানব কল্যাণকর, কিন্তু এটাও সাময়িক । এটা পূর্ণ ও চূড়ান্ত নয় । বস্তুত মার্কস্ তাঁর প্রবর্তিত মত ও পথকে পূর্ণ ও চূড়ান্ত বলে দাবিও করেননি ।

জগত জুড়ে আজ যেসব সমস্যা নানারূপে দেখা দিয়েছে প্রত্যেক দেশ ও জাতি সেসব সমস্যার সমাধান খুঁজে ফিরছে, কিন্তু পথ খুঁজে পাচ্ছে না ; কেউ একটা সুষ্ঠু ও সুন্দরতম সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধান বা সমাধান দিতে পারছে না । প্রকৃত রোগ নিরূপণ করে ওষুধ দিতে না পারলে যেমন রোগী আরোগ্য লাভ করে না, জগতের অবস্থাও ঠিক তাই হয়েছে । আসল একটা রোগ তার অন্তরে রয়েছে, তার নানা লক্ষণ নানাভাবে নানা অঙ্গে প্রকাশিত হচ্ছে। আনাড়ি ডাক্তারদের ন্যায় মানুষ তার সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে এর একটি সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে আরেকটি নতুন সমস্যার সৃষ্টি করছে । কেউ সত্যিকার সমাধান দিতে পারছে না । অভিজ্ঞ ডাক্তার যেমন সুনির্বাচিত এক ফোঁটা ওষুধ দিয়ে রোগের সব উপসর্গকে উপশম করেন, ইসলামও ঠিক তেমনি একটি সমাধান দিয়ে চিরন্তন সংঘাত ও বৈষম্যের চিরন্তন শান্তি বা সমন্বয় সাধনের পথ নির্দেশ করেছে ।

www.pathagar.com

ইসলাম বৈজ্ঞানিক উপায় ও পদ্ধতি স্বীকার করে এবং তার সাথে সাথে স্রষ্টার উপায় ও পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করে ; কারণ মানুষের গড়া বৈজ্ঞানিক উপায়, পদ্ধতি ও সমাধান চরম সত্য এবং পরিপূর্ণ হতে পারে না । ইসলাম বিশ্বপালনের বৈজ্ঞানিক ও বস্তুবাদী উপায় ও পদ্ধতির সাথে আল্লাহ্‌র উপায় ও পদ্ধতির এবং মানুষের মনের ও সমাজের ভেতর অহরহ বিপরীতমুখী গতি ও প্রবৃত্তির যে লড়াই হচ্ছে তার সমন্বয় সাধন করে । সমন্বয়েই শান্তি । অতএব সৃষ্টির শেষ উদ্দেশ্য শান্তি—চিরন্তন শান্তি একমাত্র ইসলামই আনতে পারে । তাই তার নাম ইসলাম, শান্তির ধর্ম ।

কার্লমার্কস্ এবং ফ্রেডারিক এঙ্গেল্‌স্ সন্দেহাতীতরূপে মানুষের চিন্তা-জগত এবং কর্মক্ষেত্রে বিপ্লব সাধন করেছেন । মানব ক্রমবিকাশের ইতিহাসে তাদের প্রভাব এবং গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই । কিন্তু ধর্মের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে হলে ধর্ম অর্থে মার্কস্ কি বুঝেছিলেন তা খুব সাবধানতার সাথে পর্যালোচনা করা উচিত । এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, ধর্ম সম্পর্কে প্রচলিত সাধারণ অর্থেই কার্লমার্কস্ ধর্মকে অস্বীকার করেছেন । ধর্মের প্রচলিত অর্থ যে বস্তুজগত এবং মানুষের প্রগতিশীল ও কল্যাণকর প্রচেষ্টা বর্জিত সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিকতা—একথা আগেই বলা হয়েছে । ধর্মের সাথে ইহকাল, বস্তুবাদ এবং মানুষের দৈহিক ও দৈনন্দিন জীবনের সম্পর্ক তাঁর জানা ছিলো না । খৃষ্টান প্রভাবান্বিত পাশ্চাত্য জগতে তিনি ধর্ম ও রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ পৃথক ও বিচ্ছিন্নভাবে জনসাধারণের শোষণের যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হতে দেখেছিলেন । রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের মারফত এবং ধর্ম সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিকতার নামে জনসাধারণকে শোষণ করত । তাই কার্লমার্কস্ সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ ও অধ্যাত্মবাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন । মানুষের দৈহিক ও দৈনন্দিন জীবনের সাথে সম্পর্ক বর্জিত ধর্মের প্রয়োজনীয়তা মানবজীবনে অস্বীকার করে কার্লমার্কস্ নতুন কিছু করেননি । কারণ আরবী শব্দ 'রূহ্‌বানিয়া' অর্থ হলো—পার্থিব এবং বাস্তবজীবন বর্জিত সম্পূর্ণ পারলৌকিকতা বা বৈরাগ্য । ইসলাম জীবনের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে মোটেই সমর্থন করে না । রসূলে করীম (সা) বলেছেন ঃ 'লা রূহ্‌বানিয়া ফিল্ ইসলাম'—ইসলামে বৈরাগ্য নেই । কুরআনের দীন শব্দকে ইংরেজি 'রিলিজিয়ন' শব্দে তর্জমা করা সম্পূর্ণ ভুল । ইংরেজি 'রিলিজিয়ন' শব্দের

www.pathagar.com

সঠিক আরবী তর্জমা হলো 'রূহ্‌বানিয়া' । সুতরাং এটা নিঃসন্দেহ বলা যেতে পারে যে, আধুনিক অর্থে ধর্মকে ইসলাম সাড়ে তেরশো বছর আগে অস্বীকার করেছে । ইসলামে বৈরাগ্য নেই । অন্য কথায়, ইহজগতকে অস্বীকার করে কেবল পরজগত নিয়ে ইসলামের কারবার নয় । সত্যিকার ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্ম অর্থ হলো ইহকাল ও পরকাল, বস্তুবাদ ও অধ্যাত্মবাদ এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সমন্বয় । ইসলাম এর কোনটাকেই অস্বীকার করেনি ; একের সাথে অপরের সমন্বয়সাধন করেছে । অধ্যাত্মবাদ ও বস্তুবাদ উভয়ের উগ্রতা ও চরম মাদকতাকে অস্বীকার করে, ইসলাম মানবজীবনের সব সমস্যা ও সংঘাতের এমন এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন করে যার তুলনা আর কোন ধর্ম বা মতবাদে নেই ।

এখন নিঃসন্দেহে একথা বলা যেতে পারে, যাঁরা অন্ধ মার্কস্‌বাদী, যাঁরা মনে করেন মার্কস্‌বাদ অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁরা ভ্রান্ত । ইসলাম সম্পর্কে সম্যক ও সত্যজ্ঞান না থাকার দরুনই তাঁরা এ দাবি করেন । তাঁদের এই ভ্রম সংশোধন করে ইসলামী আদর্শকে পুরোপুরি স্বীকার না করলে এ কখনো সম্পূর্ণ হবে না । মার্কস্‌বাদ যখন আল্লাহ্‌ এবং ইসলামকে মেনে সব দ্বন্দ্ব ও বৈষম্যকে মিলিয়ে ইসলামের আলোতে আলোকিত হয়ে সবার ভেতর একটা সুষ্ঠু, সুন্দর সাম্য ও সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হবে সেদিনই সেটা পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে ; আর তখনই আসবে প্রকৃত সাম্যবাদ ।

জ্ঞাতসারেই হোক অজ্ঞাতসারেই হোক, মার্কস্‌বাদ ইসলামের পথেই অগ্রসর হচ্ছে। ইসলামের মূলমন্ত্র "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্‌" । মুসলমানকে সকলের আগে বিশ্বাস করতে হয়, আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই । মার্কস্‌বাদীরা ঈশ্বরকে একদম উড়িয়ে দিয়েছে । কোনো ঈশ্বর নেই, এটাই তাদের মত । ইসলামের মূলমন্ত্রের না-মূলক অংশটুকু অর্থাৎ 'লা-ইলাহা' টুকু তারা গ্রহণ করেছে, এখন হ্যাঁ-মূলক অংশটুকু গ্রহণ করতে বাকি । 'ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্‌' টুকু নিলেই পুরোপুরি ইসলামকে গ্রহণ করা হবে । পতিত জমিতে ভাল শস্য বুনতে হলে আগে থেকেই যেমন সব আগাছা কেটে চাষ করতে হয়—মার্কস্‌বাদও ঠিক তেমনি মানুষের মন থেকে সব মিথ্যা ঈশ্বর-রূপ আগাছাকে কেটে মাটি চষে 'জো'-এর অপেক্ষায় আছে । উপযুক্ত সময়ে বীজ বপন করলেই সুফল অনিবার্য । মার্কস্‌বাদ নাস্তিকতা চালু করলেও সাথে সাথে বহু অন্ধ বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করেছে— মিথ্যা

www.pathagar.com

কুসংস্কার ও ভেদ-বৈষম্যের প্রভাব হতে মানব মনকে মুক্ত করে উদার নীল আকাশের তলে দাঁড় করিয়েছে । সুতরাং নাস্তিকতা মার্কস্‌বাদের চরম কথা নয়, এটা তার প্রাথমিক অবস্থা মাত্র । এর পরবর্তী অবস্থা বা সিঁড়িই হচ্ছে ইসলাম । তাই ইসলামের সুদৃঢ় কন্দরেই এবার তাকে আশ্রয় নিতে হবে ।

মার্কস্‌বাদ বা কমিউনিজম যা চায় তার পূর্ণ ও চূড়ান্ত রূপই হলো ইসলাম । ইসলামের শান্ত শীতল ছায়াতলে এসে সকল মত, পথ, দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের এক মহা সমন্বয় হবে । ইসলামই একমাত্র ডায়লেকটিক ধর্ম— ইসলামেই আছে সব সমস্যার সমাধান, সব সংঘাত ও সংঘর্ষের চিরন্তন ও মহাসমন্বয় বা শান্তি । 'নিখিল সৃষ্টির মূলে যে দ্বৈতভাব, যে 'জোড়া-বাঁধা' ভাব ইসলাম সেই ভাবেরই পূর্ণ প্রতীক ।' স্বভাব বা প্রকৃতির সাথে এটা এক সুরে বাঁধা । ইসলাম মানব ও সৃষ্টির সহজাত প্রকৃতি এবং স্বাভাবিক ও ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ। এটা কুদরৎ ও ফিতরৎ এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির সাথে সমন্বয় রেখে অগ্রসর হয় এবং হবে । সুতরাং ইসলাম গোটা বিশ্ব ও সৃষ্টিকে ধীরে ধীরে কিন্তু সুনিশ্চিতরূপে ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতির ভেতর দিয়ে চিরন্তন সুখ, শান্তি, উন্নতি, প্রগতি ও পূর্ণতা-প্রাপ্তির দিকে এগিয়ে নেবেই, ইসলামী মানবতা ও সৃষ্টি একদিন না একদিন গড়ে উঠবেই । মানুষ একে অস্বীকার করলেই এ উড়ে যাবে না— মানুষ ও সৃষ্টির ফিতরৎ পরিবর্তন হবে না, হতে পারে না । তাই মানুষের গড়া কোন বাধা, মতবাদ, দল, শক্তি বা ক্ষমতাই একে দাবিয়ে রাখতে সক্ষম হবে না । দুনিয়ার প্রত্যেক মানুষ ও জীবকে ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, জ্ঞাতসারে হোক, অজ্ঞাতসারে হোক সৃষ্টির স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের নীতি অনুসারে আপনা হতেই মুসলিম বা শান্তিকামী হতে হবে । মানবতা ও সৃষ্টি পুরোপুরি মুসলিম হিসেবে গড়ে উঠবেই— দুনিয়ায় চিরন্তন শান্তি বা ইসলাম কায়েম হবেই ।

www.pathagar.com

ইসলামের উৎস

ইসলাম দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধীয় গবেষণা বা ধ্যান-ধারণা নয়, এ হচ্ছে মানব ও মানব জীবনের একটি পূর্ণ ও বাস্তব বিজ্ঞান । কুরআনে বর্ণিত দীন বা ধর্ম সব বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান এবং সমগ্র বিশ্বকে তা নিয়ন্ত্রিত করে । সুতরাং, এটা উপলব্ধি করতে বিশেষ জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ অনুভূতির প্রয়োজন হয় না যে, সৃষ্টির ভেতর পরিস্ফুট ও বিকশিত স্রষ্টার ইচ্ছাই দীন ও ইসলামের প্রাথমিক উৎস, পবিত্র কুরআন দ্বিতীয় উৎস, রসূলুল্লাহ্‌র পবিত্র জীবনাদর্শ ইসলামের তৃতীয় উৎস এবং রসূলুল্লাহ্‌র সাহাবা, বিশেষ করে ইসলামের চার খলীফার জীবন ও কার্যাবলী ইসলামের চতুর্থ উৎস। সত্যিকার মুসলিমদের জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, ধীশক্তি, পাঠ, পর্যবেক্ষণ, বিবেক, যুক্তিতর্ক ও বিচার-শক্তিই হলো ইসলামের সঠিক ও নির্ভুল অর্থ ও তাৎপর্য বোঝার এবং বাস্তব জীবনে এর প্রয়োগের প্রধান সহায়ক । পবিত্র কুরআনকে ভুলক্রমে ইসলামের প্রাথমিক উৎস বলে মনে করা হয় । দীন ও ইসলাম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অভাবেই এ ভুল ধারণার সৃষ্টি হয় ।

যেসব মৌলিক সত্য মানুষ স্বকীয় জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ত করতে সক্ষম হত না তা-ই হযরত মুহম্মদ (সা)-এর কাছে নাজিল হয়ে পবিত্র কুরআনে লিপিবদ্ধ রয়েছে । কুরআনকে মূল ভিত্তি ধরে নিয়ে মানুষের জ্ঞান ও প্রতিভা যুগ যুগ ধরে চেষ্টা, সাধনা ও সংগ্রাম করে প্রকৃতি-রূপ মহাগ্রন্থ হতে তার স্বকীয় জীবনের গূঢ় রহস্য আবিষ্কার করবে । কুরআন এবং প্রকৃতির নিয়ম পরস্পর বিরোধী নয়, বরং পরস্পরের ভেতর পূর্ণ সমন্বয় ও মিল রয়েছে । যুগ যুগ ধরে চেষ্টা ও সাধনা দ্বারা প্রকৃতি হতে লব্ধ মানুষের জ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতা কুরআনের সত্যিকার অর্থ, তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা বুঝতে সহায়তা করে । ঠিক তেমনি কুরআনের সত্যিকার পাঠ ও ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কারে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করে । ইসলামের এই মহাগ্রন্থের অর্থ, তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা সম্যক উপলব্ধি করতে হলে জ্ঞানলাভের সর্বপ্রকার চেষ্টা ও সাধনা করা অপরিহার্য । কুরআনের অন্ধ ও ভুল পাঠ ইসলামের সত্যিকার অর্থ, তাৎপর্য ও

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা করতে পারে না এবং সত্যের সন্ধানে মানুষের প্রচেষ্টাকে সহায়তাও করে না। যুগ যুগ ধরে মানুষের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য যত বৃদ্ধি পায় এবং প্রতিভার যতই বিকাশ হয় ততই ফুলের কুঁড়ির ন্যায় ধীরে ধীরে কুরআন স্বকীয় অর্থ ও তাৎপর্য দুনিয়ার সামনে খুলে ধরে। যুগ যুগ ধরে চেষ্টা ও সাধনালব্ধ মানুষের জ্ঞানই কুরআনের সবচেয়ে সঠিক ও নির্ভুল ব্যাখ্যা করতে পারে। কুরআন রসূলে করীম (সা) ব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা ব্যাখ্যাত বা বিশ্লেষিত হতে পারে না ; এটা কেবল সেই যুগ এবং যুগের প্রতিভা দ্বারাই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর। পানির তরল ও বাষ্পীয় আকৃতি আছে তা পাঁচশো বছর আগে মানুষ কল্পনাও করতে পারেনি। মিরাজ বোর্‌রাকের মারফৎ হয়েছিল। বোর্‌রাককে ঘোড়া বা অশ্বযানের সাথে তুলনা করা হত। কিন্তু বার্‌ক শব্দের অর্থ হলো বিদ্যুৎ। আজ বিদ্যুৎ যে অসাধ্য সাধন করছে তাতে একদিন আমরা একথাও বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রমাণ করতে পারবো যে, মিরাজ কোন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল। মানুষ এখনও তার গূঢ় রহস্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়নি। মানুষের জ্ঞান-বৃদ্ধি ও বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে আজ বার্‌ক-এর সত্যিকার অর্থ ও তাৎপর্য আমাদের উপলব্ধি হয়েছে। সুতরাং এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, যে স্তরে মানুষের যা জানা দরকার ঠিক সেই স্তরেই মানুষ তা বুঝতে পারে। মানবতা তখন এই স্তরে ছিল না বলেই বার্‌কের অর্থ ধরতে পারেনি, কোন দার্শনিক বা পণ্ডিত ব্যক্তি ইসলামের বিশ্বপালনের দিক সঠিক বুঝতে পারেনি। কিন্তু মানুষ এখন এমন এক স্তরে এসেছে যে, এখন এটাই সবচেয়ে বড় সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে। মার্কস্‌বাদের আবির্ভাবে ইসলামের এই দিকটাকে বোঝার এবং প্রতিপালন করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। মানুষের মৌলিক সমস্যাগুলির সঠিক ও সুষ্ঠু সমাধানের জন্য তাই আজ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে দীন ইসলামের সত্যিকার ব্যাখ্যার এবং মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে তার বাস্তব প্রয়োগের। কাজেই সব সময় সবদিন বোঝার চেষ্টা করা উচিত নয়। মানুষ যতই প্রগতির দিকে এগিয়ে যাবে ততই নতুন নতুন সমস্যার সমাধানের জন্য নতুন নতুন চিন্তা ও ভাবধারা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। পদার্থ বিজ্ঞান বা বস্তুবাদের সব কিছু কি আমরা সবাই বুঝতে পারি ? এর সব কিছুই কি জানা হয়ে গেছে ? পদার্থ বিজ্ঞানের কি আরও নিত্য নতুন আবিষ্কারের প্রয়োজন নেই ? তাই পাণ্ডিত্যের ভেতর দিয়ে ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা কুরআন ব্যাখ্যা করা চলে না। জামানা, অভিজ্ঞতা, পরিপক্ক জ্ঞান ও যুগ-প্রতিভা দ্বারাই কুরআনের ব্যাখ্যা সম্ভবপর। প্রতি

www.pathagar.com

শতাব্দীতে কুরআনের ব্যাখ্যা করার জন্য একজন মুজাদ্দিদ এসে ইসলামের সত্যিকার অর্থ ও তাৎপর্য বুঝিয়ে দেন । এথেকে একথা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক শতাব্দীতে কুরআনের যুগোপযোগী ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে । কোন মানুষের ক্ষমতা থাকলেই, সাহায্য করার সামর্থ্য থাকলেই কি মানুষ তা সব সময় করে ? তেমনি আল্লাহ্‌তা'আলার ক্ষমতা থাকলেই যে তিনি সব কিছু করে দেবেন তার কোন মানে নেই । তাহলে সৃষ্টির কোন অর্থ হয় না ; মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি ও প্রতিভা বিকাশের কোন সুযোগ থাকে না । আর বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন জাতির মাঝে যে হাজারো সমস্যা দেখা দেবে তার খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা এবং তার সমাধান কুরআনে দিতে হলে তা আকারে এতই বড় হত যা কোন মানুষের পক্ষে সারা জীবন চেষ্টা ও সাধনা করেও পড়ে শেষ করতে পারতো না । তাই মৌলিক সত্য এবং নীতিগুলি কুরআনে লিপিবদ্ধ করে বাকিটা যুগ, পরিবেশ এবং যুগ-প্রতিভার সন্ধান, উপলব্ধি ও আবিষ্কারের প্রতীক্ষায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে । যুগ যুগ ধরে মানুষ নতুন নতুন সমস্যা ও অবস্থার সম্মুখীন হয়ে নতুন নতুন সমাধান খুঁজে বের করবে এসব মূলনীতি হতে । শরীয়ত হলো সাধারণ নিয়মাবলী, কুরআনে তা-ই লিপিবদ্ধ আছে । রাসায়নিক বিজ্ঞান সম্পর্কে কোনো কিতাবই রাসায়নিক বিজ্ঞান নয় । রাসায়নিক বিজ্ঞান হলো প্রকৃতি । তেমনি কুরআন দীন নয়, দীন হলো আল্লাহ্‌র প্রকৃতি বা নিয়ম । যেসব মূল বিষয়, নিয়ম, নীতি ও সত্য মানুষ সাধারণত সাধনা ও প্রচেষ্টা দ্বারা জানতে পারে না, তা-ই কুরআনে লিপিবদ্ধ আছে । কুরআনে মূলনীতি ও বিষয় রয়েছে ঃ যুগোপযোগী খুঁটিনাটি আমাদের চেষ্টা করে জানতে হবে ।

'ইসলামের তৃতীয় মূল উৎস হযরত মুহম্মদ, বিশ্ব মানব অথবা ইসলামী মানবগোষ্ঠীর আদর্শ । তাঁর প্রতিই পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তাঁর জীবনেই আমরা ইসলামের বাস্তব ছবি ও রূপ দেখতে পাই ।' বাস্তবিক পক্ষে রসূলুল্লাহ্‌র জীবন ও জীবনাদর্শকে মূর্তিমান কুরআন বলা চলে । রসূলুল্লাহ্‌র সাহাবাদের জীবন ও জীবনাদর্শ হতেও ইসলাম সম্পর্কে সম্যক ও বাস্তব জ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর । তাঁরাও তাঁদের জীবনে ইসলামের আদর্শকে রূপায়িত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ও সাধনা করেছিলেন এবং তাঁদের জীবন ও চরিত্র রসূলুল্লাহ্‌র প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্বের প্রভাবেই গড়ে উঠেছিল । সাহাবাদের মধ্যে হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান

www.pathagar.com

ও হযরত আলী (রা) এই চার খলীফার জীবন সমষ্টিগতভাবে আদর্শস্থানীয় । খোলাফায়ে রাশেদীনের শেষ ও চতুর্থ খলীফা হযরত আলীর মৃত্যু হতেই আরব জাতি এবং ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার পতন শুরু হয় । এর পর হতে ধীরে ধীরে উমাইয়া, আব্বাসিয়া, ফাতেমিয়া, ওসমানিয়া বংশের আমলে খিলাফত বা আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্র সুলতানাত বা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয় । বর্তমানে আমাদের চোখের সামনে যেমন করে কল্যাণকর ও প্রয়োজনীয় মানবজ্ঞান কতকগুলি বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণী ও জাতির একচেটিয়া সুখ-সুবিধা ও আরাম-আয়াস এবং কোটি কোটি মানুষের দুঃখ দুর্দশা বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে, ঠিক তেমনি বিশ্বমানবের রহমতরূপ ইসলামকেই পরবর্তীকালে কতকগুলি ব্যক্তি বা শ্রেণীর সুবিধার জন্য চরম অসাধু ও গর্হিতভাবে ব্যবহার এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে সর্বসাধারণের শাসন ও শোষণের জন্য বিকৃত, অঙ্গহীন করা হয়েছে । আণবিক বোমার ধ্বংসাত্মক ব্যবহার আধুনিকতম উদাহরণ। বৈজ্ঞানিক সত্য ও জ্ঞানের অভাবনীয় ব্যবহার হচ্ছে বলেই যেমন বিজ্ঞান সাধনা বা গবেষণা ত্যাগ করার কোন অর্থ হয় না, তেমনি সাধারণভাবে ধর্ম এবং বিশেষভাবে ইসলাম শোষণযন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়েছে বা হচ্ছে বলেই একে অস্বীকার, অবহেলা ও অগ্রাহ্য করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই । দুর্ভাগ্যবশত ধর্ম ও ইসলামের ব্যাখ্যা এমন সব লোকের উপর ন্যস্ত হয়েছে যাদের এসম্পর্কে সম্যক জ্ঞান নেই । এদের একমাত্র সম্বল মানুষের ক্রমবর্ধমান জ্ঞান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা ঃ অবৈজ্ঞানিক ও যুক্তিতর্কহীন অন্ধবিশ্বাস ও চিন্তাধারা ধর্ম ও ইসলাম সম্পর্কে এমন এক কুৎসিৎ ছবি দুনিয়ার সামনে তুলে ধরেছে যার ফলে কোনো জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে একে গ্রহণ ও জীবনে রূপায়িত করা একরূপ অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে । কিন্তু তাই বলে ধর্মে অবিশ্বাস কোনোক্রমেই যুক্তিসঙ্গত এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নয় । সুতরাং জীবনের সত্যিকার ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি হবে ইসলামকে এর মূল এবং নির্ভরযোগ্য উৎস হতে সত্যানুসন্ধিৎসু অনুরাগ নিয়ে সত্যিকার পাঠ এবং সম্যক জ্ঞানলাভ মানুষের বিরাট ভবিষ্যত ও সম্ভাবনার সূচনা করবে এবং যতদিন পর্যন্ত না সমগ্র মানব জাতি ক্রমবিকাশের ভেতর দিয়ে চরম উন্নতি, প্রগতি ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে এবং আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য বা নৈকট্য লাভ করে একমাত্র মুসলিম মানব গোষ্ঠীতে পরিণত হবে, ততদিন পর্যন্ত যুগ যুগ ধরে এটা বিপ্লবের দীপবর্তিকা বহন করে নেবার পথ প্রদর্শন করবে । এই

www.pathagar.com

মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইসলাম জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে জগতের শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের সাদর আহ্বান জানাচ্ছে। মানব জাতির কল্যাণের জন্য সকল বিজ্ঞানের সেরা বিজ্ঞান দীন বা ধর্মকে এর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মুরুব্বি—সাধু, সন্ন্যাসী, পীর, ফকির, মোল্লা এবং পণ্ডিতদের হাত থেকে মুক্ত ও স্বাধীন করতে হবে।

www.pathagar.com

ইসলামের শিক্ষা ও জ্ঞান

'ইসলামের পাঠ ও ব্যাখ্যা-পদ্ধতি এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ পরিবর্তন করতে হবে। মুসলিম জাতির অধঃপতনের যুগে অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস প্রসূত কল্পিত ও ব্যক্তিগত বেহেশ্‌তে আরামদায়ক স্থান পাবার উদ্দেশ্যে গতানুগতিক ও চিরাচরিত উপায়ে কুরআন পাঠ ও ব্যাখ্যা করলে মানব জাতির কোন কল্যাণ হবে না। স্বকীয় পরিবেশকে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা উন্নতি ও প্রগতির অনুকূল করতে এবং সৃষ্টির সাথে সমন্বয় রেখে মানুষের সত্যিকার জ্ঞান ও পরিচয় পেতে হলে, জ্ঞানের প্রসার ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে সত্যিকার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার জন্যই কুরআন ও ইসলামকে পাঠ ও ব্যাখ্যা করতে হবে।'

বেহেশ্‌ত ও দোযখ কোন পার্থিব স্থান বিশেষের নাম নয়। মানুষের মন এবং এর উন্নতি ও প্রগতির বিশেষ অবস্থাকেও বেহেশ্‌তী ও দোযখী বা জান্নাতী ও জাহান্নামী বলা চলে। বেহেশ্‌ত ও দোযখ বস্তু জগতে চাক্ষুষ দেখা না গেলেও এর সাথে তা যুগপৎভাবে বিদ্যমান এবং এটা থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন নয়। সে যাহোক, এ সম্পর্কে ভাবাত্মক ও কাল্পনিক চিন্তাভাবনা কোনক্রমেই মানব কল্যাণকর হবে না। অতীত ও বর্তমানই যে ভবিষ্যতকে নিয়ন্ত্রিত করে, এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত এবং দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা-প্রসূত। এ বিশ্বাস বিশেষ প্রয়োজনীয় ও হিতকর। সুতরাং পর জীবনের বিশ্বাসও সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক এবং যুক্তিসঙ্গত। বস্তুত এ বিশ্বাস মানুষের কর্তব্যবোধ বৃদ্ধি করে এবং মানুষকে প্রতি কাজে, প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি মুহূর্তে সবিশেষ সাবধান হতে শিক্ষা দেয়। এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ বাস্তব, বৈজ্ঞানিক, যুক্তিসংগত এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামে তার ভবিষ্যৎ সুখ, শান্তি, উন্নতি, প্রগতি ও পূর্ণতা প্রাপ্তির আশায় অনুপ্রাণিত করার চিরন্তন উৎস। 'চিরন্তন সুখ ও শান্তিই হলো সমস্ত মানব প্রচেষ্টার চরম লক্ষ্য। চরম পরিতাপের বিষয় এই যে, মানুষ নিজ প্রকৃতি বা ফিতরৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অপূর্ণ জ্ঞান নিয়ে তার পরিবেশ ও জীবনকে কখনও বা সম্পূর্ণভাবে এবং কখনও বা আংশিকভাবে স্বকীয় স্বভাব বিরোধী করে গড়ে তুলে। এসব

www.pathagar.com

খেয়াল বশত ও অবৈজ্ঞানিক উপায়ে সৃষ্ট পরিবেশ মানুষকে নিরুৎসাহ করে তার জীবনে চরম দুঃখ-কষ্ট ও দুর্গতি টেনে আনে। পাখি পানিতে এবং মাছ ডাঙ্গায় বাঁচতে পারে না। কারণ 'কোন প্রাণীই বিরুদ্ধ-পরিবেশ ও অবস্থার ভেতর বাঁচতে ও পূর্ণ বিকশিত হতে পারে না। ইসলাম মানুষ এবং তার বিরুদ্ধ পরিবেশের ভেতর সমন্বয় সাধনকারী দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী নিয়ম বিরোধী নয়। স্বকীয় প্রকৃতির প্রতি অনুকূল ও বন্ধুভাবাপন্ন সুনিয়ন্ত্রিত জীবন গড়ে তোলার যোগ্যতার উপরই নির্ভর করে মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের চরম সুখ ও শান্তি। মানব প্রকৃতি এবং যে বিজ্ঞান এই মানব প্রকৃতিকে সুনিয়ন্ত্রণ করে সে সম্পর্কেও পবিত্র কুরআন পাঠ ও ব্যাখ্যার মূল এবং মুখ্য উদ্দেশ্য হবে এই পূর্ণ ও পরিপক্ক জ্ঞান লাভ করা।'

'ইসলামের পাঠ ও ব্যাখ্যা-পদ্ধতি অবশ্যই বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিসঙ্গত এবং গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও পূর্ব হতে পক্ষপাতবিশিষ্ট সমস্ত অন্ধ বিশ্বাস হতে মুক্ত হবে। এটা যুক্তি দ্বারা নির্ণেয় এবং অনুমানজনক বা বিশেষ হতে সাধারণ সিদ্ধান্তমূলক হবে। মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞান এবং স্বাভাবিক রিপু-অনুগত প্রবৃত্তি চাক্ষুষ দৃষ্টি ও বাস্তব অনুভূতির বাইরের কোন সত্যকে স্বীকার করতে চায় না এবং ইসলামের প্রাথমিক উৎস প্রকৃতি-রূপ মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআনের ভেতর বিরোধ এবং গরমিল খুঁজে বের করে নিজেকে নাস্তিক ও অজ্ঞেয়বাদীরূপে গড়ে তুলে। যুক্তি ও বিচারশক্তি জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় বা মাধ্যম নয়। প্রত্যক্ষ অনুভূতিকে বস্তুবাদ সরাসরি অস্বীকার করলেও এটা জ্ঞানলাভের একটি বিশেষ ও শক্তিশালী উপায় বা মাধ্যম। যুক্তি ও বিচারশক্তি প্রয়োগ করে অনুশীলনের সাথে সাথে প্রত্যক্ষ অনুভূতিকেও জ্ঞানলাভের বিশেষ ও শক্তিশালী উপায় স্বরূপ সবিশেষ সাবধানতার সাথে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে সত্য অনুসন্ধানের জন্য অনুশীলন করতে হবে। প্রত্যক্ষ অনুভূতির সর্বোচ্চ স্তরই হলো ওহী এবং ওহী ও প্রত্যক্ষ অনুভূতির মাঝে প্রত্যক্ষ অনুভূতির আরও কয়েকটি বিশেষ স্তর রয়েছে। প্রত্যক্ষ অনুভূতি এবং এর অন্যান্য স্তর যুক্তিতর্ক দ্বারা উপলব্ধি ও প্রমাণ করা চলে না। এসব অবশ্য অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ। প্রত্যক্ষ অনুভূতি এবং এর সমশ্রেণীর অন্যান্য অনুভূতি অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ন্যায় বাস্তব এবং বৈজ্ঞানিক। এই উভয়বিধ যন্ত্র দ্বারাই আমরা চাক্ষুষ দৃষ্টি ও বাস্তব অনুভূতির বাইরের সমস্ত ক্ষুদ্র ও দূরবর্তী বস্তু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ করতে সক্ষম হই। বস্তুত ঐতিহাসিক সমস্ত উদ্ভাবন ও আবিষ্কার প্রত্যক্ষ অনুভূতি হতে

www.pathagar.com

উদ্ভূত, যুক্তিতর্ক হতে নয়। যুক্তিতর্ক জ্ঞানলাভের নিম্নস্তরের উপায় বা মাধ্যম।' এটা প্রত্যক্ষ অনুভূতি দ্বারা আবিষ্কৃত মৌলিক সত্য বস্তুসমূহের খুঁটিনাটি খুঁজে বের করে। এটা তাদেরকে বাস্তব ও বোধগম্য আকার ও রূপ দান করে। উল্লিখিত উপায় ও পদ্ধতি অনুসারে স্রষ্টা ও সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইসলামের সত্যিকার এবং সঠিক পাঠ, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ মানুষের সদাবর্ধমান উন্নতি, প্রগতি এবং অফুরন্ত জ্ঞান ও সৃজন প্রতিভার আশ্চর্যজনক সম্ভাবনার সূচনা করবে এবং এভাবে মানুষকে সত্যিকার সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করে গড়ে তুলবে।

অজ্ঞেয়বাদ ও নাস্তিকতা প্রভাবান্বিত বর্তমান জগৎ যা কিছু মানুষের যুক্তিজ্ঞান ও বাস্তবদৃষ্টির বাইরে তাকেই অস্বীকার ও অবহেলা করে। তাদের এই বিশ্বাস যত বিজ্ঞানসম্মত বলেই দাবি করুক না কেন বস্তুত এটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক। পবিত্র কুরআন মনের এই বিশেষ অবস্থাকে কঠোর ও পরিষ্কারভাবে ঘৃণা করেছে। মানব স্বকীয় ক্ষমতা সম্পর্কে নিদারুণ অজ্ঞানতাবশতই এরূপ মনোভাব গড়ে তুলে। তথাকথিত বৈজ্ঞানিক নাস্তিকতা আমাদেরকে এই শিক্ষা দেয় যে, মানুষ তার পরিবেশের সৃষ্ট এবং এটা দ্বারাই সে প্রভাবান্বিত হয়। বাস্তব পরিবেশের উপর উঠে তাকে সৃষ্টি এবং প্রভাবান্বিত করার ক্ষমতা যে মানুষের আছে একথা তারা বিশ্বাস করে না। নাস্তিক বস্তুবাদ মানুষকে তার বাস্তব পরিবেশের স্রষ্টারূপে গড়ে না তুলে এর সৃষ্ট ও অধীন করে গড়ে তুলে। কার্লমার্কস্ তাঁর ম্যানিফেস্টোতে বলেছেন—'আমাদের ধারণা এবং চেতনা যে আমাদের বর্তমান বাস্তব পরিবেশ হতেই উদ্ভূত একথা বুঝতে এমন বিশেষ কোন জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ অনুভূতির প্রয়োজন হয় না।' একথা সত্য। কিন্তু একথা বুঝতেই বা এমন কি জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ অনুভূতির প্রয়োজন যে, আমাদের ধারণা ও আমাদের বর্তমান এমন কি ভবিষ্যৎ বাস্তব পরিবেশও সৃষ্টি করে ?

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই মহান কিতাব (পবিত্র কুরআন) অদেখায় বিশ্বাসী সাবধানকারীর জন্য সঠিক পথ প্রদর্শক—কুরআনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম ভাগেই বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং প্রথমেই পবিত্র কুরআনকে অদেখাতে বিশ্বাসী এবং সাবধানকারীদের জন্য পথপ্রদর্শক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে অদেখা অর্থ হলো মানুষ যা তার যুক্তি-জ্ঞান স্থূল ও বাস্তব দৃষ্টি দ্বারা স্বাধীনভাবে অনুধাবন করতে পারে না। একটি বিশেষ মনের

www.pathagar.com

অবস্থা গড়ে তোলার জন্যই এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে । বিশ্ব ও সৃষ্টি-পালনের গূঢ় রহস্য সম্পর্কে সম্যক ও সত্য জ্ঞানলাভ করতে মনের এই বিশেষ অবস্থা সবিশেষ প্রয়োজনীয় । এই অদেখা ও অজানা চূড়ান্ত বা অপরিবর্তনীয় নয়, বরং আপেক্ষিক বা সমসম্বন্ধযুক্ত । একজনের অদেখা বা অজানা বস্তু বা বিষয় অপর একজনের জানা, চেনা ও দেখা হতে পারে । কোন ব্যক্তিবিশেষ তার পঞ্চ ইন্দ্রিয় বা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়, স্থূলদৃষ্টি বা সূক্ষ্মদৃষ্টি বা প্রত্যক্ষ অনুভূতি দ্বারা কোনো সত্য উপলব্ধি বা কোনো নতুন আবিষ্কার করে এবং অপরের কাছে ব্যক্ত করে । অপরাপর সবাই তাকে এবং তার সত্য বা আবিষ্কারকে বিশ্বাস করে । এই উপায় ও পদ্ধতি অনুসারে মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি পায় । আমাদের দেখার ও জানার বাইরে কিছু নেই—এটা সত্য হলে অজানাকে জানার এবং অদেখাকে দেখার জন্য মানুষের কোন সাধনা, অভিযান বা প্রচেষ্টা হবে না এবং মানবের ক্রমবর্ধমান জ্ঞান বন্ধ হবে । অদেখা অজানা বা অচেনার অর্থ এই নয় যে, কেউ কোনদিন কোন কালেই তা জানতে, বুঝতে, দেখতে বা চিনতে পারবে না । এর দ্বারা শুধু একথাই বুঝতে হবে যে, সাধারণ লোক সাধারণত তা জানতে, বুঝতে বা দেখতে এবং তার ফল অনুভব করতে পারে না । এ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান এবং বাস্তব উপলব্ধিও তাদের হয় না । ঠিক এই অর্থেই আল্লাহ্‌র এবং ঈমানের অন্যান্য মূল বিষয় মানুষের দেখা, জানা ও অনুভূতির বাইরে । কিন্তু এ অর্থে নয় যে, কেউ কোনকালে এদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান, বাস্তব উপলব্ধি এবং প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করতে পারে না । অনেকে এ সম্পর্কে বাস্তব প্রমাণ চায় এবং সন্তোষজনক ও বাস্তব প্রমাণ না পেলে আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে নারাজ । মনের এই অবস্থা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক এবং অযৌক্তিক । যাদের মনের অবস্থা এরূপ, তাদের পক্ষে অতি সাধারণ সত্যকে সত্য বলে গ্রহণ করা সম্ভবপর নয় । বস্তুত 'অদেখাকে দেখার, অজানাকে জানার, অচেনাকে চেনার উদগ্র বাসনা ও প্রচেষ্টা হতেই জ্ঞানের উৎপত্তি এবং অদেখা, অজানা এবং অচেনা বিষয় বা বস্তুতে বিশ্বাস না করাই অজ্ঞানতা ।' আমাদের জানা, চেনা ও দেখার বাইরে আর কিছু না থাকলে মানুষের জ্ঞানলাভের সাধনা ও প্রচেষ্টা শেষ হয় । যেসব বস্তু ও বিষয় গত শতাব্দীতে অজানা ও অদেখা ছিল, আজ তাই কঠোর বাস্তবে পরিণত হয়েছে । আজও অনেক বস্তু ও বিষয় হয়ত অনেকের অজানা এবং অদেখা রয়েছে, আবার হয়ত অনেকে সে সম্পর্কে সম্যক ও সত্য জ্ঞান লাভ করেছে । এই ধরুন

www.pathagar.com

নির্দিষ্ট পরিমাণ অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন মেশালে পানি হয় । রসায়নশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে এটা একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষিত সত্য । অপরাপর সবার পক্ষে এ সত্যকে মেনে নেবার দু'টি মাত্র উপায় আছে । কারণ আমরা সবাই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান রাখি না । তাই বৈজ্ঞানিক সত্য আমাদের মেনে নিতে হয় । যাঁরা রাসায়নিক বিজ্ঞান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখেন এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন মেশালে পানি হয়, তাঁদেরকে মানতে হবে অথবা পরীক্ষা করতে হবে । সেখানেও রাসায়নিক বিজ্ঞানে অভিজ্ঞদের দেয়া উপায়, পদ্ধতি ও পরিমাণ অনুসারেই পরীক্ষা করতে হবে । অন্যথায় আকাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাবে না । কিন্তু কেউ যদি অভিজ্ঞদের উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন না করে অথবা তাঁদের দেয়া উপায়, পদ্ধতি ও পরিমাণ মত পরীক্ষা করতে অস্বীকার করে তবে তার পক্ষে সম্যক ও সত্য জ্ঞান লাভ সম্ভব নয় । অজানা বিষয় ও সত্য জানার, বোঝার ও উপলব্ধি করার এই দু'টি মাত্র উপায় আছে । এ ছাড়া তৃতীয় কোন উপায় নেই । আল্লাহ্ এবং অন্যান্য বিষয় ও বস্তু যা মানুষ সাধারণ জ্ঞান এবং স্থূল দৃষ্টি দ্বারা উপলব্ধি করতে পারে না, এই উপায় ও পদ্ধতি প্রয়োগ করলে সে সম্পর্কেও সম্যক ও সত্যজ্ঞান লাভ সম্ভবপর । সম্যক ও সত্য জ্ঞান লাভের দু'টি উপায়ের কথা আগেই বলেছি—একটি যুক্তিজ্ঞান আর অপরটি প্রত্যক্ষ অনুভূতি বা আত্মজ্ঞান । এই আত্মজ্ঞান বা প্রত্যক্ষ অনুভূতি সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় মারফতই সম্ভবপর । এই সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় সাধারণ লোকের জানা নেই । যাঁরা যুক্তিজ্ঞানের মারফত সত্য অনুসন্ধান করেন তাঁরাও অনেক সময় সূক্ষ্ম যন্ত্রের মারফত অনেক সূক্ষ্ম বিষয় ও বস্তু সম্পর্কে সম্যক ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করে থাকেন । অথচ এসব সূক্ষ্ম যন্ত্র এবং এর বাস্তব ব্যবহার ও প্রয়োগ সাধারণ লোকের জানা নেই । বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিকগণ সম্যক ও সত্যজ্ঞান লাভ করার জন্য যেরূপ যুক্তি, জ্ঞান, যন্ত্রপাতি এবং বাস্তব উপায় ও স্থূল ইন্দ্রিয় ব্যবহার করেন, ঠিক সেরূপ প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও আত্মজ্ঞান এবং সূক্ষ্ম ও আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়ের মারফত আধ্যাত্মিক বৈজ্ঞানিকগণ প্রকৃতিরূপ মহাগ্রন্থ হতে সম্যক ও সত্যজ্ঞান লাভ করে থাকেন । আদম, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা, বুদ্ধ, কৃষ্ণ এবং মুহম্মদ প্রমুখ যুগান্তকারী চিন্তানায়ক এই দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক । প্রত্যেক যুগে, প্রত্যেক দেশে এবং প্রত্যেক জাতির ভেতর এই মহামানবগণের আবির্ভাব হয়েছে । এসব চিন্তানায়ক ও কর্মবীর স্রষ্টা এবং সৃষ্টির গূঢ় রহস্য সম্পর্কে

www.pathagar.com

সম্যক ও সত্যজ্ঞান লাভ করে সৃষ্টির ভেতর মানুষের কর্তব্য নির্ধারণ করে গেছেন। তাঁরা স্রষ্টা এবং সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক রেখে মানব জীবন এবং মানবের ক্রমবিকাশের ইতিহাসের সঠিক অর্থ, তাৎপর্য, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে মানব জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করার এমন সব জীবনবিধান শিখিয়েছেন, যার বাস্তব প্রয়োগ মানবতাকে চরম উন্নতি ও পূর্ণতম বিকাশের দিকে এগিয়ে নেয়। তাঁরা তাদের ব্যক্তিগত এবং অনুচরদের জীবনে এর বাস্তব প্রয়োগ করে আশ্চর্যজনক ফল দেখিয়ে গেছেন। মানবের উন্নতি, প্রগতি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাসে তাঁদের এবং তাঁদের ধর্ম ও জীবন বিধানের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা ও যুক্তিজ্ঞান বিজ্ঞানের নামে অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেয়া বোকামি, অন্ধবিশ্বাস ও অজ্ঞানতা। যেকোন বাস্তব এবং বৈজ্ঞানিক সত্যকে পরীক্ষা ও প্রমাণ করার যে সাধারণ দু'টি উপায় আছে, তা যদি আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের জন্য প্রয়োগ করি, তাহলে তা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত এবং বৈজ্ঞানিক হবে। বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন জাতির ভেতর যেসব মহাপুরুষ প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও আত্মজ্ঞানের মারফত স্রষ্টা, সৃষ্টি রহস্য ও মানব জীবন সম্পর্কে যেসব সম্যক ও সত্যজ্ঞান লাভ করে ব্যক্তিগত ও অনুচরদের জীবনে প্রয়োগ করে অসাধারণ এবং বিস্ময়কর ফল লাভ করেছেন, তাঁদের এবং তাঁদের জ্ঞান ও মতবাদে বিশ্বাস স্থাপন করুন। যদি তাঁদের চরিত্র নিখুঁত ও নির্দোষ হয়, যদি তাঁরা কোনদিন মিথ্যা না বলে থাকেন, তাঁদের বিশ্বাস যদি অটল ও অনমনীয় হয় এবং তাঁদের জীবন ও জীবনবিধান যদি মানবের অভূতপূর্ব এবং ক্রমবিকাশের ইতিহাসে বিস্ময়কর পরিবর্তন সাধন করে থাকে, তবে তাঁদের উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন না করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। নিউটন, ডারউইন অথবা কার্লমার্কস্ প্রবর্তিত মত, পথ ও সত্যকে না বুঝতে পারলে যদি কেউ তা অস্বীকার করে, তা যেমন বোকামি, অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক হবে, ঠিক তেমনি এসব যুগান্তকারী মহামানবদের মত, পথ ও জীবন বিধান সম্পর্কে সম্যক ও সত্য জ্ঞান না থাকার দরুনই তা অস্বীকার করার প্রচেষ্টাকে বোকামি, অজ্ঞতা, অবৈজ্ঞানিক এবং অযৌক্তিক ছাড়া আর কি বলতে পারি ? আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কৃত সত্যকে যদি মেনে নেয়া হয়, তবে আধ্যাত্মিক সত্যকে মেনে নিতেই বা আপত্তি কি ? সাধারণ বৈজ্ঞানিক সত্যকে মেনে না নিলে যেমন তাদের দেয়া উপায়, পদ্ধতি ও পরিমাণমত পরীক্ষা করা হয়, ঠিক তেমনি আধ্যাত্মিক সত্যকে মেনে না নিলেও আধ্যাত্মিক

www.pathagar.com

বৈজ্ঞানিকদের দেয়া উপায় ও পদ্ধতি অনুসারে পরীক্ষা করতে হবে। দ্বিতীয় উপায়কে অর্থাৎ বিশ্বাস ও প্রমাণ উভয়বিধ উপায় ও পদ্ধতিকে অস্বীকার করলে আপনার প্রতি সহানুভূতিসূচক কৃপা ছাড়া আর কি করতে পারি ! কারণ তাহলে মনে করতে হবে আপনি অন্ধ এবং জ্ঞানলাভের সব দরজাই আপনার জন্য বন্ধ।

'ইসলাম ঈমান, আমলে-সালিহ্ বা সৎ কাজ এবং জ্ঞান-বুদ্ধির উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে যুক্তিজ্ঞানের পূজারিগণ ডারউইন, এডিসন এবং মার্কস্‌কে বিশ্বাস করেন কিন্তু নবী ও মহাপুরুষদের বিদ্রূপ করেন। তাঁদের এই দৃষ্টিভঙ্গি যুক্তিজ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধির প্রতি চরম অবমাননা করে। মানুষ যদি তার স্বকীয় ক্ষমতা এবং জ্ঞান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ করতে সক্ষম হয়, তবে সে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব অস্বীকার করার মত ধৃষ্টতা করবে না। মানুষ যতই সৃষ্টি ও প্রকৃতির গূঢ় রহস্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে, ততই সে নিজের সম্পর্কে সম্যক ও সত্য জ্ঞান লাভ করবে। কিন্তু বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা, বৈজ্ঞানিক এবং যুক্তিজ্ঞানী দার্শনিকগণ যা কিছু তাদের স্থূলদৃষ্টি এবং বাস্তব চোখে ধরা পড়ে না, তাকেই অস্বীকার করেন। মানবের ক্রমবর্ধমান জ্ঞান তার সীমাবদ্ধ এবং বিপুল সম্ভাবনাপূর্ণ সম্যক ও সত্যজ্ঞান সম্পর্কে সঠিক এবং নির্ভুল ধারণা ও চেতনা এনে দেবে।' মানুষের মন ও মস্তিষ্কের উন্নতি ও বিকাশের যে কি বিরাট এবং বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ করে সৃজন করা হয়েছে এবং যতদিন সে আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস রাখবে এবং ভাল কাজ করবে, ততদিন পর্যন্ত তার বিকাশ ও উন্নতির শেষ নেই। আল্লাহ্ মানুষকে দুনিয়ার উপর তাঁর খলীফা বা প্রতিভূ হিসেবে কাজ করার জন্য তাঁর নিজ ফিতরৎ বা প্রকৃতি দিয়ে সৃজন করেছেন। আল্লাহ্‌র উপর এবং তার সাথে মানুষের সম্পর্কে বিশ্বাস স্থাপন শুধু ধ্যান-ধারণা বা চিন্তা-ভাবনার ব্যাপার নয় ; উপরন্তু এই বিশ্বাস স্থাপন মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবন গড়ে তুলতে বাস্তব এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। ইসলাম প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে এবং মানব জীবনের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে এর প্রয়োজনীয়তার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। আল্লাহ্ কতকগুলি অপরিবর্তনীয় ও কঠোর নিয়মাবলীর দ্বারা এই বিশ্বের ভবিষ্যৎ নিরূপণ করেন। এটা প্রকৃতির ভেতর পরিলক্ষিত হয় এবং ইসলামের মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআনে এটাকেই দীন

সম্যকজ্ঞান

www.pathagar.com

বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র কুদরৎ ফিতরৎ বা প্রকৃতির ভেতর আত্মপ্রকাশ করে। প্রকৃতির কোন বিবেক বা বিচার-বুদ্ধি নেই। সুতরাং এটা অন্ধ এবং অপরিবর্তনীয়। মানব প্রকৃতি বস্তুত প্রকৃতির প্রত্যেক অংশই সার্বজনীন প্রকৃতির অংশবিশেষ। কাজেই আমরা যতই প্রকৃতির নিয়ম জানি এবং প্রাকৃতিক নিয়মের যতই সঠিক অর্থ, তাৎপর্য এবং ব্যাখ্যা করতে পারি, ততই আমরা আমাদের নিজ প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক ও সত্যজ্ঞান লাভ করি। যতই আমরা আমাদের স্বকীয় প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক ও সত্য জ্ঞান লাভ করি, ততই সৃষ্টির ফিতরৎ বা প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান পূর্ণ ও পরিপক্ক হয়। সুতরাং বলা হয়েছে—'নিজেকে চেন তাহলেই তোমার আল্লাহ্‌কে চেনা হলো।' আমাদের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ও দুর্গতির মূল কারণ স্বকীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলার প্রচেষ্টা। প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলার এ প্রচেষ্টা আংশিকভাবে আত্মশৃংখলা এবং আত্মসংযমের অভাব। প্রধানত প্রকৃতির মূলনীতি ও নিয়ম সম্পর্কে আমাদের চরম অজ্ঞতা। সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধিশালী সমাজবিধান গড়ে তুলতে হলে তা মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সহজাত প্রকৃতি অনুসারেই গড়তে হবে। একথা সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, প্রকৃতি অন্ধ। বস্তুবাদী বিজ্ঞান এই অন্ধ প্রকৃতিকে স্বীকার করে এবং তার সমস্ত যুক্তিজ্ঞান, পাণ্ডিত্য, মেধা ও প্রতিভা মারফত এই অন্ধ প্রকৃতির গূঢ় রহস্য জানার চেষ্টা করে এবং অজ্ঞতার গর্বে স্ফীত হয়ে এই অন্ধ প্রকৃতির স্রষ্টার কুদরতকে অস্বীকার ও বিদ্রূপ করে। কুদরত অন্ধ নয়। এর ইচ্ছা এবং বিচার শক্তি রয়েছে। কুদরৎ প্রাকৃতিক নিয়মের সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ্‌র একটি গুণবাচক নাম। কুদরৎ ফিতরৎ-এর উপর এবং অন্ধ প্রকৃতিকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে এবং তার ইচ্ছানুসারে তিনি তাঁর নিয়ম বা প্রকৃতির সংশোধন, পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করতে পারেন। ইচ্ছা করেই তিনি সাধারণত প্রকৃতি বা নিয়মের কোন পরিবর্তন না করা স্থির করেছেন।আল্লাহ্‌ সবিশেষ সাবধানতা ও সুবিবেচিত ইচ্ছা, বাসনা ও কল্পনা দ্বারা এই বিশাল বিশ্ব ও প্রকৃতিকে সৃজন করেছেন। সুতরাং স্রষ্টার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক ও সত্যজ্ঞান ও সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে প্রকৃতির গূঢ় রহস্য সঠিকভাবে জানা ও ব্যাখ্যা করা চলে না। তাঁর ইচ্ছা তাঁর সৃষ্ট জীবের ভেতর পরিস্ফুট হয়। একমাত্র প্রকৃতিকে যুক্তি জ্ঞান মারফত পাঠ, পর্যবেক্ষণ ও ব্যাখ্যা করে প্রকৃতি সম্পর্কে অন্ধ এবং অপূর্ণ জ্ঞানলাভ সম্ভবপর। কিন্তু

প্রকৃতি অন্ধ ও অপরিবর্তনীয়

www.pathagar.com

সৃষ্টির প্রথম কারণ সম্পর্কে সম্যক ও সত্য জ্ঞান লাভ ব্যতিরেকে সম্ভব নয় । সুতরাং সত্যিকারের জ্ঞান সন্ধানী আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েই জ্ঞান সাধনায় ব্রতী হবে । আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস, গোঁড়ামি, ভয় ও অজ্ঞতাপ্রসূত অন্ধবিশ্বাস নয় । এটা কঠোর বাস্তব এবং একমাত্র এটাই আমাদের সম্যক ও সত্যজ্ঞান লাভের সঠিক পথ নির্দেশ করতে পারে ।

ইসলামের সর্বপ্রথম বাণী হলো ঃ 'পাঠ কর, পর্যবেক্ষণ কর, তন্ন তন্ন করে দেখ, জ্ঞান অর্জন করার জন্য তোমার রবের নাম স্মরণ কর ।' যা কিছু সামনে আসে চিন্তা, ঘটনা, বস্তু, মানুষ, সমস্যা, মতবাদ তাকে তন্ন তন্ন করে পর্যবেক্ষণ কর এবং সাথে সাথে চিন্তা কর সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি এবং সৃষ্টির ভেতর তোমার কর্তব্য কি ? শুধু স্রষ্টার নাম নিয়ে পাঠ করলেই কোন কেতাব মুখস্থ হয়ে যাবে না, কোন সমস্যার সমাধান হবে না । সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং তার ভেতর নিজের কর্তব্য সামনে রেখেই উপস্থিত বিষয়, বস্তু বা মতবাদ হতে নিজের কি জ্ঞান লাভ করার আছে তা খুঁজে বের করতে হবে । স্বকীয় অপূর্ণ জ্ঞানকে পূর্ণ ও পরিপক্ক এবং স্বকীয় কর্তব্য সুষ্ঠু ও সুন্দররূপে পালন করে নিজের দেহ, মন ও মস্তিষ্কের পূর্ণ উন্নতি ও বিকাশ করে সমগ্র সৃষ্টির উন্নতি ও বিকাশের সহায়তা করতে হবে ।

এছাড়া আরও বিভিন্ন আয়াতে আমাদের পূর্ণ ও পরিপক্ক জ্ঞানলাভ করার উপায় কুরআনে দেয়া আছে ঃ

(১) 'কান খুলে রাখা ; আমরা যা দেখি সে সম্পর্কে সত্যিকার জ্ঞান লাভ করা ।'
(২) 'আমাদের ভবিষ্যৎ চলার পথে প্রয়োজনীয় বস্তু ও সত্য স্মরণ রাখা ।'
(৩) 'বিশ্বের পর্যবেক্ষণ ।'
(৪) 'ইতিহাস ও জীবনী পাঠে সম্যক জ্ঞান লাভ ।'
(৫) 'ভ্রমণকালে অতীতকালের বিভিন্ন জাতির উত্থান ও পতন এবং তাদের ধ্বংসাবশেষ ও শবদেহের পর্যবেক্ষণ করা ।'
(৬) 'দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ ও পরীক্ষা হতে শিক্ষা গ্রহণ করা ।'
(৭) 'ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ বা ওহী পাঠ ও ব্যাখ্যা করা ।'
(৮) 'গভীর মনোনিবেশ ও ধ্যান ।'

কুরআনে চার প্রকার মনোনিবেশ ও ধ্যানের কথা উল্লেখ আছে । পবিত্র কুরআনে চারটি বিভিন্ন শব্দে প্রত্যেক প্রকার ধ্যানকে বর্ণনা করা হয়েছে । এই

www.pathagar.com

ধ্যান ও সাধনা

শব্দগুলির অর্থ ও তাৎপর্যে গভীর পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে । কিন্তু দুঃখের বিষয়, আরবী ভাষা ব্যতিরেকে অন্য কোন ভাষায় এদের সঠিক প্রতিশব্দ নেই । তবে এখানে এই শব্দগুলির সঠিক অর্থ, তাৎপর্য, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করব । ধ্যান ও সাধনার এই চারটি বিভাগ নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

(১) 'তাফাক্কুহ্'
(২) 'তাদাব্বুর'
(৩) 'তফাক্কুর' এবং
(৪) 'তা-আক্কুল' ।

(১) কোন বস্তু সম্পর্কে সম্যক ও সত্য জ্ঞান লাভ করতে হলে জ্ঞান লাভের উপযোগী সাধারণ উপায়গুলিকে প্রয়োগ ও ব্যবহার করতে হবে । যারা তা করে না, তাদেরকে কুরআনে অন্ধ, বধির এবং বোকা বলে বর্ণনা করা হয়েছে । তাদের জানোয়ারের চেয়েও নিকৃষ্ট বলে তিরস্কার করা হয়েছে । কুরআন ৩ ঃ ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ৪ ঃ ৯৮; ২৮ ঃ ১৫ প্রভৃতি আয়াতে সারা দেহের প্রত্যেক অংগ ও যন্ত্রকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত

তাফাক্কুহ

করে প্রত্যেক ঘটনা ও অভিজ্ঞতা হতে সম্যক জ্ঞান লাভ করে তাদের সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে । বস্তুত জীবনে প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি ঘটনা, প্রতি অবস্থা ও বস্তু হতে সম্যক জ্ঞানলাভ করার প্রচেষ্টাই মানুষকে সম্যক ও সত্য জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম করে তোলে । এটাই হলো তাফাক্কুহ্ ।

(২) 'তাদাব্বুর'—কোন বিষয় বা বস্তুকে তন্ন তন্ন পর্যবেক্ষণ করে তাদের সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ দ্বারা তাদের অস্তিত্বের মূল ও মুখ্য উদ্দেশ্য

তাদাব্বুর

সঠিকভাবে বের করার প্রচেষ্টাই হলো 'তাদাব্বুর' । অতি সংক্ষেপে বলতে গেলে আমাদের গোচরীভূত যেকোন বস্তু, ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে ভেতর বাইর খুঁটিনাটি সব কিছু সম্যক উপলব্ধি ও হৃদয়ংগম করাই হলো 'তাদাব্বুর' ।

(৩) 'তাফাক্কুর'—সর্বদা কোন বিশেষ বিষয় ও বস্তু সম্পর্কে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে তার মূল ও মুখ্য কারণ ও উৎস খুঁজে বের করাই হলো

তাফাক্কুর

'তাফাক্কুর' । এটা প্রকৃতি রূপ মহাগ্রন্থকে পর্যবেক্ষণ করে স্রষ্টার সৃষ্টি পালন ও পোষণ, নিয়ম ও পদ্ধতি খুঁজে বের করে এবং উপলব্ধি করে যে, এই সমস্ত ঐশ্বরিক নিয়ম, উপায় ও পদ্ধতি অর্থাৎ

www.pathagar.com

রব্বিয়াত-এর ভেতর দিয়েই সমস্ত বস্তু, বিষয় ও ঘটনা রূপ ধারণ করে এবং তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করে। বৈজ্ঞানিক সত্য অনুসন্ধিৎসু মনের পক্ষে 'তাফাক্কুর' প্রথম এবং অত্যাবশ্যকীয় উপায়। বস্তুত প্রাকৃতিক নিয়মসমূহ উপলব্ধি করার জন্য বিশ্ব ও সৃষ্টির সমস্ত বস্তু, বিষয় ও ঘটনাকে তন্ন তন্ন করে পাঠ ও পর্যবেক্ষণই হলো 'তাফাক্কুর'।

(৪) 'তা-আক্কুল'—আমাদের চারপাশের বস্তু, বিষয় ও ঘটনা সম্পর্কে যেরূপ জ্ঞান লাভ করলে তাদেরকে আমাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সঠিক প্রয়োগ ও ব্যবহার করা চলে, সেরূপ জ্ঞান লাভের প্রচেষ্টাই হলো 'তা-আক্কুল'।

তা-আক্কুল

এটা শুধু বস্তু, ঘটনা ও বিষয়সমূহের বিশেষ গুণ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করে ক্ষান্ত না হয়ে, যে সমস্ত বস্তু, বিষয় ও ঘটনাতে এদের প্রয়োগ ও ব্যবহার করা হবে তাদের বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও সম্যক ও সঠিক জ্ঞানলাভ করে। এই বিশেষ জ্ঞান আমাদেরকে প্রত্যেক বস্তু, বিষয় ও ঘটনা যে উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হয়েছে, ঠিক সেই উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করতে শিক্ষা দেয়।

এভাবে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইসলামী উপায় ও পদ্ধতি অনুসারে দুনিয়ার সব কিছুর সম্যক জ্ঞান লাভ করে তাদের সঠিক প্রয়োগ ও ব্যবহার করলে কি সুখ-শান্তির এবং আরামদায়ক সৃষ্টিই না গড়ে উঠবে।

www.pathagar.com

ইজতিহাদ ও ইজমা

ইসলাম ও কুরআনকে পাঠ ও ব্যাখ্যা করার আরও একটি বিশেষ উপায় ও পদ্ধতি আছে । বস্তুত এই বিশেষ উপায় বা পদ্ধতিকে ইসলামী পরিভাষায় 'ইজতিহাদ' বলে । 'ইজতিহাদ'কে ইসলামী আইন-কানুন ও বিধি-নিষেধের একটি বিশেষ উৎসও বলা হয়ে থাকে । ইজতিহাদ শব্দটি 'জাহ্‌দ' শব্দ হতে উৎপত্তি । 'জাহ্‌দ' শব্দের অর্থ হলো ব্যক্তি-বিশেষের শক্তি ও যোগ্যতা অনুসারে যথাসাধ্য চেষ্টা করা । 'ইজতিহাদ' বিশেষ অর্থে কোন সন্দেহযুক্ত এবং জটিল নিয়ম বা বিধি-নিষেধ সম্পর্কে সঠিক ও সম্যক মতামত দেবার জন্য বিশিষ্ট আইনজ্ঞদের স্বকীয় শক্তি ও প্রতিভার পূর্ণ প্রয়োগ দ্বারা যথাসাধ্য চেষ্টা করাকেই বোঝায় । ইসলাম যুক্তি-তর্ক ও বিচার বুদ্ধির প্রয়োগকে আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আইন বিষয়ক, এক কথায় প্রত্যেক ব্যাপারে স্বীকার করে । কুরআনে বার বার যুক্তিতর্ক ও বিচারবুদ্ধির কাছে আবেদন করা হয়েছে ঃ

যুক্তিতর্ক ও বিচারবুদ্ধি

(১) 'তোমরা কি চিন্তা কর না ?'

(২) 'তোমরা কি হৃদয়ঙ্গম ও উপলব্ধি কর না ?'

(৩) 'তোমাদের কি সাধারণ জ্ঞান নেই ?'

(৪) 'চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য এতে যথেষ্ট নিদর্শন রয়েছে ।'

(৫) 'জ্ঞানী লোকদের বোঝার ও উপলব্ধি করার মত যথেষ্ট নিদর্শন এতে রয়েছে ।'

যারা সম্যক জ্ঞান লাভ করার জন্য স্বকীয় যুক্তিতর্ক ও বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে না, তাদেরকে জানোয়ারের সাথে তুলনা এবং বধির, বোকা ও অন্ধ বলে বর্ণনা করা হয়েছে—একথা আগেই বলেছি ঃ

(১) 'বধির, বোকা এবং অন্ধ; সুতরাং তারা বুঝতে পারে না ।' ২ ঃ ১৭১

(২) 'তাদের অন্তর আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করতে পারে না । তাদের চক্ষু আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখতে পারে না । কান আছে কিন্তু তা

www.pathagar.com

দিয়ে তারা শুনতে পারে না । তারা গৃহপালিত পশুর ন্যায় । না, তারা আরও নিকৃষ্টতর ভ্রমের ভেতর আছে ।' ৭ ঃ ১৭৯

(৩) 'আল্লাহ্‌র নিকট নিকৃষ্টতম জানোয়ার হলো যারা বধির ও বোকা এবং যারা কোন কিছুই বুঝতে পারে না ।' ৮ ঃ ২২

(৪) 'তোমরা কি মনে কর তাদের অধিকাংশই শুনতে ও বুঝতে পারে ? তারা গৃহপালিত জানোয়ার বিশেষ; না, তারা সত্য ও খাঁটি পথ হতে দূরে বিচরণ করে ।' ২৫ ঃ ৪৪

যারা প্রতি কাজে, প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি ঘটনায় জ্ঞান ও বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে না, তাদের যেমন কুরআনে কঠোরভাবে তিরস্কার করা হয়েছে, ঠিক তেমনি যারা এটা করে থাকে, তাদের কুরআনে ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে । 'বেহেশ্‌ত ও দুনিয়া সৃষ্টির ভেতর, দিবা বা রাতের পরিবর্তনের মাঝে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোকদের জন্য যথেষ্ট চিহ্ন রয়েছে । উঠতে, বসতে, শয়নে-স্বপনে যারা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং বেহেশ্‌ত ও দুনিয়ার সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে,' (৩ ঃ ১৮৯, ১৯০) তাদের জন্যই অফুরন্ত মঙ্গল ও পুরস্কার নিহিত আছে । বস্তুত প্রত্যাদেশ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ইসলামের মূলনীতি ও বিধি-নিষেধকে 'ইজতিহাদ' স্থান, কাল, অবস্থা, প্রয়োজন ও সময়োপযোগী করে ।

ইজতিহাদ

এটা ইসলামকে একটা প্রগতিশীল জীবনবিধিতে পরিণত করে । অবশ্য কুরআন এবং হাদীসে বর্ণিত মূলনীতির কোন পরিবর্তন হতে পারে না । কারণ এসব মূলনীতি সাধারণ এবং চিরন্তন সত্য । বর্তমান আইন প্রণয়নকারীদের চিন্তাধারাকে অবস্থা এবং সময়োপযোগী করে ইসলামী মূলনীতিগুলিকে মানব জীবনের নানা জটিল সমস্যার সমাধানকল্পে ইজতিহাদ এক বিরাট এবং বিপুল সম্ভাবনা আমাদের সামনে তুলে ধরে । কুরআনে প্রধানত মূলনীতি ও মৌলিক সত্যই লিপিবদ্ধ আছে । এটা হতে নতুন নতুন সমস্যার নতুন নতুন সমাধান করে নতুন নতুন আইন প্রণয়নের এক বিরাট সম্ভাবনা মানবের যুক্তিজ্ঞান, বিচারবুদ্ধি ও সৃজন প্রতিভার সামনে তুলে ধরেছে । বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে, মানব জীবনে কত নতুন অবস্থা ও সমস্যার উৎপত্তি হবে তার ইয়ত্তা নেই । এসব নিত্যনতুন সমস্যার খুঁটিনাটি সমাধান কোন বিশেষ গ্রন্থেই দেয়া সম্ভবপর নয় । তাই প্রকৃতি ও সৃষ্টির মৌলিক নীতি এবং সত্যই প্রধানত কুরআনে লিপিবদ্ধ আছে । এটা সব যুগে, সব দেশে, সব অবস্থায় সমানভাবে প্রযোজ্য হবে ।

www.pathagar.com

আগামীকালের অজানা অবস্থা ও সমস্যার কথা চিন্তা করেই কুরআনে বার বার যুক্তিজ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে । কুরআনে এবং হাদীসে যে সম্পর্কে সরাসরি এবং সঠিক নির্দেশ নেই সে সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য এবং আগামী দিনের অজানা অবস্থা ও সমস্যার সমাধান হযরত মুহাম্মদ (সা) ইজতিহাদের দ্বারা করতে বলেছেন । নিম্নলিখিত আয়াত ও হাদীস হতেই ইসলামে ইজতিহাদের উৎপত্তি । 'যারা আমাদের পথে চেষ্টা, সাধনা ও সংগ্রাম করে (জাহাদু) আমরা নিশ্চয়ই তাদেরকে আমাদের পথে পরিচালনা করি ; কারণ 'যারাই ভাল কাজ করেন নিশ্চয়ই তাদের সাথে আল্লাহ্ আছেন ।' ২৯ ঃ ৬৯ এয়মনের শাসনকর্তা নিযুক্ত হবার পর রসূলে করীম মুয়াজকে কি নিয়ম মোতাবেক শাসনকার্য পবিচালনা করবেন জিজ্ঞেস করায় তিনি জবাব দিলেন, 'কুরআনের নিয়মানুসারে ।' 'কিন্তু তার ভেতর যদি কোন নির্দেশ না পাও' রসূলে করীম জিজ্ঞেস করলেন । 'তাহলে আল্লাহ্র রসূলের সুন্নত অনুসারে কাজ করব ।' তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করা হলো, 'যদি হাদীসে কোন সঠিক নির্দেশ না পাও ।' তিনি জবাব দিলেন, 'তা হলে আমি আমার বিচারবুদ্ধি ও যুক্তি জ্ঞানের প্রয়োগ করব এবং তদনুসারে কাজ করব ।' রসূলে করীম মাথা নাড়লেন এবং বললেন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্তা'আলার জন্য, যিনি তাঁর রসূলকে তাঁর ইচ্ছানুসারে পথপ্রদর্শন করেন ।' এই হাদীস দ্বারা রসূলে করীম যে জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ সমর্থন করেছেন এবং সাহাবীগণও যে এ নীতি সম্পর্কে জানতেন তা সুস্পষ্ট বোঝা যায় এবং আরো প্রতীয়মান হয় যে—রসূলে করীমের জীবদ্দশায়ও রসূলে করীম ছাড়া অন্য সবাই প্রয়োজন মোতাবেক ইজতিহাদের প্রয়োগ ও ব্যবহার করেছেন । কিন্তু তাই বলে যে কেউ কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত মূলনীতি ব্যাখ্যা করলে তা মানা চলবে না । এজন্য ব্যাখ্যাকারীর বিশেষ যোগ্যতার প্রয়োজন । ইজতিহাদের দ্বারা সঠিক এবং নির্ভুল ব্যাখ্যা ও সমাধানে পৌঁছার জন্যই কতগুলি সাধারণ নিয়ম লিপিবদ্ধ করা আছে । বড় বড় মুজতাহিদ ও ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইজতিহাদের দ্বারা সত্য, সঠিক ও নির্ভুল সিদ্ধান্ত ও সমাধানে পৌঁছার জন্য নিম্নলিখিত উপায় ও পদ্ধতির প্রয়োগ করতে বলেছেন ঃ

ইজতিহাদের উৎপত্তি

(ক) কিয়াস্—সাদৃশ্য হতে উদ্ভূত যুক্তি ।

(খ) ইসতিদলাল—যুক্তি দ্বারা নতুন নীতির প্রবর্তন ।

www.pathagar.com

(গ) ইসতিহ্সান—সমতা ও ন্যায় ।

(ঘ) ইসতিস্লাহ্—জনকল্যাণ।

(ঙ) ইজমা—বিশিষ্ট আলেম ও ব্যবহার শাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সমবেত মত ।

(ক) কিয়াস্—এসব উপায় ও পদ্ধতির ভেতর কিয়াস হলো সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য, প্রয়োজনীয় ও সার্বজনীন । কোন বিশেষ বিষয় বা বস্তুর সাথে তুলনামূলক বিচার দ্বারা সিদ্ধান্তে পৌঁছার নামই কিয়াস্ । অতি সংক্ষেপে এটা সাদৃশ-এ তুলনাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠা যুক্তি । কুরআন বা হাদীসে কোন বিষয়ে সঠিক নির্দেশ না থাকলে—মুজতাহিদগণ কুরআন ও হাদীস হতে ঠিক ঐ ধরনের অপর কোন সাদৃশ্য খুঁজে বের করে এবং সাদৃশ্য ও তুলনাকে ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত ও সমাধানে উপনীত হন । সুতরাং এটা কুরআন এবং হাদীসে উল্লেখিত নিয়ম ও বিধি-নিষেধে প্রসারণ ও বিস্তৃতি মাত্র । কিন্তু কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত নিয়ম ও সমাধানের মত এটা তত সঠিক ও নির্ভুল নাও হতে পারে । কিয়াস্কে ভিত্তি করে গড়ে উঠা আইন ও নীতি সম্পূর্ণ নির্ভুল ও চূড়ান্ত হতে পা না । ইজতিহাদে এটা একটি সর্ববাদীসম্মত নীতি যে, মুজতাহিদ কোন বিশেষ সিদ্ধান্ত ও সমাধানে পৌঁছতে ভুল করতে পারে । সুতরাং এক যুগের কিয়াস্ পরের যুগের কিয়াস্ দ্বারা পরিত্যক্ত হতে পারে ।

কিয়াস্

(খ) ইসতিদলাল—যুক্তি দ্বারা এক নীতি হতে আর এক নতুন নীতির প্রবর্তনকেই ইসতিদলাল বলা হয় । ইসলামের আবির্ভাবের আগে আরব দেশে প্রচলিত রীতিনীতি যদি ইসলামে নিষিদ্ধ না হয়ে থাকে তবে তা নিয়ম বলে ধরা হয়ে থাকে । এই নীতির উপর ভিত্তি করে সব দেশে, সব যুগে প্রচলিত রীতিনীতি যদি ইসলামের মূলনীতির বিরোধী না হয় তবে তা মেনে চলতে হয় । বস্তুত প্রচলিত রীতিনীতি অধিকাংশ লোকের দ্বারা স্বীকৃত বলে এটাকে ইজ্মা বলে পরিগণিত করা হয় এবং সাদৃশ্য হতে উদ্ভূত বিধি-নিষেধ হতে এটা বেশি শক্তিশালী । বস্তুত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করলে যেকোন নীতি বা নিয়ম হতে যুক্তিতর্ক দ্বারা আর এক নতুন নীতি বা নিয়ম প্রবর্তন করাই হলো ইসতিদলাল ।

ইসতিদলাল

(গ) ইসতিহ্সান—ন্যায়, সমতা এবং জনকল্যাণকে ভিত্তি করে ব্যক্তিগত যুক্তি, জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে কোন সিদ্ধান্ত বা সমাধানে উপনীত

www.pathagar.com

ইসতিহ্সান

হওয়ার নামই হলো ইসতিহ্সান । এই উপায় ও পদ্ধতি কুরআনের মূলনীতি অনুসারেই সম্ভবপর । এতে ভুল হওয়ার আশংকা খুবই কম । এটা হানাফীগণই বেশি প্রয়োগ করে থাকেন ।

(ঘ) ইসতিস্লাহ্—ইমাম মালিক ঠিক এরূপ উপায় ও পদ্ধতিকেই ইসতিস্লাহ্ রূপে ব্যবহার করেছেন । জনকল্যাণকে ভিত্তি করে কোন এক নীতি হতে আর এক নতুন নীতি বা নিয়মের প্রবর্তনকেই ইসতিস্লাহ্ বলা হয় ।

(ঙ) ইজ্মা—ইজ্মা শব্দটি 'জামাআ' অর্থাৎ সমবেত হওয়া বা একত্রিকরণ হতে উদ্ভূত । ইজ্মা সাধারণত দুই অর্থে ব্যবহৃত হয় । (১) কোন অমীমাংসিত বিষয় বা নীতি সম্পর্কে মীমাংসা করা এবং স্থির সিদ্ধান্ত ও সমাধানে উপনীত হওয়া; এবং (২) এই মীমাংসা, সিদ্ধান্ত বা সমাধানে একমত হওয়া । মুসলিম ব্যবহার-শাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ও মুজতাহিদদের মতে কোন বিশেষ নীতি সম্পর্কে কোন বিশেষ যুগের মুজতাহিদ বা ব্যবহার-শাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের ঐক্যবদ্ধ মতই হলো ইজ্মা । এই মতের ঐক্য তিন উপায়ে ধরে নেয়া হয় । প্রথমত 'কওল' দ্বারা অর্থাৎ মীমাংসিত প্রশ্ন সম্পর্কে সর্ববাদী স্বীকৃত মুজতাহিদগণের প্রকাশ্য অভিমত জ্ঞাপন, দ্বিতীয় 'ফে'ল' বা কাজ দ্বারা যখন সবাই বাস্তব জীবনে এর প্রয়োগ ও আমল করেন এবং তৃতীয়ত 'সুকুৎ' বা নীরবতা দ্বারা অর্থাৎ যখন কোন এক বা একাধিক মুজতাহিদ দ্বারা মীমাংসিত বিষয় বা নীতি সম্পর্কে অন্যান্য মুজতাহিদ নীরব থাকেন ।

ইজ্মা

ইজ্মা অর্থে সাধারণত মুসতাহিদদের মতের ঐক্যকেই বোঝায় এবং যাদের শরীয়ত সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান নেই, তাদের মতামতের মূল্য দেয়া হয় না এবং তারা এতে যোগদানও করে না । কিন্তু অনেকের মতে ইজ্মা অর্থ হলো নাবালক এবং পাগল ছাড়া সমস্ত মুসলমানের মতের ঐক্য । ইজ্মা কোন বিশেষ স্থান বা কোন বিশেষ এক বা একাধিক যুগের ভেতর সীমাবদ্ধ কি-না এ বিষয়ে যথেষ্ট মতানৈক্য রয়েছে । ইমাম মালিক তাঁর ইজ্মা মদীনার জনমতের উপর ভিত্তি করে করেছিলেন । এই ধরনের কোন সীমাবদ্ধকরণ যুক্তিসঙ্গত এবং গ্রহণযোগ্য নয় । কারণ বিশিষ্ট আলিমগণ শুধু মদীনাতেই ছিলেন না, এখনও নেই । এমনকি রসূলে করীমের জীবদ্দশায়ও আলিমদের দেশের সর্বত্র পাঠানো হয়েছিল । সুতরাং সমস্ত দেশের লোকদের মতামতই

www.pathagar.com

গ্রহণ করতে হবে । সুন্নীরা শিয়াদের মতামত এবং শিয়াগণ সুন্নীদের মতামত অগ্রাহ্য করে । শিয়ারা আরো দাবি করে যে, শুধু রসূলে করীমের বংশধরগণই ইসতিহাদ করতে পারেন— অন্য কেহ নয় । কোন কোন সুন্নীদের মতে রসূলে করীমের সাহাবাদের ভেতরই ইজতিহাদ সীমাবদ্ধ । আবার অনেকে পরবর্তী যুগ পর্যন্ত এর মেয়াদ বৃদ্ধি করেন । কিন্তু সাধারণ মত হলো যে, ইজ্‌মা কোনো বংশ, স্থান বা যুগ বিশেষের ভেতর সীমাবদ্ধ নয় । সুতরাং কোন বিশেষ যুগে সমস্ত দেশের অন্তত পক্ষে সমস্ত মুজতাহিদের মতের ঐক্যকেই ইজ্‌মা বলা চলে । এটা আপাত দৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হলেও উল্লিখিত তিন উপায়ে বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন সমস্যার সমাধানকল্পে ইজ্‌মা এক বিরাট এবং বিপুল সম্ভাবনার সূচনা করে ।

একই যুগ অথবা পরবর্তী যুগে এক ইজ্‌মা অপর আর এক ইজ্‌মা দ্বারা বাতিল হতে পারে ।

উপরের আলোচনা হতে স্বভাবতই মনে হয় যে, সত্যিকার ইজ্‌মাতে পৌঁছতে হলে অনেক মুজতাহিদের মতের ঐক্য প্রয়োজন । কিন্তু অনেকের মতে দুই বা তিনজন মুজাহিদ, এমনকি একজন মুজতাহিদের মতকেও মেনে চলতে হবে, যদি সেই যুগে মাত্র একজনই মুজতাহিদ থাকেন । ইজ্‌মা দ্বারা মীমাংসিত মত, সিদ্ধান্ত ও সমাধান অবশ্যই কুরআন এবং হাদীসের মূলনীতি মোতাবেক হবে ।

বর্তমানে ইজ্‌মা সাধারণত ভুল অর্থে ব্যবহৃত হয় । কারণ এটা সাধারণত অধিক সংখ্যকের মতের ঐক্যের উপর বিশেষ জোর দেয় এবং কোন মুসলিম ইজ্‌মার বিরোধিতা করলে গুণাহ্‌গার হবে বলে মনে করা হয় । সাধু মতানৈক্য পাপ নয় ; বরং রসূলে করীম একে সওয়াব বলে বর্ণনা করেছেন ঃ

সাধুমতানৈক্য

"আমার উম্মতদের ভেতর মতানৈক্য রহমতস্বরূপ।" সাধু মতানৈক্যকে রহমতরূপে বর্ণনা করা হয়েছে । কারণ সাধু মতানৈক্যের ভেতর দিয়েই যুক্তিজ্ঞান ও মানুষের সৃজন-প্রতিভা উন্নত ও পূর্ণ বিকশিত এবং সত্য ও সম্যক জ্ঞান লাভ হয় । রসূলে করীমের সাহাবাগণের ভেতরও মতানৈক্য ছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কোন একজন সাহাবী অন্য সমস্ত সাহাবীর মতের বিরুদ্ধে সাহসের সাথে দৃঢ়ভাবে স্বীয় মত প্রকাশ, ব্যক্ত ও প্রচার করেছেন । কারণ হযরত আবুজর একাই এই

www.pathagar.com

মত পোষণ করতেন যে, কোন ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে ধনসম্পদ জমা করা অন্যায় । তাঁর মতে ধনসম্পদ জমা করা উচিত নয় এবং কেউ জমা করলেও সাথে সাথে গরীবদের ভেতর প্রয়োজনমত সমভাবে বিতরণ করা উচিত । অন্য কোন সাহাবী এ মতামত সমর্থন, প্রচার এবং ব্যক্তি বা সমাজ-জীবনে প্রয়োগ না করলেও তাকে বিরোধিতা অথবা গুণাহ্‌গার বলেও বর্ণনা করেননি । রসূলে করীমের একটি হাদীসে ইসতিহাদে ভুল করলেও মুজতাহিদ পুরস্কার পাবে বলে বর্ণনা করা হয়েছে ।

'কোন বিচারক স্বকীয় যুক্তিজ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে সঠিক বিচার করলে দ্বিগুণ পুরস্কার পান, কিন্তু তিনি স্বকীয় যুক্তিজ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে যদি ভুল বিচারও করেন তবুও পুরস্কার পান ।'

চরম পরিতাপের বিষয় এই যে, যদিও ইজতিহাদ ইসলামের চার মহান ইমাম (ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফী ও ইমাম হাম্বল) এবং তাঁদের পরবর্তী শিষ্যদের দ্বারা কখনও পূর্ণ ও চূড়ান্ত বলে পরিগণিত হয়নি, তবুও চার ইমাম ও তাঁদের পরবর্তী দু'জন বিশিষ্ট শিষ্যের (ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহম্মদ) ইজতিহাদকে কুরআন এবং হাদীসের ন্যায় পূর্ণ এবং চূড়ান্ত বলে বিবেচনা করা হয় । সুতরাং অন্য কেউ ইজতিহাদের উপযুক্ত নয় । এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও অজ্ঞানতাই মুসলমানদের এই চরম অধঃপতনের জন্য মূলত দায়ী । ইজতিহাদের দরজা মহান ইমামদের পর বন্ধ হয়েছে মনে করা মহা ভুল । কুরআন এবং হাদীসে অতীব সুষ্ঠুভাবে বার বার স্বাধীন মতামত ব্যক্ত এবং যুক্তিজ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধি দ্বারা উপস্থিত সমস্যার সমাধান করতে বলা হয়েছে । কুরআন ও হাদীসের এসব নির্দেশকে ভিত্তি করেই মুসলিম জাহান বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে ।

ইজতিহাদ পূর্ণ ও চূড়ান্ত নয়

রসূলে করীমের জীবদ্দশায়ও সাহাবাগণ ইজতিহাদের প্রয়োগ ও ব্যবহার করেছেন, তা আমরা আগেই দেখেছি । রসূলে করীমের ইন্‌তিকালের পর খলীফাগণ তাঁদের অধিকাংশ উপদেষ্টার মত নিয়ে নিত্যনতুন অবস্থা ও সমস্যার সমাধানকল্পে নিত্যনতুন নিয়ম ও আইন প্রণয়ন করেছেন এবং সাহাবাগণ গুরুত্ব ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও মতামত দিয়েছেন । পরবর্তী প্রত্যেক যুগ আগের মতামত ও সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হয়ে নতুন মত ও সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে । হিজরীর দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইজতিহাদ জগতে চার মহান

www.pathagar.com

ইমামের আবির্ভাব হয় । একের পর আর এক মহান ইমামের আবির্ভাব হয় এবং প্রত্যেকেই তাঁর আগের ইমামের মতামত সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত হননি । এদ্বারা এটাও প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম মানুষের যুক্তিজ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ দ্বারা নতুন অবস্থা ও সমস্যার সমাধানকে স্বীকার করেছে । এই মহান ইমামগণ শুধু নতুন অবস্থার নতুন সমাধান করেই ক্ষান্ত হননি, তাঁদের ভেতর জ্ঞান ও ব্যবহারশাস্ত্র বিষয়ক নীতি সম্পর্কেও যথেষ্ট মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয় । এটা দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, তাঁদের কেউ অন্যান্য মহান ইমামের মতকে সম্পূর্ণ নির্ভুল ও চূড়ান্ত বলে মনে করেননি । তখনই যদি তাঁদের সম্পর্কে নির্ভুল, চূড়ান্ত ও নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়ে না থাকে, তবে শত শত বছর পরে যখন নতু নতুন অবস্থা ও নতুন নতুন সমস্যার নিত্যনতুন সমাধান প্রয়োজন, তখন বারশো বছর আগের মহান ইমামদের ইজতিহাদকে পূর্ণ, নির্ভুল ও চূড়ান্ত বলে মেনে নেয়াকে বোকামি ছাড়া আর কি বলা যেতে পাবে ?

হযরত মুহম্মদ স্বয়ং ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এর প্রয়োগ করতে বলেছেন ; কিন্তু তিনি একথা বলে যাননি যে, কোন বিশেষ ইমাম বা যুগের পর আর ইজতিহাদের প্রয়োজন হবে না । এমনকি ইসলামের মহান চার ইমাম এবং তাদের পরবর্তী শিষ্যগণও ইজতিহাদের দরজা বন্ধ করেননি । ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফী অথবা ইমাম হাম্বল কখনও একথা বলেননি যে, তাঁদের পর আর কোন মুসলিম স্বাধীন মতামত ব্যক্ত এবং স্বকীয় জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে ইসলামের মূলনীতি হতে নতুন অবস্থায় নতুন সমস্যার নিত্যনতুন সমাধান খুঁজে বের করতে সক্ষম হবেন না । তাঁদের কেউই নিজেদের মত বা রায়কে সম্পূর্ণ নির্ভুল ও চূড়ান্ত বলেও দাবি করেননি । ইসলামিক ব্যবহার শাস্ত্রের উসূল বা মূলনীতি সম্পর্কীয় কোন কেতাবেই একথা উল্লেখ নেই যে, চার ইমামের পর আর কোন মানুষ স্বকীয় যুক্তিজ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে নিত্যনতুন নিয়ম, আইন ও সমাধান খুঁজে বের করতে পারবেন না । এই চার ইমামের ইজতিহাদ কুরআন ও হাদীসের ন্যায় পূর্ণ এবং চূড়ান্ত নয় ।

বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন সমস্যার নিত্যনতুন সমাধান করে বিভিন্ন জাতিকে এক মহান মানব-জাতিতে পরিণত করার পক্ষে ইজতিহাদ ছিল মুসলমানদের কাছে রহমত বা আশীর্বাদস্বরূপ। রসূলে

www.pathagar.com

করীম, তাঁর কোন সাহাবী অথবা মহান ইমামদের ভেতর কেউ একথা কখনও বলেননি যে, কোন নির্দিষ্ট সময়ের পর হতে মুসলমানগণ ক্রমবর্ধমান এবং প্রগতিশীল মানবজাতির সদা পরিবর্তনশীল অবস্থা ও প্রয়োজনে স্বকীয় যুক্তিজ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে নিত্যনতুন সমাধান করতে সক্ষম হবেন না। একথাও কেউ বলেননি এবং কেউ তা বলতেও পারেন না যে, হিজরীর দ্বিতীয় শতাব্দীর পর আর কোন নতুন অবস্থা ও সমস্যার উদ্ভব হবে না। তৃতীয় শতাব্দীতে বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানী ব্যক্তিগণের দৃষ্টি শুধু হাদীস সংগ্রহ ও সমালোচনাতেই নিবদ্ধ ছিলো। তাছাড়া ইসলামের মহান ইমামগণ পাণ্ডিত্য, বুদ্ধিজ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধিতে এতই উঁচু স্তরে উঠেছিলেন যে, পতবর্তীকালের মুজতাহিদগণ এঁদের তুলনায় নগণ্য বলে পরিগণিত হলেন। ফলে মুসলমানদের ভেতর এমন ধারণা বদ্ধমূল হলো যে, এই ইমামদের মতামত ও সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে কোন মুজতাহিদই স্বাধীনভাবে মতামত দিতে ও সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হবেন না। এই ধারণা ইজতিহাদ এবং স্বাধীন মতামত ব্যক্ত এবং স্বকীয় যুক্তিজ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগের উপর ইসলাম সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা সত্ত্বেও শেষে সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ হয়ে পড়লো। এরূপ ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে মুসলমানদের সৃজন প্রতিভা, যুক্তি-জ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধির ক্রমোন্নতি ও বিকাশ বন্ধ হলো এবং এর স্থানে অজ্ঞানতা ও অন্ধ বিশ্বাস মুসলিম সমাজকে দিন দিন অধঃপতনের দিকে ঠেলে দিলো।

পবিত্র কুরআনে পরিষ্কাররূপে প্রত্যেক মানুষের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার অধিকারকে স্বীকার করে একমাত্র আল্লাহ্ এবং তাঁর প্রেরিত রসূলকে অনুসরণ করতে নির্দেশ দেয়। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ 'হে মোমেনগণ, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলকে অনুসরণ কর এবং তোমাদের ভেতর যাঁরা নেতৃস্থানীয় তাঁদের ; তারপর তোমাদের ভেতর কোন বিষয়ে মতানৈক্য হলে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের নির্দেশ মেনে চলো' ৪—৫৯। এই আয়াতের প্রথমে আল্লাহ্ এবং রসূলকে অনুসরণ করার সাথে সাথে উলুল-আমর বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকেও অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। কিন্তু কোন মতানৈক্য হলে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের প্রদর্শিত মত ও পথেই তার মীমাংসা করতে বলা হয়েছে। পরের আয়াতে উলুল-আমর বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির কথা উল্লেখ না করে এই সুস্পষ্ট নির্দেশই মানবজাতিকে দেয়া হয়েছে যে, যদি কখনও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সাথে মতানৈক্য হয়, তবে কুরআন এবং হাদীস মোতাবেকই তার মীমাংসা

www.pathagar.com

করতে হবে। আধ্যাত্মিক বা রাজনৈতিক যে কোনরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিকেই উলুল-আমর বলা যেতে পারে এবং শুধু কুরআন ও হাদীস ছাড়া আর প্রত্যেক ব্যাপারেই মুসলমানদের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার এবং স্বকীয় যুক্তি-জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে নিত্যনতুন সমস্যার নিত্যনতুন সমাধান করার অধিকার দেয়া হয়েছে। কুরআন ও হাদীসের সত্যিকার ব্যাখ্যা করার জন্য স্বাধীন মতামত ব্যক্ত এবং যুক্তিজ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের অধিকারও প্রত্যেকের রয়েছে। সুতরাং রসূলে করীমের সাহাবা, মুহাদ্দিস, মহান ইমাম এবং মুজতাহিদগণকে উলুল-আমর হিসাবে নেহায়েত সাধারণভাবেই অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু প্রয়োজন ও বিচার-বোধে কুরআন, হাদীস মোতাবেক এঁদের যেকোন একজন বা সবার মত, সিদ্ধান্ত ও সমাধানের সাথে পরবর্তীকালে যে কোন মানুষের একমত না হবার অধিকার রয়েছে। যেহেতু হাদীসের অকাট্য সত্যতা ও বিশুদ্ধতাও কুরআনের উপরই নির্ভর করে, সেহেতু নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ইসলামে মানুষের স্বকীয় মতামত ব্যক্ত এবং যুক্তিজ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। যতক্ষণ না তা কুরআনের কোন নীতির বিরোধী হয়।

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, মুসলিম সমাজ প্রয়োজন ও বিচারবোধে কুরআনকে ভিত্তি করে সময় ও অবস্থানুসারে নিত্যনতুন আইন-কানুন গড়ে তুলতে পারবে। হাজার বছর পরেও মহান ইমামদের মত, সিদ্ধান্ত ও সমাধানের সাথে মতবিরোধ করা চলবে না এই ধরনের বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভুল। রসূলে করীমের পর যে কোন পণ্ডিত ও জ্ঞানী লোকের সাথে মতবিরোধ করার অধিকার প্রত্যেক মুসলমানের রয়েছে এবং তার ন্যায্য অধিকার হতে মুসলমানকে বঞ্চিত করার অর্থ ইসলামকে দুনিয়ার সামনে হেয়প্রতিপন্ন করা।

প্রায় চৌদ্দশো বছর পর আজ মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রসমূহের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হয়ে পড়েছে স্বকীয় পরিবর্তিত পরিবেশ, অবস্থা ও সমস্যার নিত্যনতুন সমাধান, কুরআনে বর্ণিত মূলনীতি হতে বের করা। তা করতে গিয়ে আমাদের একটি বিশেষ বিষয়ে নজর রাখতে হবে যে, কুরআনে বর্ণিত নীতিগুলি আবার কোন মূলনীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

রব্বুল আলামীন বা বিশ্বজগতের স্রষ্টা দুনিয়ার উপর তাঁর প্রদর্শিত পথ, উপায় ও পদ্ধতি বা রব্বিয়াৎ অনুসারে তাঁর উদ্দেশ্য বিশ্ব--পালন ও পোষণ

www.pathagar.com

অর্থাৎ রবুবিয়াতের কাজ করার জন্যই মানুষকে তাঁর খলীফা বা প্রতিভূ হিসাবে সৃজন করেছেন এবং দুনিয়ার উপর মানুষের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য রব বা স্রষ্টার সাথে রাবেতা বা সম্পর্ক স্থাপন করে রবুবিয়াত কায়েম করা । বস্তুত রবুবিয়াতকে কেন্দ্র করেই সব কিছু চলছে এবং কুরআনের সমস্ত বিধি-নিষেধের মূল ভিত্তি হলো রবুবিয়াত । সুতরাং সংক্ষেপে বলতে গেলে ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আল্লাহ্‌র প্রদর্শিত পথ, উপায় ও পদ্ধতিতে দুনিয়ার উপর রবুবিয়াত কায়েম করার জন্যই আমরা নিত্যনতুন সমাধান করতে সক্ষম হব । আল্লাহ্ প্রদর্শিত পথে দুনিয়ার উপর রবুবিয়াত অর্থাৎ রব্বানিয়াৎ বা বিশ্বপালনবাদ* কায়েম করার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমরা নিত্যনতুন সমস্যার নিত্যনতুন সমাধান খুঁজে বের করে আদর্শতম মানবগোষ্ঠী গড়ে তুলব এবং দুনিয়ার উপর চিরন্তন সুখ ও শান্তি কায়েম করব ।

*'রব্বানিয়াৎ' নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য ।

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র পরিচয়

আল্লাহ্ সম্পর্কে অতীতকালের সব অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারকে সংশোধন করে কুরআনের প্রারম্ভিক অধ্যায়ের প্রথম আয়াতে বজ্রনির্ঘোষে আল্লাহ্‌কে 'রব্বুল-আলামিন'রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। 'রব' সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বৈজ্ঞানিকরা সৃষ্টির ক্রমবিকাশের তত্ত্ব আবিষ্কার করার অনেক আগেই কুরআনে একথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, এক 'রব' বা স্রষ্টা পালন বা পোষণকর্তা, বিশ্ব ও সৃষ্টিকে ধাপের পর ধাপ পরিবর্তনের পর পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে কতকগুলি স্থায়ী ও সাধারণ ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতির নিয়মে সৃষ্টি করেছেন এবং পালন করেছেন এবং এক অবস্থা হতে অপর অবস্থার ভেতর দিয়ে একে ধীরে ধীরে কিন্তু সুনিশ্চিতরূপে চরম সুখ, শান্তি ও পূর্ণতা প্রাপ্তির দিকে এগিয়ে নেবেন। আল্লাহ্‌র ধারণা এর চেয়ে আর অধিক বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিসঙ্গত কি হতে পারে ? এর চেয়ে বিশ্বজনীনরূপ আর কি হতে পারে ? ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে আল্লাহ্ শুধু মুসলমানের নয়—জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র মানবের। আর শুধু মানবের বা এই দুনিয়ার নয়, এই বিবর্ণ বিশ্ব ও সৃষ্টিতে যা-কিছু জীবজন্তু ও বস্তু আছে, তিনি সব কিছুরই স্রষ্টা, পালনকর্তা, পোষণকর্তা ও রক্ষাকর্তা। বস্তুত রবই আল্লাহ্‌র সত্যিকার পরিচয়। রব হিসাবে রবুবিয়াত বা বিশ্বপালনই তাঁর প্রথম ও প্রধান কাজ। সুতরাং দুনিয়ার উপর আল্লাহ্‌র খলীফা বা প্রতিভূ হিসাবে মানবের প্রথম এবং প্রধান কাজ ও কর্তব্য হলো বিশ্বের পালন করা এবং জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের সামগ্রিক সুখ, শান্তি, উন্নতি, কল্যাণ ও পূর্ণ বিকাশের জন্য চেষ্টা, সাধনা ও সংগ্রাম করা।

'রব'

ইসলামের আল্লাহ্ ধারণা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিজ্ঞান সম্পন্ন, একথা আগেই বলেছি। এটা মানুষের যুক্তিজ্ঞান, প্রতিভা বা কোন বৈজ্ঞানিক সত্যের সাথে কোনরূপ বিরোধ সৃষ্টি করে না। 'একে তিন বা তিনে এক' এরূপ অবাস্তব এবং অসম্ভব উক্তি ইসলামের আল্লাহ্ ধারণায় নেই। গিবনের মতে, ইসলাম প্রতিটি বৈজ্ঞানিক সত্য ও আবিষ্কারের সাথে সমন্বয়সাধন করেছে। কারো সাথে বিরোধিতা না করে সমগ্র

আল্লাহ্ ধারণা

www.pathagar.com

সংঘাত-সংঘর্ষ, ঘাত-প্রতিঘাত ও বিপরীতমুখী দ্বন্দ্বের ভেতর সমন্বয়সাধন করাই ইসলামের বৈশিষ্ট্য। তাই আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করা কোন গোঁড়ামি, অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের ব্যাপার নয়। কুরআন বার বার মানুষের জ্ঞান, বিবেক ও প্রতিভার কাছে উঁচু করে ধরেছে এর আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাসকে এবং প্রকৃতিরূপ মহাগ্রন্থ হতে এর মূলনীতি, উৎসাহ, প্রেরণা, শিক্ষা ও সমাধান গ্রহণ করতে উপদেশ দিয়েছে। বর্তমান বস্তুবাদী যুগের অন্যতম বস্তুবাদী আর্ণেষ্ট হেকেলের 'মনিজম'কে একটু উন্নতরূপ প্রকাশ ও ব্যক্ত করলেই ইসলামের একত্ববাদে পরিণত হয়। ইসলামের একত্ববাদ মানুষের জ্ঞান-প্রতিভাকে প্রখর করে এবং দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের সবচেয়ে দুর্বোধ্য সমস্যাগুলির অতি সহজ সমাধান করতে সহায়তা করে। অন্যথায় তাদের এসব সমস্যা অস্পষ্ট ও অপূর্ণ থেকে যাবে। বৈজ্ঞানিকগণ সৎসাহসে ভর করে বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করুক যে, সর্বপ্রথম উৎপত্তির যে কারণ কুরআন আল্লাহ্‌র প্রতি আরোপ করেছেন তা পুরোপুরি স্বীকার না করা পর্যন্ত, যতই ঘোরাফেরা করুক না কেন—এ দুনিয়া ও সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে 'কখন' ও 'কেন'র জবাবে তারা নিজেরাই কোনদিন পূর্ণ সন্তুষ্টি লাভ করতে সক্ষম হবে না।

কেমন করে এনার্জি বা প্রাণশক্তির প্রথম প্রকাশ বা উৎপত্তি হলো ? কেমন করে ইলেকট্রোন বা প্রোটন দ্বারা বস্তু তৈরী হলো ? কেমন করেই বা মাধ্যাকর্ষণ নীতি নির্দিষ্ট হলো ? কখন এবং কিভাবেই বা এসব বিরাট এবং বৃহৎ সৌরজগৎ চালু হলো ? কি করে এবং কিভাবেই বা জীবাণু বা জীব-পরমাণু ধীরে ধীরে জীবন্ত, দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তিসম্পন্ন অনুভূতি ও চিন্তাশীল জীবে পরিণত হলো ? কে-ইবা মন, প্রাণ, মস্তিষ্ক ও প্রতিভার স্রষ্টা ও পরিপোষক ? যদি এনার্জি বা প্রাণ-শক্তি এবং বস্তু চিরন্তন ও চিরস্থায়ী হয়, তবে অন্যসব জিনিসই বা কেন হঠাৎ অবলীলাক্রম উৎপন্ন বা তৈরি হয়েছে বলে বিশ্বাস করব ? এসবকেও কেন চিরন্তন ও চিরস্থায়ী বলে স্বীকার করা হবে না ? কেমন করেই বা পরবর্তীকালে এসব উৎপত্তি হলো ? এই সৃষ্টির পেছনে কি কোন উদ্দেশ্য নিহিত নেই ? মিছামিছি এর উৎপত্তি হয়েছে ? স্বয়ং স্থায়ী, স্বয়ং সন্তুষ্ট, সর্বজ্ঞ, সবজান্তা সর্বশক্তিমান একজন সৃষ্টিকর্তার উপর বিশ্বাস না করলে উপরুল্লিখিত প্রশ্নগুলির কয়টা প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে বৈজ্ঞানিকগণ সক্ষম হবেন ? কোনো সুদক্ষ এবং পারদর্শী পদার্থবিদ্যাবিদকে জিজ্ঞেস করলে বলবেন যে, নিশ্চয়ই কোন প্রাথমিক কারণ আছে। এই প্রথম

www.pathagar.com

কারণকেই বলা হয় প্রথম স্রষ্টা। কিন্তু জীববিদ্যাবিদ প্রথম কারণ আছে বললেই সন্তুষ্ট হবেন না। তিনি জানতে চাইবেন কোথা হতে শুধু শক্তি নয়—জীবন এলো ? কখনও তিনি মনে করেন হঠাৎ অবলীলাক্রমেই এর উৎপত্তি হয়। আবার কখনও তিনি বলবেন, এটা নিশ্চয়ই অন্য কোন গ্রহ বা উপগ্রহ হতে এসে থাকবে। কুরআন বলে, চিরস্থায়ী এবং চিরজীবন্ত যিনি নিজেতেই বিকশিত ও প্রকাশিত সেখান হতেই এটা এসেছে। এটা সেই চিরনিয়ন্তা ও পরম স্রষ্টারই সৃষ্ট। কিন্তু দার্শনিক প্রথম কারণ অথবা জীবাণুর সৃষ্টির কথা বললেও সন্তুষ্ট হবেন না। তিনি সুস্পষ্টভাবে জানতে চাইবেন কি করে এই 'জীবসেল' বা জীবাণু একটা প্রতিভাসম্পন্ন মানুষের মত জীবে পরিণত হলো। তিনি জানতে চাইবেন যে, নিশ্চয়ই এর পেছনে শ্রেষ্ঠ প্রতিভা এবং সর্বশক্তিমান বিরাট মন রয়েছে। ইসলাম তাকে পূর্ণ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে, হ্যাঁ সেরূপ একজন আছেন, যাঁর এসব গুণই আছে। বস্তুত ইসলাম শুধু পদার্থবিদ বা দার্শনিককেই সন্তুষ্ট করবে না, সমস্ত চিন্তাশীল ব্যক্তি এবং বৈজ্ঞানিককেই সম্পূর্ণ সন্তুষ্টিজনক জবাব দেবে। কুরআনে বার বার মানুষকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে—**স্বকীয়** জ্ঞান ও প্রতিভার বিকাশ করার জন্য সদা সর্বদা চিন্তা-ভাবনা ও সাধনা **করে** সত্য ও সমাধান খুঁজে বের করতে। জগতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকরা মিলে একটি বৈজ্ঞানিক বোর্ড গঠন করে কুরআনের মারফত এই বিশ্ব বা সৃষ্টিরহস্যের 'কখন' এবং 'কেন' সম্পর্কে সব সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করুন। কুরআনের পাঠ, ব্যাখ্যা ও গবেষণা করার মত সময় ও ধৈর্য যদি তাঁদের না থাকে, তবে খুব সাবধানতা এবং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অন্তত আল্লাহ্‌তা'আলার নিরানব্বই গুণাবলীর পরিপূর্ণ অর্থ ও তাৎপর্য বুঝতে চেষ্টা করুন। তাহলেই তাঁরা সব কঠিন ও দুর্বোধ্য সমস্যাগুলির সুষ্ঠু ও সন্তোষজনক সমাধান খুঁজে পাবেন।

উপমাস্বরূপ 'রব' সম্পর্কে যে ধরনের আলোচনা আমরা করেছি এবং যে নাম স্মরণ করে মুসলমানরা তাদের প্রতিটি কাজ শুধু করে তার অর্থ, ব্যাখ্যা এবং তাৎপর্য বোঝার **চেষ্টাও** এবিষয়ে খুবই মূল্যবান ও সহায়ক হবে। **'বিস্‌মিল্লাহির রহমানুর রহীম'**—'পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে শুরু করিতেছি'—এটাই সাধরণত এর অর্থ বলে ধরা হয়। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই এর সত্যিকার অর্থ ও তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম হবে। শুধু আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে কাজ শুরু করলেই কি তা সর্বাঙ্গীন সুন্দর হবে—শেষ হবে ? এর

www.pathagar.com

ভেতর এমন কি সত্য বা তাৎপর্য লুক্কায়িত রয়েছে, যা মানুষকে প্রতি কাজে, প্রতি ক্ষেত্রে, অবস্থায়, প্রতি ঘটনায় সাফল্যমণ্ডিত করতে পারে। আল্লাহ্‌র বা স্রষ্টার নামে শুরু করার অর্থ হলো—সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি ? সৃষ্টির ভেতর আমার কর্তব্য কি ?—সৃষ্টির রহস্য, মূলনীতি, উদ্দেশ্য এবং সৃষ্টির ভেতর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, কর্তব্যকে সামনে রেখে এবং প্রকৃতির সাথে সমন্বয়সাধন করে প্রত্যেক বস্তু, ঘটনা ও সমস্যার রহস্য আবিষ্কার করে সেই মুহূর্তে, সেই ক্ষেত্রে, সেই অবস্থায় স্বকীয় কর্তব্য নির্ধারণ করা এবং তা হতে যেটুকু নিজের শেখার আছে, তা গ্রহণ করার প্রচেষ্টাই হলো আল্লাহ্‌র নামে শুরু করার আসল তাৎপর্য। এর জন্য প্রতি মুহূর্তে ও প্রতি ক্ষেত্রে খুব সতর্কতা ও গভীর মনোনিবেশের সাথে যা কিছু সামনে আসে তাকেই পুংখানুপুংখরূপে তন্ন তন্ন করে পর্যবেক্ষণ করে তার ভাল-মন্দ, দোষ-ত্রুটি, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা বিচার করতে হবে। এমনি করে প্রতিটি মানুষ প্রতি মুহূর্তে এবং প্রতি ক্ষেত্রে স্বকীয় জ্ঞান এবং প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের প্রয়াস পেলে কি বিরাট সম্ভাবনা এবং সাফল্যের ইশারা পাওয়া যায় তার ইয়ত্তা নেই।

'রহমান' ও 'রহীম'

তারপর 'রহমান' ও 'রহীম' এই দু'টি নামের উল্লেখ সব স্থানে, সব ক্ষেত্রে এবং সর্বদা করতে বলা হয়েছে। প্রথম রহমান নামের অর্থ এবং তাৎপর্য বুঝতে চেষ্টা করা যাক। রহমান যিনি মানুষের ক্রমবর্ধমান অভাব ও প্রয়োজন আগে থেকে অনুধাবন করেন এবং আগে থেকেই তা সরবরাহ করেন। এর জন্য মানুষের কোন চেষ্টা, সাধনা বা সংগ্রামের প্রয়োজন হয় না। যেমন ভূমি, বায়ু, পানি, মায়ের স্তনে দুধ এমনি আরো অনেক কিছু। শুধু এসব মৌলিক জিনিসগুলিকে অর্থবিজ্ঞানও স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু এই সমস্ত মৌলিক বস্তু ছাড়াও আল্লাহ্‌ রহমান হিসাবে আমাদের অনেক কিছু দিয়েছেন। যেমন দেহ, মন ও মস্তিষ্ক। বৈজ্ঞানিক একে 'দেয়া জিনিস' বলে। যা-কিছু এই মুহূর্তে আমার আয়ত্তে আছে—যা-কিছু আমার কাছে আছে—তা নিয়েই কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে। জ্যামিতি বিজ্ঞানে সমস্যার সমাধান এসব দেয়া এবং স্বতঃসিদ্ধকে ভিত্তি করে করতে হয়। ঠিক তেমনি আল্লাহ্‌ প্রতি কাজে, প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করতে বলেন, রহমান হিসাবে এই জিনিস তোমাকে দেয়া হয়েছে—সোজা কথায় তোমার যা-কিছু আছে তা নিয়েই কাজ শুরু কর, ভয় পেও না, ভীত হয়ও না এবং সাথে সাথে আশ্বাস দিচ্ছেন যে, তিনি রহীম অর্থাৎ

www.pathagar.com

চেষ্টা করলে, সাধনা করলে, সংগ্রাম করলে মানুষ যা কিছু চায় তাই তিনি তাকে দেন । মানুষের কাছে অসম্ভব বলে কিছু নেই । মানুষ যা পেতে চায় তাই পেতে পারে । তবে চাওয়ার মত চাইতে পারলে হয় । দ্বিধা, সংকোচ ও ভয়হীনভাবে চাইলে এবং তার জন্য চেষ্টা, সাধনা ও সংগ্রাম করলে তা অবশ্যই পাওয়া যায় । যা চাই সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা চাই । কোন প্রকার দ্বিধা, সন্দেহ বা সংকোচ করলে চলবে না । এটা চাই না ঐটা চাই—এরূপ কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা সংঘাত থাকলে চলবে না । দ্বন্দ্ব বা সংঘাত জীবনে আসবেই । তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করতে হবে, যেন আর কোনও সময় পরিত্যক্ত প্রভাব, চিন্তা, ঘটনা, ব্যক্তি বা বস্তুর দিকে মন আদৌ, মুহূর্তের জন্যও উঁকি-ঝুঁকি না দেয় । একবার মনকে দ্বিধা, সংকোচ মুক্ত করতে পারলে ভয়-ভীতি, অসম্ভব বলে কোন চিন্তা বা বিষয়ই মনে উদয় হবে না । তখন ইচ্ছামত নিজের দেহ, মন, মস্তিষ্ক, জীবন ও জীবনের গতিকে সুনিয়ন্ত্রিত করা সহজ ও সম্ভব হবে । এর সাথে চাই অবিভাজ্য এবং গভীর মনোনিবেশ ও একাগ্রতা, অনমনীয় সাহস, স্থির ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, তীব্র আকাংক্ষা এবং সরল ও সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস। রহীম হিসাবে আল্লাহ্ মানুষকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, যা-কিছু সম্বল তা নিয়েই তুমি লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে চেষ্টা কর, পথ যত দুর্গম হোক, পর্বতসম বাধাবিঘ্ন আসুক, সারা দুনিয়া তোমার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াক তুমি সফলকাম হবে । এর দ্বারা মানুষের ভেতর যে অফুরন্ত শক্তি ও প্রখর প্রতিভা লুক্কায়িত আছে, তারই সন্ধান দেয়া হচ্ছে—মানুষকে স্বকীয় শক্তি ও প্রতিভা সম্পর্কে সজাগ করে দেয়া হচ্ছে। মানুষ নিজেকে চেনে না, জানে না এবং অতি সহজে কর্তব্য ভুলে যায় তাই প্রতিনিয়ত, প্রতি মুহূর্তে, প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি কাজে তাকে 'বিস্‌মিল্লাহির রহমানুর রহীম' বলে স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে। মানুষ একবার যদি এর তাৎপর্য উপলব্ধি করে এবং নিজের ভেতরকার সুপ্ত শক্তি ও লুক্কায়িত প্রতিভাকে তার প্রতি কাজে পূর্ণভাবে বিকশিত করার জন্য অবিরাম চেষ্টা ও সাধনা করে তাহলে প্রত্যেক মানুষের শক্তি ও প্রতিভার কিরূপ উন্নতি ও বিকাশ সম্ভবপর তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না । হয়ত কোন কাজ আমাদের কাছে অসম্ভব, অবাস্তব বলে মনে হয়, কিন্তু এই বিশ্বাস নিয়ে কাজ শুরু করলে তার সমাধান অতি সহজেই হয়ে যাবে । এরূপ বিশ্বাস নিয়ে পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহ্‌তা'আলার নামে—বিস্‌মিল্লাহির রহমানুর রহীম বলে স্বকীয় স্বাস্থ্য, মন, মস্তিষ্ক, বিবেক, বিচারবুদ্ধি, স্মরণশক্তি এবং প্রতিভা নিয়েই কাজ

www.pathagar.com

শুরু করতে হবে। মনের ভেতর যে সব সংঘাত অহরহ মাথাচাড়া দিয়ে দাঁড়ায় এবং প্রতিনিয়ত কষ্ট দেয় তার জন্য অটুট ও অটল বিশ্বাস, অনমনীয় সাহস, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, অপরিসীম মনোবল, তীব্র আকাংক্ষা, অবিভাজ্য ও গভীর মনোনিবেশ এবং একাগ্রতা সহকারে চেষ্টা ও সাধনা করলে, দিনের আলোর মত সব কিছু সুস্পষ্ট, সুন্দর এবং সহজ হয়ে উঠবে, স্বাস্থ্য ভাল হবে, মনের বল বাড়বে, মস্তিষ্ক, জ্ঞান, বিবেক, বিচারবুদ্ধি, স্মরণশক্তি এবং প্রতিভা বাড়বে। মানুষের শক্তি ও প্রতিভার এই অফুরন্ত উৎসের কথা আজ পর্যন্ত কোন ধর্ম, দর্শন, মতবাদ বা বিজ্ঞান দিতে সক্ষম হয়নি এবং ভবিষ্যতেও দিতে পারবে না।

বৈজ্ঞানিকরা ধীর, স্থির এবং একাগ্রতার সাথে আল্লাহ্‌র এসব নামের উপর চিন্তা করুক, ভাবুক এবং গবেষণা করুক তাদের অমীমাংসিত প্রশ্ন ও সমস্যার সুষ্ঠু ও সুন্দরতম সমাধান সহজেই পাবে। প্রত্যেক বৈজ্ঞানিকই শেষ পর্যন্ত একই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, প্রত্যেক বস্তু ও জীব এবং মানুষ কতকগুলি স্থায়ী ও সাধারণ নিয়মের ভেতর দিয়ে ক্রমবিকাশ লাভ করেছে। কিন্তু তারা আজ পর্যন্ত এ প্রশ্নের জবাব দিতে বা মীমাংসা করতে সক্ষম হয়নি যে, কি করে এবং কার দ্বারা এই স্থায়ী এবং সাধারণ নিয়মগুলির উৎপত্তি হলো ? কি করেই বা 'প্লাসমিক সেল' যাকে কুরআনে জীবাণু বলে উল্লেখ করা হয়েছে—সৃষ্টির সবচেয়ে প্রতিভা ও ধীশক্তিসম্পন্ন পূর্ণ মানুষে পরিণত হলো ? কোথা হতেই বা এই বিস্ময়কর প্রতিভা ও ধীশক্তির সৃষ্টি হলো ? কি করে জীবন চলে ? বুদ্ধি ও প্রতিভাহীন 'এ্যানাজি' এবং জীবনহীন পদার্থ আর 'ইলেক্‌ট্রোন' ও 'প্রটোন' হতে হয়ত বা হঠাৎ অবলীলাক্রমে জীবাণু সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু এটা হতে তারা কোনক্রমেই মানুষ তৈরি বা সৃজন করতে সক্ষম হয়নি। সামান্য মৌমাছি বা পতঙ্গ পর্যন্ত তারা 'রব' বা সৃজনকর্তা ছাড়া সৃজন করতে সক্ষম হয়নি। কি করে জীবন এবং ধীশক্তিহীন পদার্থ তার চেয়ে উন্নততর জীবন সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে ? যার নিজেরই জীবন ও প্রতিভা নেই, তা হতে অপরে জীবন ও প্রতিভা পাবে কি করে ? না, তা পেতে পারে না। চিরজীবন্ত, চিরস্থায়ী আপনা হতেই যিনি অবস্থিত এমন এক সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ 'রব্বুল আলামীন' আছেন—যিনি কেবলমাত্র প্রাণহীন পদার্থকে জীবন ও প্রাণ দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি তাকে উন্নত ও বিকাশের বিভিন্ন পর্যায় পালন, পোষণ ও পুষ্ট করার সুব্যবস্থা করেছেন। যে জীবাণু

www.pathagar.com

নিজেকে রক্ষা ও পুষ্ট করতে পারে না কোন জীবন্ত প্রাণী তো নয়ই, তা দ্বারা এই গোটা বিশ্ব বা সৃষ্টিও ক্রমোন্নত, ক্রমবর্ধিত ও ক্রমবিকশিত হতে পারে না। মানবোৎপত্তি সম্পর্কে ক্রমবিকাশের নীতি সৃষ্টির চেয়ে স্রষ্টার উপর আমাদের চিন্তা শক্তি নিবদ্ধ করে। এটা দ্বারা আরো সুস্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, একজন সৃষ্টিকর্তা আছেনই।

কোন আবিষ্কারক বা বৈজ্ঞানিক তাঁর নিত্যনতুন আবিষ্কার করতে সক্ষম হতেন না, যদি আগে থেকেই তাঁকে পদার্থ সরবরাহ করা না হতো। কে এই পদার্থ সরবরাহ করলেন ? কখন কেমন করে এবং কেন পদার্থ সরবরাহ করা হলো ? বাষ্পীয় যানের এবং এমনি আরো শত শত প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করা সম্ভব হত না, যদি কয়লা, লোহা, তেল ও বৈদ্যুতিক শক্তি না থাকত এবং মানুষকে যদি অফুরন্ত ধীশক্তি, যুক্তিজ্ঞান ও প্রতিভা দেয়া না হতো। লোহা বা কয়লাকে স্বকীয় কাজে ব্যবহার করা দূরের কথা আল্লাহ্‌র দেয়া ধীশক্তি এবং যুক্তি-জ্ঞান দ্বারা নিজেকে রক্ষা করতে না পারলে কয়লা গ্যাস ও বৈদ্যুতিক শক্তির চাপে মানুষ ধ্বংস হয়ে যেত। সত্যই মানুষ নিজে তার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, ধীশক্তি এবং প্রতিভার সৃজন করেনি।

আল্লাহ্‌র দেয়া ধীশক্তি এবং প্রতিভা ব্যতিরেকে মানুষ কোন কিছুই তৈরি করতে সক্ষম হতো না। বস্তুত সে কোন নতুন বস্তু বা পদার্থ তৈরি করেনি। প্রকৃতির কতকগুলি সম্পদ আবিষ্কার করে মানুষ তাকেই নিজের কাজে লাগিয়েছে এবং নিজের আয়ত্তাধীন করেছে। মানুষ প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ভাল ও মন্দ করবার নীতি ও পরিমাণকে কতকাংশে আবিষ্কার করেই তা করতে সক্ষম হয়েছে। বস্তুত সব কিছু তৈরি নির্ভর করে এই পূর্ব মাপা পরিমাণকে খুঁজে বের করার উপর।

'রব,' 'রহমান' এবং 'রহীম' এই তিন গুণবাচক নাম ছাড়া সূরা ফাতিহায় আরো একটি নামের উল্লেখ আছে—'মালিক'। বস্তুত আল্লাহ্‌র ৯৯টি নামের ভেতর 'রব', 'রহমান', 'রহীম' ও 'মালিক' এই চারটি সমধিক প্রসিদ্ধ। স্রষ্টা প্রেমময়, দাতা এবং বিচারক গুণের ভেতরই মোটামুটিভাবে আল্লাহ্‌র সব পরিচয় এবং সৃষ্টির সব গূঢ় রহস্য নিহিত আছে। আল্লাহ্‌ই একমাত্র সৃজনকর্তা, পালনকর্তা, ধ্বংসকর্তা ; তিনি প্রেমময়, সৃষ্টির প্রতি তাঁর অফুরন্ত প্রেম ও করুণা ; চেষ্টা ও সাধনা করলে তিনি সবাইকে সব কিছু দান করেন—তিনি পরমদাতা, যা-কিছু আমরা

'মালিক'

www.pathagar.com

ভোগ ও ব্যবহার করি সব কিছু তাঁর কাছ থেকেই আসে। পক্ষান্তরে অন্যায় করলে সে অন্যায়ের ন্যায্য বিচার করে তিনি অন্যায়কারীর শাস্তি বিধান করেন। মোটামুটিভাবে এই ধারণাই আল্লাহ্‌কে চেনার পক্ষে যথেষ্ট।

এছাড়া আল্লাহ্‌র অন্য আরো পঁচানব্বইটি নামের কথা কুরআনে উল্লেখ আছে, যা বুদ্ধি-জ্ঞানসম্পন্ন বৈজ্ঞানিকদের দুর্বোধ্য বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন ও সমস্যার সমাধানে এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও কাজে বিরাট সহায়ক হবে।

আল-আহাদ্—এক, আল্‌হক্—সত্যময়, আল্-কুদ্দুস্—পবিত্র, আস্-সামাদ্—সকলের নির্ভরস্থল, আল্-গনি—নিজের জন্য নিজেই যথেষ্ট, আল্-আউয়াল্—আদি বা সর্বপ্রথম, আল্-আখির—অন্ত, সর্বশেষ, আল্-হাই—চিরস্থায়ী, আল-কাইউম—অন্য নিরপেক্ষ, আল-খালিক—স্রষ্টা, আল-বারী—আত্মার স্রষ্টা, আল-মুসাব্বির— আকারদাতা, যিনি পূর্ব হতেই সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিকল্পনা করেন, আল-বদী—প্রথম আবিষ্কারক, নিত্যনতুন উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের ইংগিত এতে রয়েছে। আল্-মুহইমিন—সকলের অভিভাবক, যিনি সবাইকে বিপদের সময় পাহারা দেন, আল্-গফুর—ক্ষমাকারী, আর-রউফ— স্নেহময়, আল্-অদুদ— প্রেমময়, আল্-লতিফ্— অনুগ্রহশীল আত্-তাওয়াব—পুনঃ পুনঃ দয়ায় প্রত্যাবর্তনকারী, আল- হালিম —ধৈর্যশীল, আল-আফু—ক্ষমাশীল, আল্-শাকুর— বহুগুণ পুরস্কারদাতা, আস্-সালাম— শান্তিদাতা, আল্- মুমিন— অভয় দাতা, আল্-বার্‌রর— সদাশয়, রফিউদ্-দারাজাত— সম্মানদাতা, আর-রাজ্জাক— জীবিকাদাতা বা মহান সরবরাহকারী, আল্-ওহ্‌হাব— চরমদাতা, আল্-ওয়াসী— প্রচুরদাতা, আল-আজিম— মহান, আল-আজিজ— সর্বশক্তিমান, আল্-আলি— সমুন্নত, আল-কা'বি—সবল, আল্-কাহ্‌হার— শাস্তিদাতা, যিনি অপরের উপর প্রভাব বা ক্ষমতা বিস্তার করেন, আল্-জব্বার— ক্ষতিপূরণকারী, যিনি অপরকে তাঁর ইচ্ছানুসারে কাজ করতে বাধ্য করেন, আল্-মুতাকাব্বির—মহত্ত্বের অধিকারী, আল্-কবীর— মহৎ, আল্-করিম— সম্মানাস্পদ, আল্-হামিদ— প্রশংসার্হ, আল্-মজিদ— গৌরবান্বিত, আল্-মতিন— সক্ষম, আল্-জাহির— সর্ব-অতিক্রমকারী, জুল-জালালে- ওয়াল্-একরাম— গৌরব ও সম্মানের প্রভু, বিজয় শক্তি অধিকার ও অনুকম্পার মালিক, আল্-আলিম—জ্ঞাতা, সর্বজ্ঞাতা,

আল্লাহ্‌র সিফাৎ

www.pathagar.com

সর্বজ্ঞ, আল্-হাকিম— সর্বজ্ঞানী, শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিক, আস্‌সামী—শ্রোতা, সদা ও সব শ্রবণকারী, আল-খবীর—সজাগ সর্বজ্ঞ, যিনি সব কিছু জানেন, আল্-বসীর— দ্রষ্টা, সব দর্শক, আশ্-শহীদ— সাক্ষী, আর-রকীব— পাহারাদাতা, যিনি গভীর ও নিবিষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করেন, আল-বাতেন— গুপ্ত বিষয়ের জ্ঞাতা, আল-কাদির— শক্তিময়, আল্-আকিল— সব বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক, আল্-অলি— সব বিষয়ের অভিভাবক, আল-হাফিজ— রক্ষক, রক্ষাকর্তা, আল-মালিক— সম্রাট, আল্-মালেক— প্রভু, আল্-ফাত্তাহ্— গুপ্তশক্তির প্রারম্ভ ও প্রকাশকারী, আল-হাসিব— হিসাব-নিকাশ গ্রহণকারী, আল-মুন্তাকিম— প্রতি কাজের পুরস্কার বা শাস্তিদাতা, আল মুকিৎ—সব বিষয়ের নিয়ন্তা, আল্-মুহমী— হিসাব রক্ষক, আল-হকাম— হাকিম বা বিচারক, আল্-মুকসিম— প্রয়োজনমত বিতরণ করেন যিনি, আশ্-শাকুর— যিনি অপরকে সুখী ও সম্পদশালী করেন, আল্-মুইদ—পুনরুদ্ধারকারী, আল্-মুকদ্দীন— যিনি আগে সুযোগ ও সুবিধা দান করেন, আল্-আজালী— চিরন্তন চিরস্থায়ী, আল্-মুহঈ— জীবনদাতা, আল্-মুবদী— শ্রেষ্ঠতম প্রারম্ভকারী, আল্-গাফফার— মহান ক্ষমাশীল, আল্-আদিল— ন্যায়পরায়ণ, আল্-হাদি— সৎপথে পরিচালক, আল-সবুর—ধৈর্যশীল ।

অন্যান্য নামের দ্বারাও আল্লাহ্‌র এরূপ কোন না কোন গুণ প্রকাশ পেয়েছে । আল্লাহ্ এই ৯৯টি নামেই সীমাবদ্ধ নন । এসব গুণের বাইরেও তিনি আছেন । মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ, কাজেই মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞান যতদূর নাগাল পায় ততদূর পর্যন্ত আল্লাহ্ নিজের পরিচয় দিয়েছেন । মানুষের পক্ষে এই পরিচয়ই সর্বাপেক্ষা ব্যাপক এবং সম্পূর্ণ ।

বৈজ্ঞানিকেরা বিরাট সৌরজগতের গূঢ় রহস্য পর্যবেক্ষণ করুন । না, এতদূর যাবার দরকার নেই, তাঁরা নিজেদের ভাল করে পরীক্ষা করে দেখুন এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির জবাব দিন । কুরআনে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি মানবের জ্ঞান, বিবেক, বিচারবুদ্ধি, ধীশক্তি এবং প্রতিভাকে সুনিয়ন্ত্রণ করার জন্য করা হয়েছে—"তারা কি এমনি সৃজিত হয়েছে ? তারা নিজেরাই কি নিজেদের স্রষ্টা ? তারাই কি স্বর্গ-মর্ত্য আবিষ্কার করেছে ? না, নিশ্চয় না । তবে তারা বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে । তারা কি তাদের সৃষ্টিকর্তার অফুরন্ত শক্তি এবং সম্পদ ভোগদখল করে না ? তারা কি নিজেদের সর্ব শক্তিমান মনে করে ?" ৫২ ঃ ৩৫-৩৬ ; তাই কুরআন বজ্র-নির্ঘোষে ঘোষণা

www.pathagar.com

করেছে—'সত্যই আল্লাহ্ ব্যতীত যা কিছুর কথাই বল না কেন, সামান্য একটা পতঙ্গও তৈরি বা সৃজন করতে পারবে না, যদিও সৃজন করার জন্য সমবেত হতে পারে ; আর সৃজন করা দূরের কথা, যদি পতঙ্গ তাদের হাত হতে উড়ে যায় তাহলে তাকেও ধরে বা ফিরিয়ে আনতে পারে না । তারা সরবরাহকারী এবং পোষণকারীকে দুর্বল ভাবে । আল্লাহ্ সম্পর্কে নেহায়েত সাধারণ ধারণা তারা পোষণ করে । কারণ আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণ এবং শক্তিশালী ।' ২২ ঃ ৭৩-৭৪ ।

এটা প্রত্যেক মানুষের কাছে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে যে, এই দুনিয়ার কোন ব্যক্তি, দল বা জাতিই দুনিয়ার সব অবস্থা, সমস্যা এবং ঘটনাকে করায়ত্ত করতে সক্ষম হয়নি । এখনও অগণিত বস্তু, পদার্থ এবং সম্পদ মানুষের অজ্ঞাত রয়েছে । সে সব অজ্ঞাত বস্তু, পদার্থ বা ঘটনার উপর মানুষের কোন হাত বা প্রভাব নেই । অথচ মানুষই দুনিয়ার ভেতর সবচেয়ে ধীশক্তি, বুদ্ধি-জ্ঞান এবং প্রতিভাসম্পন্ন প্রাণী । এই বিশ্ব বা সৃষ্টির স্থায়ী এবং সাধারণ নিয়মাবলী দ্বারা এটাই প্রতীয়মান বা প্রমাণিত হয় যে, নিশ্চয়ই মানুষের চেয়ে শক্তিশালী এমন এক শক্তি আছেন, যিনি বিশ্ব বা সৃষ্টির সব অবস্থা, সব সমস্যা এবং সব ঘটনাকে সুশৃংখল ও সুনিপুণভাবে সুনিয়ন্ত্রণ করেন । এটাকে বিজ্ঞের মত স্বতঃসিদ্ধ বা সত্য বলে স্বীকার করে নিলে সৃষ্টি এবং এর ক্রমবিকাশের অনেক গূঢ় রহস্য ও জটিল সমস্যার সমাধান অতি সহজেই হয়ে যায় । স্বতঃসিদ্ধ ছাড়া জ্যামিতি বিজ্ঞান গড়েই উঠত না । সুতরাং আল্লাহ্কে স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে ধরে নিয়ে কুরআন-বর্ণিত আল্লাহ্র মত গুণাবলীর সম্যক অর্থ ও তাৎপর্য উপলব্ধি করতে না পারলে সৃষ্টির অনেক রহস্যই অমীমাংসিত এবং অজানা থেকে যাবে । স্বতঃসিদ্ধ সত্য হিসাবে আল্লাহ্র উপর পূর্ণ এবং অবিভাজ্য বিশ্বাস স্থাপন করে যদি আমরা সৃষ্টির 'কখন', 'কেমন করে' এবং 'কেন'র রহস্য বুঝতে চেষ্টা করি তবেই সব কিছু আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে ।

কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ 'এটা তোমাদের দেয়া হয়েছে যাতে করে তোমাদের ধীশক্তি এবং প্রতিভা ব্যবহার করতে পার ।' মহাকবি সাদী বলেছেন যে, পূর্ণ ও পরিপক্ক যুক্তিজ্ঞান এবং প্রতিভা ব্যতিরেকে আল্লাহ্কে চেনা, জানা এবং উপলব্ধি করা সম্পূর্ণ অসম্ভব । তাই কুরআনে বার বার তাগিদ রয়েছে, মানুষকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সব কাজে, এমন কি আল্লাহ্র

www.pathagar.com

উপর ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করার জন্যও মানুষের উচিত তার বুদ্ধি, বিবেক, বিচারশক্তি এবং প্রতিভাকে প্রয়োগ ও বিকশিত করা। ইসলামিক একত্ববাদ যে রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থিক এবং নৈতিক, এক কথায় মানব-জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি কাজে এবং প্রতি ঘটনায় সহায়ক তার প্রকৃত প্রমাণ অতি অল্প সময়ের ভেতর মুসলিমদের অতুলনীয় উন্নতি। এই ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছিল আল্লাহ্‌র উপর তাদের অটল বিশ্বাস থাকার জন্য। ইসলাম এই একত্ববাদকে ভিত্তি করেই সমগ্র দুনিয়ায় বিশ্বভ্রাতৃত্ব কায়েম করার প্রয়াস পেয়েছিল এবং ভবিষ্যতেও প্রেম ও সাম্যকে ভিত্তি করে সমগ্র দুনিয়ায় এমন একটি আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চায়, যার নজির ইতিহাসে নেই।

উপরোল্লিখিত এবং আল্লাহ্‌র অন্যান্য নামের সম্যক অর্থ ও তাৎপর্য উপলব্ধি করে যদি আমরা হযরত মুহম্মদ (সা)-এর নির্দেশ পালন করি—'আল্লাহ্‌র গুণে মনুষ্যত্বে গুণান্বিত হও,' তাহলে আল্লাহ্‌র গুণাবলী দ্বারা গঠিত চরিত্রের চাইতে পূর্ণ এবং চরম বিকাশের ভাল নজির কে বা কোন্ মতবাদ দিতে পারে ? হযরত মুহম্মদ এবং তাঁর অনুসরণকারিগণ আল্লাহ্‌র অতুলনীয় গুণাবলী দ্বারা স্বকীয় চরিত্র গঠন করেছিলেন বলেই এত অল্প সময়ের ভেতর আরব, তুর্কী ও মংগোলীয়দের শতাব্দীব্যাপী পুঞ্জিভূত অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ কারণেই তিনি অতি অল্প সময়ে বিস্ময়কর গণতান্ত্রিক ও আন্তর্জাতিক সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। জানার, শিখার ও জ্ঞান লাভ করার এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং উন্নতি ও প্রগতির জন্য প্রাণমাতানো উদ্দীপনাই তাদের এ বিজয়কে সম্ভবপর করেছিলো।

ইসলাম অবতারবাদে বিশ্বাস করে না। কিন্তু মানুষের সাধ্যমত আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে ইসলাম পুরোপুরি বিশ্বাস করে—একথা আগেই বলেছি। আল্লাহ্ বলেছেন—'যে ব্যক্তিকে প্রিয় জানি আমি তার শ্রবণযন্ত্র, যার মারফত সে শ্রবণ করে। আমি তার দৃষ্টিশক্তি, যার মারফত সে দর্শন করে। আমি তার হাত, যার মারফত সে কোন কিছু আঁকড়ে ধরে এবং আমিই তার পা, যা দিয়ে সে চলাফেরা করে।' আল্লাহ্‌র প্রত্যেকটি অতুলনীয় গুণকে আমাদের জীবনে প্রতিফলিত করে তাঁর নৈকট্য লাভ করতে পারলে বোঝা যাবে আরও কত বিরাট ও বিপুল শক্তি এবং অফুরন্ত প্রতিভা মানুষের মাঝে সুপ্ত ও লুকায়িত অবস্থায় রয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে মানুষের মন, মস্তিষ্ক, ধীশক্তি এবং প্রতিভা বিকাশের এরূপ বিপুল সম্ভাবনার কথা আর কোন মতবাদে নেই।

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ

এখন কি করে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। 'হিন্দুশাস্ত্র মতে পূর্ণ ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের উপায় তিনটি—ভক্তিযোগ, কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ। ভক্তি হলো বিশ্বাস—ঈশ্বর ও গুরুর উপর বিশ্বাস। গুরু হলো শিক্ষক—যিনি সত্যপথ প্রদর্শন করেন। দুনিয়ার দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মাঝে দৈনন্দিন জীবনে বাস্তব অভিজ্ঞতা, ভাল কাজ করা এবং প্রগতিশীল ও কর্মময় জীবন্ত জীবন হতে জ্ঞান লাভ করার নামই কর্মযোগ। ভোগের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার নাম রাজযোগ। রাজযোগ কর্মযোগ হতেই উদ্ভূত। বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়দের রাজযোগ ও কর্মযোগ। প্রত্যক্ষ অনুভূতি বা আত্মজ্ঞান মারফত সম্যক ও সত্য জ্ঞান লাভকেই জ্ঞানযোগ বলে। ব্রাহ্মণদের জন্য জ্ঞানযোগ।' স্থূল ইন্দ্রিয়ের পেছনে কতকগুলি সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় আছে। সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের অনুশীলন ছাড়া সম্যক ও সত্যজ্ঞান লাভ হয় না। এই ইন্দ্রিয়গুলিকে সক্রিয় করার নামই সাধনা বা যোগ। চিন্তা, ধ্যান ও সাধনা দ্বারা অন্তর্দৃষ্টি খুলে দেয়া এবং সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়কে সুনিয়ন্ত্রণ করা। দেহকে পুষ্ট করতে হলে কতকগুলি কাজ করতে হয়—সংযম, নিয়মিত খাওয়া, ঘুম, বিশ্রাম, উপযুক্ত পরিশ্রম, মুক্ত বাতাস, মনের স্ফূর্তি। এগুলি ধীরে ধীরে দেহকে সবল ও সুস্থ করে। ডন, বৈঠক বা ব্যায়াম করলে হয়ত অল্প দিনেই শরীর সবল ও সুস্থ হতে পারে। ডন, বৈঠক বা অন্যান্য ব্যায়াম দ্বারা দেহের যে বাড়তি হয় তা স্বাভাবিক নয়। দার্জিলিং গেলে সাতদিনের ভেতর স্বাস্থ্য ভাল হতে পারে, কিন্তু তা ক্ষণস্থায়ী। যোগের কতকগুলি প্রক্রিয়া আছে। এসব যোগ বা সাধনা দ্বারা ব্যায়ামের মত খুব তাড়াতাড়ি পূর্ণ ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করা যায়। আর সংযম এবং সততার মারফত ধীরে ধীরে উহা লাভ করা চলে। ব্যায়ামগীর যেরূপ মাংসপেশীর নানারূপ ক্রীড়া নৈপুণ্য দেখাতে পারে, যার স্বাস্থ্য স্বভাবতই ভাল সে হয়ত তা পারে না। তেমনি যারা বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা জ্ঞান লাভ করে তারা নানারূপ মু'যিজা দেখাতে পারে। বাতাসকে বিশেষভাবে টেনে অন্তর ধৌত করা যায়। আত্মা ও পেটকে ধৌত করে বাতাসকে নিয়ন্ত্রণ করাই যোগের প্রধান

ভক্তি, কর্ম ও জ্ঞানযোগ

www.pathagar.com

হাতিয়ার। যদি দেহকে বাতাসের চেয়ে বেশি হালকা করা যায় তবে দেহ পানিতে ভেসে উঠে। মরে যাবার পর শরীর হতে বাতাস বের হয়ে যায় বলে শরীর ভেসে উঠে। ব্রহ্মজ্ঞান সৃষ্টিজ্ঞানের সাথে জড়িত। বিশ্বের বিরাটত্বের মাঝে মহান স্রষ্টার সন্ধান পাওয়া যায়। যে কোন পদার্থ, বস্তু বা ঘটনার মাঝে গভীর মনোনিবেশসহ খুঁজলেও তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়। অনেক সময় অনেক কিছু অনুধাবন করা চলে, ব্যাখ্যা করা চলে না, কিন্তু উপমা দ্বারা তাও ব্যাখ্যা করা যায়। অনেক সময় মানুষ উদ্দেশ্যবিহীনভাবে কোন এক অজানা পথ পানে তাকিয়ে থাকে—ফলে হয়ত খুব কাছের জিনিসও সে দেখতে পায় না। আবার অনেক সময় অনেক দূরে থেকেও চুম্বক আকর্ষণের মত প্রিয়জনের আকর্ষণ সে অনুভব করে। দূরে বহু দূরে থেকেও শব্দ শোনা যায় এবং বস্তু দেখা যায়। কিন্তু মানুষ উপস্থিত পরিবেশের মাঝে এতখানি ডুবে থাকে যে, তাকে সাধারণত অনুভব করতে পারে না।

এক দুঃখ এই যে আমী দুঃখী, অধঃপতিত ; আরও দুঃখ যখন দুঃখের অনুভূতি আছে এবং তার থেকে পরিত্রাণ পাবার ইচ্ছা ও চেষ্টাও আছে কিন্তু পরিত্রাণের পথ খুঁজে পাচ্ছি না। এক দুঃখ থাইসিস হয়েছে, হয়ত তা জানি না, আরও দুঃখ জানি থাইসিস হয়েছে ; অথচ পথ খুঁজে পাই না, মুক্তির সন্ধান পাই না। কোন এক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন—'কর্তব্য জ্ঞান আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে বিপথগামী হওয়া থেকে, আর নাফ্‌সের প্রেরণা আমাকে জ্ঞানের সন্ধান দিয়েছে। যেই জ্ঞানের সন্ধান পাওয়া গেল অমনি আন্দোলন ও কাজ শুরু হলো। নোংরামো কিছুটা রয়েই গেল এবং তার অনুভূতিও রইল। তা থেকে পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা করলাম কিন্তু ব্যর্থ হলাম। কেন এই ব্যর্থতা এ প্রশ্নের মীমাংসা করতে গিয়ে মানব জীবনে পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে সম্যক ও সত্য জ্ঞান লাভ হলো। মানবের দুটি মূল প্রবৃত্তি—যৌন ও পেটের ক্ষুধার স্বাভাবিক ও সহজ তৃপ্তির সুযোগ ও ব্যবস্থা পরিবেশে নেই বলেই কিছুটা নোংরামো মানব জীবনে থেকে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক।' মানবের সহজাত ও মূল-প্রবৃত্তি যৌন ও পেটের ক্ষুধার সহজ স্বাভাবিক তৃপ্তি সাধনের সুযোগ ও সুব্যবস্থার অভাব পরিবেশ ও সমাজে না থাকাতেই মানুষ আদর্শস্থানীয় হতে পারে না। কিছুটা দোষত্রুটি থেকেই যায়। বস্তুত কামালিয়াত বা পূর্ণতা প্রাপ্তি এক আল্লাহ্‌তেই সম্ভব, মানুষে নয়। বিরুদ্ধ পরিবেশে মানবের দেহ, মন ও মস্তিষ্কের উন্নতি ও পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। মানুষ পরিবেশের দাস, একথা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও স্বীকার করেন। তাই

পরিবেশের প্রভাব

www.pathagar.com

বিরুদ্ধ পরিবেশে পূর্ণ ইসলামী মনোভাব এবং সমাজ-বিধান গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাই বিরুদ্ধ পরিবেশ বা দারুল হরবের পরিবর্তে—ইসলামী পরিবেশ বা দারুল ইসলাম কায়েম করার জন্য প্রত্যেক মুসলমানকে জিহাদ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বস্তুত দারুল হরবে প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে জিহাদ করা প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য। আর জিহাদের অবস্থায় মুসলমানদের সামনে—শহীদ বা গাজী হবার প্রতিজ্ঞা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষা প্রভাবান্বিত ইসলাম বিরোধী পরিবেশ মুজাহিদ বেশে ভেঙে চুরমার করার জন্য প্রত্যেক মুসলিমকে শহীদ বা গাজী হবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে দারুল ইসলাম কায়েম করার জন্য সিংহ বিক্রমে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হবে। মুজাহিদ হিসাবে ভাঙবো আর মুবাল্লিগ হিসাবে গড়বো—এটাই হবে আজ প্রত্যেক মুসলমানের মূলমন্ত্র।

জিহাদ

সাধনা এবং জিহাদ বা সংগ্রামের ভেতর দিয়েই সম্যক এবং সত্য জ্ঞান লাভ করা যায়। সংসার ও সমাজের বিরুদ্ধ পরিবেশের ভেতর থেকেই জ্ঞান-লাভের সাধনা ও সংগ্রাম করতে হবে। বস্তুত সংসারী যে না হবে, সে ব্যক্তি খুব শৃংখলাবদ্ধ জীবন কোনদিনই গড়ে তুলতে পারবে না। অপরদিকে সংসারী হয়ে সংসারের পংকিল ও সংকীর্ণ আবর্তের মাঝে থেকে জ্ঞানের সন্ধান পাওয়া এবং পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়া খুবই মুশকিল। সংসারে থেকে জ্ঞান-লাভের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার আশংকা থাকে বেশি। কিন্তু সফল হলে তাই হবে পূর্ণ এবং নির্ভুল। সংসারত্যাগী ফকির ও দরবেশের পক্ষে বেহেশ্‌তের ফেরেশ্‌তা-তুল্য এবং সাধু বা সন্ন্যাসীর পক্ষে স্বর্গের দেবতা-তুল্য হওয়া সহজ। গার্হস্থ্য জীবন মানুষের শক্তির নিয়ন্ত্রণ ও বিকাশের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। সংসার ত্যাগ সংসারত্যাগীর আদর্শ হতে পারে, সংসারীর নয়। কাজেই মানব সমাজের যারা কল্যাণকামী তাদেরকে সমাজের প্রচলিত কুটিলতা ও পংকিলতার মাঝে থেকেই আত্মশক্তির অনুশীলন ও সম্যক জ্ঞান লাভ করেই সমাজের জনগণের মঙ্গলের চেষ্টা করতে হবে। তাই হযরত মুহম্মদ (সা) সংসারে থেকেই জ্ঞান লাভ করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং তরীকায়ে মুহম্মদী অর্থাৎ সম্যক ও সত্যিকার জ্ঞান লাভের ইসলামিক উপায় ও পদ্ধতি হলো আদর্শ সংসারী, সমাজ-সেবক এবং মানব কল্যাণকামী হওয়া।

গার্হস্থ্য জীবন

ইসলামী মতে আদর্শ সংসারী হিসাবে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করার

www.pathagar.com

সবচেয়ে সুন্দর উপায় ও পদ্ধতি হলো স্বকীয় জীবনে আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে রূপ দেবার বা প্রতিফলিত করার চেষ্টা করা । আল্লাহ্‌র ফিতরৎ দিয়েই মানুষ সৃষ্ট হয়েছে । সুতরাং আল্লাহ্‌র সমস্ত গুণাবলী মানব-জীবনে রূপায়িত হলে কতই না সুন্দর হবে ! প্রকৃতির বাধা মানব জীবনে আসবেই । এটা মেশিন নয় । এর বিবেক ও বিচারবুদ্ধি আছে । আর প্রকৃতির বাধা ও দোষত্রুটি প্রকৃতি বা নিয়ম-বিরোধী নয় । বরং সহজাত প্রকৃতি ও নিয়মের সাথে সমন্বয় রেখেই এসব দোষত্রুটি ও বাধা মানুষের জীবনে দেখা দেয় । মানুষ স্বকীয় বিবেক ও বিচারবুদ্ধি খাটিয়ে প্রকৃতির সাথে সমন্বয় রেখে ব্যক্তি ও সমাজ-জীবন নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করলে কি সুন্দর মানব-জীবন ও সমাজই না গড়ে উঠবে । প্রকৃতির সাথে সমন্বয় রেখে দেহ, মন ও মস্তিষ্কের উন্নতি ও পূর্ণ বিকাশ করতে হলে আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে স্বীয় জীবনে ফুটিয়ে তুলতে হবে ।

আল্লাহ্‌র গুণাবলী

রব বা স্রষ্টা হিসাবেই সৃষ্টির বিশেষ করে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের সাথে আল্লাহ্‌র সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বস্তুত রব হিসাবে এই সৃষ্টিকে পালন অর্থাৎ রবুবিয়াৎ-এর কাজ করাই আল্লাহ্‌র সবচেয়ে বড় কাজ । আল্লাহ্‌র খলীফা বা প্রতিনিধি হিসাবে মানুষেরও প্রথম এবং প্রধান কাজ হল রবুবিয়াৎ পালন । সুতরাং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করতে হলে মানুষকে সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ সিফাৎ বা সত্যিকার পরিচয় 'রব'-এর গুণ রবুবিয়াৎ বা বিশ্বপালনকেই স্বকীয় জীবনে রূপ দেবার চেষ্টা করতে হবে ।

রবুবিয়াৎ

www.pathagar.com

রবুবিয়াৎ-এর স্তর

রবুবিয়াৎ-এর চারটি স্তর আছেঃ

(১) রব্বুন্নাফ্‌স—নিজের রবুবিয়াৎ—বিয়ের আগে।

(২) রব্বুলবায়েত—সংসারের রবুবিয়াৎ—পারিবারিক জীবন ।

(৩) রব্বুলমুল্‌ক—দেশ বা জাতির রবুবিয়াৎ—রাষ্ট্রপতি হিসাবে ।

(৪) রব্বুল খালক—সৃষ্ট জীবের রবুবিয়াৎ—রব্বানি বা সত্যিকার মুসলিম হিসাবে ।

এই চারটি স্তরেই রব্বুল আলামীনের খলীফা হিসাবে কাজ করতে হবে । উবুদিয়াৎ-এ-এলাহি বা এলাহির উপাসনা মারফত রবুবিয়াৎ বা খিদমত-এ খালকের দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করা সম্ভবপর । উবুদিয়াৎ বা উপাসনা মানুষের কর্তব্য পথে সরল, সহজ, ন্যায় ও সত্যের পথে রজু করার উপায় মাত্র । এটাই শেষ নয় । ওযু নামাযের জন্য । তেমনি রব-এর প্রতিনিধি হিসাবে দুনিয়া ও আখিরাতে জীবনকে সুনিয়ন্ত্রণ করার মত মনোভাব গড়ে তোলার জন্য উপাসনার প্রয়োজন । মানুষ অতি সহজে বিভ্রান্ত হয় ও কর্তব্যচ্যুত হয় । তাই দিনে পাঁচবার তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে, তার কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ ও সাবধান করে দেয়া হচ্ছে। বস্তুত আল্লাহ্‌তা'আলার প্রতিভূ হিসাবে দুনিয়ায় তার শ্রেষ্ঠ কাজ রবুবিয়াৎ পালন করাই হলো কামালিয়াত হাসিলের সবচেয়ে সুন্দর ও সহজ উপায় ।

নাফ্‌স-এর প্রতি কর্তব্য প্রথম ফরজ । এটা অমান্য করা চলে না । অনিয়ম, অসংযম এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাস্থ্য খারাপ করলে স্মরণ শক্তি, কর্মস্পৃহা ও মেধা কমে যায় । নাফ্‌সের প্রতি রবুবিয়াৎ পালনে অবহেলা শক্ত গুনাহ্‌ । সংসারের প্রতি রবুবিয়াৎ পালন না করা অন্যায় বা গুনাহ্‌ । আরও এগিয়ে গিয়ে যদি রাষ্ট্র বা সৃষ্টির প্রতি কর্তব্য পালনে কেউ গাফিলতি করে তবে শক্ত গুনাহগার হলো । যে ব্যক্তি নিজের নাফ্‌সের প্রতি সজাগ, কর্তব্যপরায়ণ এবং সক্রিয় প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরেও তার জীবনে রবুবিয়াৎ সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হবে । প্রথম স্তরে অবহেলার অর্থ হলো আত্মহত্যার নামান্তর । দেহ, মন ও মস্তিষ্ক উন্নত ও বিকশিত না হলে,

www.pathagar.com

সুস্থ না থাকলে জীবনের অন্যান্য স্তরে রবুবিয়াৎ পালন সম্পূর্ণ অসম্ভব। বৈরাগ্য দ্বিতীয় স্তরের কর্তব্যের প্রতি অবহেলা করা। রাষ্ট্র পরিচালনায় চরম অযোগ্যতা তৃতীয় স্তরকে অবহেলা করে। মানব ও সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও কল্যাণের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে কাজ করার ফলে চতুর্থ স্তরকে অবহেলা করা হয়। যে ব্যক্তি জীবনের প্রতি উদাসীন সে সমস্ত স্তরেই উচ্ছৃংখল। যে সংসারী নয় সে আদর্শ রাষ্ট্রপতি বা মানব দরদী হতে পারে না। পারিবারিক জীবনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর না হলে জনসাধারণ এবং তাদের সমস্যা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকাই স্বাভাবিক।

অপর দিকে সংসারের পংকিল ও সংকীর্ণ আবর্তের মাঝে থেকে জ্ঞানের সন্ধান পাওয়া এবং পূর্ণতা লাভ করা খুবই মুশকিল, একথা আগেই বলেছি। সংসারে থেকে জ্ঞানলাভের প্রচেষ্টা বর্তমান পরিবেশে শতকরা নিরানব্বই ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হবার আশংকা। কিন্তু সফল হলে তা হবে পূর্ণ ও নির্ভুল। সংসার-ত্যাগী ফকির বা দরবেশের পক্ষে বেহেশ্‌তের ফেরেশ্‌তা- তুল্য এবং সাধু বা সন্ন্যাসীর পক্ষে স্বর্গের দেবতা-তুল্য হওয়া সহজতর হতে পারে, তবে তা সংসারীর আদর্শ নয়, হতে পারে না। গার্হস্থ্য-জীবন মানুষের নিয়ন্ত্রণ ও বিকাশের পক্ষে অনুকূল। সংসার ত্যাগ সংসারত্যাগীর আদর্শ হতে পারে, সংসারীর নয়। মানব-সমাজের যারা কল্যাণকামী তাদেরকে সমাজের প্রচলিত কুটিলতা ও পংকিলতার মাঝে থেকেই আত্মশক্তির অনুশীলন ও সম্যক জ্ঞান লাভ করত সমাজের হিতসাধনের চেষ্টা করতে হবে।

পরিবেশের পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত আদর্শ মুসলিম হওয়া সম্ভবপর নয়। বর্তমান পরিবেশে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিগুলির সহজ এবং স্বাভাবিক সন্তুষ্টি ও তৃপ্তির ব্যবস্থা হতে পারে না। তাই প্রত্যেক মুসলিমকে চেষ্টা করতে হবে আদর্শ সমাজ, মানবগোষ্ঠী ও সৃষ্টি গড়ে তুলতে। রবুবিয়াৎ পালনে অবহেলা করা পাপ বা গুনাহ এবং রবুবিয়াৎ পালন করাই হলো সওয়াব বা নেকির কাজ। ফল দোযখ ও বেহেশত—দুর্গতি ও সুখ। সব কিছু রবুবিয়াৎকে কেন্দ্র করেই হচ্ছে। দুনিয়ার উপর আদর্শ সমাজ, মানবগোষ্ঠী বা সৃষ্টিকে বেহেশ্‌তের সাথে তুলনা করা চলে।

আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের বিভিন্ন উপায় আছে। এর ভেতর সবচেয়ে প্রধান দু'টি ঃ

www.pathagar.com

(১) উবুদিয়াৎ-এ-এলাহি—আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্য। আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল হওয়া। আল্লাহ্‌র মাঝে দিল ডুবে যাওয়া। আল্লাহ্‌র শক্তি এবং বৈশিষ্ট্যের প্রশংসা এবং নৈকট্য লাভের তীব্র বাসনা। সততা,সাধুতা, সহনশীলতা ও ধৈর্যসহকারে চেষ্টা ও সাধনা করলে আল্লাহ্‌কে উপলব্ধি করা যায়। তাঁর শক্তি এবং প্রকৃতির সহজাত নিয়ম ও পদ্ধতি হৃদয়ংগম হয়।

উবুদিয়াৎ-এ-এলাহি

(২) খিদমৎ-এ-খালক—আল্লাহ্‌তা'আলার খলীফা বা প্রতিভূ হিসাবে দুনিয়ার উপর মানুষের শ্রেষ্ঠ কাজ প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য রবুবিয়াৎ কায়েম করাই হলো কামালিয়াত হাসিলের সবচেয়ে সুন্দর ও সহজ উপায়, একথা আগেই বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের বিভিন্ন স্তর

(১) ইলমিয়াত—সাধারণ এবং প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করা ।

(২) শরীয়ত—মানুষের জন্য কতকগুলি সাধারণ নিয়ম শরীয়তে লিপিবদ্ধ করা আছে । সালাত কায়েম করা, রোযা রাখা, যাকাত দেয়া, হজ করা, শরাব পান না করা ইত্যাদি । এসব সাধারণ নিয়মকে ভিত্তি করেই সম্যক ও সত্যজ্ঞান লাভ করে আদর্শ মানবগোষ্ঠী গড়তে হবে ।

(৩) তরীকত—বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গভীর মনোনিবেশসহ বিশেষ পথ বা উপায়ে কাজ করা । শরীয়ত হাসিল করার পর তরীকা পাবার চেষ্টা এবং তরীকা পেলে সত্য পথ খুঁজে পেলে পরবর্তী স্তরে অতি সহজেই প্রবেশ করা চলে ।

(৪) মারিফত—পদার্থ বা বৈষয়িক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করলে শরীয়তের গূঢ় রহস্য, সত্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা । আর আধ্যাত্মিক দিক থেকে বিচার করলে মারিফত দু'রকমের ঃ

(১) মারিফত-এ-এলাহি—আল্লাহ্‌র পরিচয় ।

(২) মারিফত-এ-নাফ্‌স—নাফ্‌স বা নিজের পরিচয় ।

একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে এটা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, নাফ্‌সের পরিচয় পাওয়া খুবই কঠিন । নাফ্‌সের পরিচয় পেলে আল্লাহ্‌র পরিচয় পাওয়া গেল । নাফ্‌সের পরিচয় পেতে হলে—পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, সমাজ, রাষ্ট্র, মানবতা, সৃষ্টি ও স্রষ্টার সাথে সমন্বয় রেখে নাফ্‌সকে চিনতে হবে, জানতে হবে এবং তদনুসারে প্রত্যেক ক্ষেত্রে নাফ্‌সের কর্তব্য স্থির করতে হবে । পরিবারের ভেতর আমার কর্তব্য কি জানতে হলে এবং পরিবারের প্রতি আমার রবুবিয়াৎ পালন করে পরিবারের সুখ ও শান্তি স্থাপন করতে হলে পরিবারের প্রত্যেকের সুখঃ-দুঃখ,অভাব-অনটন, স্বভাব-চরিত্র ভাল করে জানতে হবে ।

পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্য সম্পর্কে এরূপ সম্যক জ্ঞানলাভ করার পর কার কি অভাব, কার কি প্রয়োজন, কার সাথে কিভাবে উঠা-বসা, কথা-বার্তা, আলাপ-আলোচনা করতে হবে, কাকে কি শিক্ষা দিতে হবে তা জানা হবে । তখন প্রয়োজনমত সবার অভাব-অনটন মিটিয়ে পরিবারের ভেতর স্থায়ী সুখ ও

www.pathagar.com

শান্তি স্থাপন করা সম্ভবপর হবে। আত্মীম--স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, সমাজ, রাষ্ট্র, সৃষ্টি বা স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য নির্ধারণ করতে হলেও এদের সবার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। সুতরাং নাফ্সের পরিচয় পেলে, নাফ্সের কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারলে সম্যক জ্ঞান লাভ হয়ে গেল। এটা খুবই সাধনা-সাপেক্ষ। স্রষ্টাকে বুঝতে হলে, স্রষ্টার পরিচয় পেতে হলে এবং আল্লাহ্ সম্পর্কে সম্যক ও পূর্ণ জ্ঞানলাভ করতে হলে সৃষ্টি ও প্রকৃতির রহস্য সম্পর্কে সব কিছু জানতে হবে—জ্ঞান লাভ করতে হবে। তবেই স্রষ্টা ও সৃষ্টির রহস্য উপলব্ধি করা সম্ভব হবে, অন্যথায় নয়।

(৫) হকিকত—বাস্তব এবং সত্যের সন্ধান পাওয়া। বস্তুত সৃষ্টি ও স্রষ্টার পরিচয় বা রহস্য সম্পর্কে যাঁর সম্যক ও পূর্ণজ্ঞান লাভ হয়েছে, তিনিই সত্যের ও বাস্তবের সন্ধান পেয়েছেন—আলোর সন্ধান পেয়েছেন। তাঁর কাছে সব কিছু ছবির মত সুস্পষ্ট, সরল এবং সহজরূপে প্রকাশিত হয়। তিনি সব কিছুর মূল কারণ ও উৎস খুঁজে পান। প্রকৃতিরূপ মহা গ্রন্থের সমস্ত সহজাত ও সাধারণ নিয়ম এবং মূলনীতিগুলি তাঁর কাছে ধরা পড়ে। তিনি অন্ধ মানব-সমাজকে সত্যের সন্ধান দেন—পথ দেখান—সুখের পথ—কল্যাণের পথ—মুক্তির পথ—পূর্ণতা-প্রাপ্তির পথ।

(৬) বেলায়েত—সত্যের সন্ধান যিনি পেলেন তিনি আল্লাহ্র ওলী বা বন্ধুর দরজায় পৌঁছলেন। এই দরজার সর্বোচ্চ শিখর পর্যন্ত উঠতে সক্ষম হয়েছেন নবিগণ। কোন বড়লোক বা পণ্ডিত ব্যক্তির বন্ধু হলেও বোঝা যাবে সে তার প্রায় সমান বড়লোক বা পণ্ডিতলোক। নইলে বড়লোক বা পণ্ডিত লোকের বন্ধু হলো কি করে? তেমনি আল্লাহ্র গুণাবলী মানুষের ভেতর যাঁরা বেশি আয়ত্ত করেন—তাঁরাই হলেন ওলী আল্লাহ্ বা আল্লাহ্তা'আলার ওলী ও বন্ধু।

(৭) ইলাহিয়াত—বেলায়েতের দরজা পার হয়ে যাঁর জিন্দেগী ইলাহির ফিতরৎ বা জিন্দেগীর সাথে সাথে চলে। আল্লাহ্র ফিতরতের সাথে একেবারে মিশে যাওয়া।

(৮) উলুহিয়াৎ—খোদাত্ব লাভ। কামালিয়াত বা পূর্ণতা প্রাপ্ত একমাত্র আল্লাহ্তেই সম্ভব। মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। চরম উন্নতি লাভ করে মানুষ আল্লাহ্র নৈকট্য বা সান্নিধ্য লাভ করতে সক্ষম হয়, কিন্তু খোদাত্ব লাভ করতে পারে না। আল্লাহ্র ফিতরৎ-এর সাথে মিশে গিয়ে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ

www.pathagar.com

করেই মনসুর হাল্লাজ বলেছিলেন ঃ 'আনাল হক' । এভাবে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে মুসলিম সূফীরা নিজের ভেতর আল্লাহ্‌র উপলব্ধি করেন, তখনই তিনি মনে করেন তাঁর কামালিয়াত হাসিল হলো । ইসলামের এই আল্লাহ্ উপলব্ধিকে 'ওহাদাৎ-ই-অজুদ' বলা হয় । সূফীপ্রবর ইবনে আরাবী এই মত প্রচার করেন ।

ওহাদাৎ-ই-অজুদ

ইবনে আরাবীর মত কি অভ্রান্ত ? 'ওহাদাৎ-ই-অজুদ'ই কি তবে ইসলামের শিক্ষা ? নিশ্চয়ই না । আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের জন্য কারো কাছে যাবার প্রয়োজন হয় না । স্বয়ং হযরত মুহম্মদ (সা) ছাড়া আধ্যাত্মিক জগতে কে বেশি অগ্রসর হতে পেরেছেন ? কাজেই সূফীদের আদর্শও হবেন হযরত মুহম্মদ । হযরত মুহম্মদ (সা) নিজে কোনদিন 'আনাল হক' বলে দাবি করেননি বরং তিনি বলেছেন ঃ "তিনি আল্লাহ্‌র দাস এবং রসূল ।"

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী পর্যন্ত ইবনে আরাবীর 'ওহাদাৎ-ই-অজুদ' মতবাদই মুসলিম জগতে প্রাধান্য লাভ করে আসছিলো । দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানী এই মতবাদের সংশোধন করেন । তিনি বলেন ঃ 'ওহাদাৎ-ই-অজুদ' সাধনার সর্বোচ্চ স্তর নয়, উহা অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তর । 'আবদিয়াৎ' বা দাসত্বই হচ্ছে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির চরম পরিণতি । বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে সাধক যখন আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করে, তখন সে সব কিছুতেই আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব অনুভব করে । তখন আল্লাহ্‌র প্রতি তার প্রেম বা মহব্বত এতই ঘনীভূত হয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কিছুই সে দেখে না । এই উল্লাসের অবস্থাতেই সে বলে ওঠে ঃ 'আনাল হক' ।

মুজাদ্দিদ সাহেব নিজেও প্রথমত এই 'ওহাদাৎ-ই-অজুদ' মতবাদকেই বিশ্বাস করতেন । পরে কঠোর সাধনার ফলে তিনি জানতে পারলেন, এর ঊর্ধ্বে আরও স্তর আছে । তিনি দেখলেন, 'ওহাদাৎ-ই- অজুদ'-এর স্তরে সূফী যে আল্লাহ্‌র সাথে অভিন্ন মনে করে, তা তাঁর মনের অনুভূতি মাত্র, আসল সত্য নয় ।

মুজাদ্দিদ সাহেবের মতে ওহাদাৎ-ই-অজুদের উপর আরও দু'টি স্তর আছেঃ জিল্লিয়াৎ ও আবদিয়াৎ । জিল্লিয়াতের স্তরে উঠলে সাধক দেখতে পারেঃ সব কিছুই আল্লাহ্‌র ছায়া । এটাও প্রকৃত স্বরূপ নয়, এটাও তাঁর গুণ। কারণ বস্তু (জাত) এবং গুণ (সেফাৎ) কখনও এক হতে পারে না । তখন তিনি আরও উপরে উঠলেন এবং বুঝতে

জিল্লিয়াৎ ও আবদিয়াৎ

www.pathagar.com

পারলেনঃ আল্লাহ্ আরো উপরে—আরো দূরে—বহু দূরে। তখন আল্লাহ্কে জানার সকল গর্ব তাঁর ধূলায় লুটিয়ে পড়ল। তিনি দেখলেন, আল্লাহ্ মহতো-মহীয়ান, আর তিনি তাঁর অতি নগণ্য বান্দা। কাজেই তাঁর জীবন, তাঁর মরণ—সমস্তই আল্লাহ্র ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। সাথে সাথে তিনি এটাও উপলব্ধি করলেন, সমগ্র বিশ্ব আল্লাহ্রই সৃষ্টি, আল্লাহ্রই অনুগ্রহের দান। অতএব সমগ্র সৃষ্টির মনোভাব হওয়া উচিত আত্মনিবেদন ও আত্মসমর্পণের মনোভাব। আল্লাহ্ই আমাদের প্রভু, আল্লাহ্ই আমাদের 'রব'—তিনি ছাড়া আর কেউ আমাদের আল্লাহ্ নেই—এই উপলব্ধিই হচ্ছে আমাদের চরম সিদ্ধিলাভ। এর নামই 'আবদিয়াৎ'। এমনিভাবে আল্লাহ্র ইবাদত বা বন্দনার মারফত দুনিয়ার উপর আল্লাহ্র খিলাফত কায়েম করাই আমাদের জীবনের মূল ও প্রকৃত উদ্দেশ্য। মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে ফেরেশতার জবাবে আল্লাহ্ মানুষকে দুনিয়ার উপর তাঁর খলীফা বলে পরিচয় দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ্র খিলাফত বা প্রতিনিধিত্বের দরজা পর্যন্ত পৌঁছাই এবং দুনিয়ার উপর খিলাফাত-এ-ইলাহি বা আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্বমূলক মনোভাব এবং সমাজ-বিধান কায়েম করাই হবে আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য।

খেলাফৎ

মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি যতই বাড়তে থাকবে ততই আল্লাহ্ সম্পর্কে তার ধারণা জ্ঞান এত বাড়বে যে, সে দেখতে পাবে তার জ্ঞানলাভ কিছুই হয়নি। আরও অনেক জ্ঞানলাভ করার বাকি আছে। আল্লাহ্র গুণাবলী স্বকীয় জীবনে প্রতিফলিত করা, আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করা আরও দূরে, বহু দূরে। বস্তুত আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের এই বিভিন্ন স্তর মানুষকে এক চরম উন্নতি লাভের বিরাট সম্ভাবনার সন্ধান দেয়। মানুষ চেষ্টা ও সাধনা করলে কত উন্নত হতে পারে তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাই আমরা মানব-উন্নতির এসব বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে।

(৯) নবুয়ত—আগেই বলেছি বেলায়েতের সর্বোচ্চ স্তরই হলো নবুয়ত। বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন জাতির ভেতর সত্যের সন্ধান নবীদের কাছে নাজিল হয়েছে। এক এক যুগ, এক এক দেশ বা এক এক জাতির ভেতর সমস্যার সমাধানের জন্য নবীগণ প্রেরিত হয়েছেন। নবী ও ওলীরা আল্লাহ্র সাথে আলাপ করতে পারেন। ওলী আল্লাহ্র সাথে খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে আলাপ করতে পারেন, কিন্তু মূল বিষয়ে নয়। আর নবী মূল বিষয় ও

www.pathagar.com

নীতি সম্পর্কে আলাপ করেন। আলাপ করার সত্যিকার অর্থ সমস্যার সমাধান, সত্য অর্থ ও তাৎপর্য বোধগম্য হওয়া। ওলীর কাছে খুঁটিনাটি ব্যাপারে মর্মবাণী বা সারকথা বোধগম্য হয়। রসূলে করীম (সা) এবং অন্যান্য নবী যে বিশেষ প্রতিনিধি বা ফেরেশ্‌তাদের মারফত ওহী বা প্রত্যাদেশ পেতেন, এ সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কোনো উপলক্ষ ছাড়া আল্লাহ্‌র নির্দেশ পাওয়া সম্ভবপর নয়। রসূলে করীম ওহী পেতেন কিন্তু আল্লাহ্‌কে স্বচক্ষে দর্শন করেননি। রসূলে করীমের পর আর কেউ নবী হতে পারবে না। তবে নবিগণের জীবন এবং জীবনাদর্শকে স্বকীয় জীবনে রূপায়িত করে আদর্শ মানুষ হতে পারবেন।

(১০) রিসালত—নবুয়ত-এর পূর্ণতা প্রাপ্তিই রিসালত। অন্যান্য নবী বিভিন্ন যুগ, বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন জাতির ভেতর শুধু তাদের হিদায়ত করার জন্যই এসেছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য একই ছিল, তবে তা যুগ, দেশ বা জাতি-বিশেষের ভেতর সীমাবদ্ধ ছিল। মানবের ক্রমবর্ধমান জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের দ্বারা আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাসকে ভিত্তি করে গড়ে উঠা জীবন ও সমাজবিধান পরিপূর্ণতা লাভ করল রসূলে করীমের রিসালত-এর মারফত। রসূলে করীম এসেছিলেন সমগ্র বিশ্বমানবের রহমত রূপে। তাঁর প্রতি অবতীর্ণ প্রত্যাদেশই পবিত্র কুরআনে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাঁর জীবন মানুষের আদর্শতম জীবন। বস্তুত তাঁর জীবন মূর্তিমান কুরআন। এমন সর্বগুণ সমন্বিত অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহামানব বিশ্বজগতে আর দ্বিতীয়টি আসেননি। 'ধর্মে কর্মে, ইহ-জীবনে, পর-জীবনে, দৈহিক-জীবনে, আধ্যাত্মিক-জীবনে, নাগরিক জীবনে, পারিবারিক-জীবনে,সংস্কার-সাধনে, জাতি-গঠনে, রাষ্ট্র-রচনায়, জ্ঞানে, পুণ্যে, প্রেমে, বীরত্বে, সৎসাহসে, সংযমে, ত্যাগে, স্বাধীনতায়, স্বাবলম্বনে, সততায়, ন্যায়-নিষ্ঠায়, উদারতায়—যে কোন দিক দিয়েই দেখি না কেন—এমন পরিপূর্ণ আদর্শ মহামানব আর কে ? সব দিক দিয়ে এমন সার্থক জীবনই বা কার ? তিনি যে কেবলমাত্র মানুষের জন্যই পূর্ণ আদর্শ ছিলেন তা নয়,সমগ্র সৃষ্টির জন্যই তিনি ছিলেন চিরন্তন আদর্শ। তিনিই হচ্ছেন সমগ্র সৃষ্টির একমাত্র প্রতিনিধি, যাঁর ভেতর সবাই নিজ নিজ আদর্শ খুঁজে পেতে পারে। হযরতের জন্ম হতে ইন্তিকাল পর্যন্ত তাঁকে কেন্দ্র করে যত ঘটনা ঘটেছে, সব মিলিয়ে দেখা যাবে, নিখিল সৃষ্টি তাঁর ভেতর প্রতিবিম্বিত হয়েছে। একখানি আয়নার ভেতর দিয়ে যেমন লক্ষ লক্ষ প্রাণী

www.pathagar.com

প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বরূপ দেখে নিতে পারে, হযরতও ঠিক তেমনি একখানি আয়না। যে কেউ তাঁর ভেতর নিজের সাচ্চা চেহারা দেখে নিতে পারে। তাঁর জীবন ধন্য, তিনি নিশ্চয়ই রহমাতুল্লিল আলামীন, তিনি নিশ্চয়ই সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, তিনি নিশ্চয়ই আমাদের সনাতন আদর্শ—তিনি নিশ্চয়ই পরম প্রশংসার যোগ্য।' রসূলে করীম (সা) সব বিষয়ে পরিপূর্ণ ছিলেন। তিনি সব বিষয়েই পূর্ণ জ্ঞানলাভ করেছিলেন। তাঁর ভেতর সব গুণই ছিল। মহানবী হযরত মুহম্মদ (সা)-এর রূহ্ এতই উন্নত ছিল যে, তিনি জান্নাত দেখতে পেয়েছিলেন। কোন এক ব্যক্তি জিহাদে লিপ্ত থাকার সময় সবাই তাকে জান্নাতী বলে সম্বোধন করেন, কিন্তু পয়গম্বর তাকে জাহান্নামী বলে বর্ণনা করেন। পরবর্তীকালে এটা জানা গেল যে, লোকটি খুব চিন্তান্বিত এবং ভীতু ছিল। সে খুব নাজুক দিল ছিল। রসূলে করীমের রূহ্ এত উন্নত ছিল যে, তিনি অপরের রূহের চেহারা দেখতে পেতেন এবং তার মন বা আত্মার গভীরে প্রবেশ করতে সক্ষম হতেন। তারপর আর ওহী বা নবুয়ত-এর প্রয়োজন নেই। কোন জিনিস পূর্ণতা প্রাপ্ত হলে তার প্রয়োজন শেষ হয়। সুতরাং হযরত মুহম্মদ (সা) শেষ নবী এবং ইসলাম মানবের স্বাভাবিক এবং আদর্শ ধর্ম। 'আজ হতে তোমাদের দীনকে পূর্ণ এবং ইসলামকে তোমাদের দীন সাব্যস্ত করলাম'—এটাই পবিত্র কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত। এরপর হতে প্রত্যক্ষ অনুভূতির সর্বোচ্চ স্তর ওহী বা প্রত্যাদেশের দরজা বন্ধ হলো। কিন্তু ওহীর নিম্ন স্তরের অন্যান্য প্রত্যক্ষ অনুভূতি এবং আত্মজ্ঞানের মারফত এখনও আল্লাহ্র নৈকট্য এবং প্রকৃতিরূপ মহাগ্রন্থ হতে সরাসরি সম্যক ও সত্যজ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর। মানবের প্রতি আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠতম রহমত পবিত্র কুরআনকে ভিত্তি করে যুগ যুগ ধরে মানব স্বকীয় দেহ, মন ও মস্তিষ্কের উন্নতি, প্রগতি ও ক্রমবিকাশের মারফত পূর্ণতা প্রাপ্তির দিকে এগিয়ে চলবে। নবুয়ত বা রিসালত সম্ভব নয় এবং তার প্রয়োজনও নেই। তবে রসূলে করীমের জীবন, জীবনাদর্শ এবং শরীয়ত হতে উৎসাহ, প্রেরণা ও নির্দেশ নিয়ে মানবের ব্যক্তিগত, সমাজ জীবনে তার বাস্তব প্রয়োগ দ্বারা জান্নাততুল্য সুখ ও শান্তির পরিবেশ এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য মোতাবেক আদর্শতম মানবগোষ্ঠী গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই ফিতরৎ আনন্দে নৃত্য করবে—কুদরৎ তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল হয়েছে মনে করে উৎফুল্ল হবে—মানবের পরিপূর্ণ বিকাশ এবং চরম উন্নতি হবে—মানুষ পূর্ণতাপ্রাপ্তি বা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করবে। এই ধরার বুকে জান্নাত কায়েম হবে।

www.pathagar.com

ঈমান ও আমল

ইসলামের দু'টি দিক আছে—ঈমান ও আমল । ঈমানের অর্থ সাধারণত বিশ্বাস বলে ধরা হয় এবং 'আমানা' অর্থাৎ তিনি বিশ্বাস করেছিলেন, এই শব্দ হতে এর উৎপত্তি । 'আমানা' বিশেষভাবে দু'অর্থে ব্যবহৃত হয়—তিনি তাকে শান্তি ও নিরাপত্তা দান করলেন অথবা তিনি শান্তি বা নিরাপত্তার ভেতর প্রবেশ করলেন । 'আমল' অর্থ হলো বাস্তব কাজ । কুরআনে বিশ্বাসীদের বোঝাতে গিয়ে এই দুটি শব্দ বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে । বস্তুতপক্ষে সত্যিকার বিশ্বাসীদের বর্ণনা প্রসঙ্গে বহুবার বলা হয়েছে ঃ 'যারা বিশ্বাস করে এবং ভাল কাজ করে' । শান্তি ও নিরাপত্তা দাতা হিসাবে আল্লাহ্‌কে এবং শান্তি ও নিরাপত্তার ভেতরে প্রবেশকারী হিসাবে মুসলমানদের 'আল-মুমিন' বলা হয় । মুসলমানগণ যে নীতিতে বিশ্বাস করে সেই মূলনীতিগুলিই তার জীবনে মনের শান্তি এবং সমস্ত ভয়- ভীতি হতে নিরাপত্তা এনে দেয় । প্রথমে নীতিগুলিকেই মানতে হয় এবং তারপরই সে সব নীতিকে বাস্তব ক্ষেত্রে কাজে পরিণত করতে হয় । ঈমানকে মূল এবং আমলকে শাখা বলা যেতে পারে । কারণ মূল হতেই শাখার উৎপত্তি হয়, ঠিক তেমনি ঈমান হতেই কাজ বা আমলের উৎপত্তি । ইসলাম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ করতে হলে ঈমান ও আমলের এই সম্পর্ক অবশ্যই মনে রাখতে হবে ।

নিম্নলিখিত হাদীসসমূহ হতে ইহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে, ঈমানের ভেতর ভাল কাজ করা নিহিত রয়েছে; এমনকি অনেক সময় অনেক হাদীসে ভাল কাজ করাকেই ঈমান বলে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

(১) "ঈমানের ত্রিশটির উপর শাখা আছে এবং পবিত্রতাও ঈমানের একটি শাখা ।"

(২) "ঈমানের সত্তরটির উপর শাখা আছে । এর ভেতর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ঈমান হলো আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কেউ উপাস্য নেই এবং সর্বনিম্ন ঈমান হলো রাস্তা হতে এমন সব চীজ সরানো যা কাউকে ক্ষত করতে পারে ।"

(৩) "আনছারদের ভালবাসা ঈমানের চিহ্ন ।"

(৪) "তোমাদের ভেতর যে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা তার ভাইয়ের জন্য পছন্দ করে না, তার সত্যিকার ঈমান নেই ।"

www.pathagar.com

(৫) "তোমাদের ভেতর যার বাপ, ছেলে এবং সমস্ত জাতির চেয়ে আমার প্রতি অধিকতর ভালবাসা নেই তার ঈমানও সত্যিকার নয় ।"

এমনিভাবে ঈমান শব্দটি প্রত্যেক ভাল কাজের প্রতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং বুখারী তাঁর 'কিতাবুল ঈমান'-এর এক অধ্যায়ে "যিনি বলেন, ভাল কাজ করাই সত্যিকার ঈমান" বলে শুরু করেছেন । এর সমর্থনে তিনি কুরআন হতে বহু আয়াত উল্লেখ করেছেন ।

রসূলে করীম (সা)-এর কাছে প্রেরিত সত্য বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন যেমন ঈমান, তেমনি এর প্রতি অবিশ্বাস স্থাপনই কুফর এবং বাস্তব ক্ষেত্রে যেমন সত্য স্বীকার করা অথবা ভাল কাজ করাকে ঈমান অথবা আংশিক ঈমান বলা হয়, তেমনি খারাপ কাজ করাকে কুফর অথবা আংশিক কুফর বলা হয় ।-তবে মুসলমানদের কোন অবস্থায়ই কাফির বলা চলে না । প্রত্যেক খারাপ কাজ কুফর বা আংশিক কুফর বলে একজন মুসলিমও আংশিক কুফরি কাজ করতে পারে । যেহেতু প্রত্যেক ভাল কাজ করাই হলো ঈমান অথবা আংশিক ঈমান, একজন কাফিরের পক্ষেও ঈমানের কাজ করা সম্ভবপর । তবে মুসলিম ও অমুসলিম অথবা বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর মাঝে পার্থক্য হলো— এক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস এবং রসূলে করীম (সা)-এর নবুয়ত সম্পর্কে প্রকাশ্য ঘোষণা—এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন আল্লাহ্ নেই এবং মুহম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল । সুতরাং এই কলেমার উপর বিশ্বাস আছে বলেই তাকে মুসলিম বলতে হবে এবং যতদিন পর্যন্ত সে প্রকাশ্যভাবে এটা অস্বীকার না করে, ততদিন পর্যন্ত তাকে মুসলিম বলতেই হবে, তা সে ধর্ম সম্পর্কে যে মতই পোষণ করুক না কেন অথবা যে কোন খারাপ কাজই করুক না কেন । কলেমা তৌহিদের উপর স্বীকৃতির প্রকাশ্য ঘোষণা না করলে যত ভাল কাজ করুক না কেন তাকে মুসলিম বলা চলবে না । কুরআন এবং হাদীসেও এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে । কুরআনে বলা হয়েছে ঃ 'এবং যে কেউ তোমাকে সালাম জানালে—তাকে কখনও অবিশ্বাসী বলবে না ।' সুতরাং 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলে অপরকে অভিবাদন জানালেই মুসলিম বলে পরিগণিত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট এবং সে মুনাফিক হলেও তাকে অমুসলিম বলার কোন অধিকার নেই ।

ইসলামের দু'টি দিক আছে একথা আগেই বলেছি । এর একদিক ঈমান আর একদিক আমল । ঈমান ইসলামের একটি অংশ। একে গোটা মনে করা

www.pathagar.com

ভুল । ইসলামের মূলনীতিতে ঈমান আনলে তাকে মুমিন বলা হয় । মুমিনও মুসলিম, তবে আংশিক মুসলিম । মুমিন নীতিকে বিশ্বাস করার সাথে সাথে স্বকীয় জীবনে তা আমল করলেই সে হবে খাঁটি মুসলিম । ঈমান অর্থে শুধু বিশ্বাস এবং ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ বা শান্তি স্থাপন । যদিও সাধারণত এই দুটি শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হয় । কুরআন ও হাদীসেও এই পার্থক্যের কথা উল্লেখিত আছে । কুরআনে আছে ঃ "মরুবাসিগণ বলে, আমরা বিশ্বাস করি (আমানা ঈমান হতে) ; বল, তোমরা বিশ্বাস কর না, কিন্তু বল, আমরা শান্তি স্থাপন করি (আস্‌লামা—ইসলাম হতে) ; এবং তোমাদের অন্তরে এখনও ঈমান প্রবেশ করেনি এবং তোমরা যদি আল্লাহ্‌র এবং তাঁর রসূলকে অনুসরণ কর, তাহলে তিনি তোমাদের কাজকে হ্রাস করবেন না ; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময়" ৪৯ ঃ ১৪ । পরবর্তী আয়াতে ঈমান অন্তরে প্রবেশের অর্থ তাৎপর্য সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছেঃ "যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলকে বিশ্বাস করে তারাই মুমিন, তারপর আর তাঁরা সন্দেহ করে না এবং আল্লাহ্‌র পথে ধনসম্পদ এবং জীবন দিয়ে যারা কঠোর সংগ্রাম করে, তারাই সত্যবাদী" ৪৯ ঃ ৫ । বস্তুতপক্ষে ঈমান ও ইসলাম উভয় শব্দই মানুষের উন্নতি প্রগতি ও বিকাশের পৃথক পৃথক স্তর মাত্র । শুধু আল্লাহ্‌র একত্বে এবং মুহম্মদের রিসালতে বিশ্বাস করলেই মুমিন বলা হয় । এটাই ঈমানের প্রথম স্তর । কারণ প্রকাশ্যভাবে কোন বিশেষ নীতি ও মতবাদে স্বীকৃতি ও ঘোষণা দ্বারাই মানুষ শুরু করে এবং মানুষ যখন সেই নীতি ও মতবাদকে যথাসাধ্য বাস্তব জীবনে রূপায়িত করে, তখন তাকে মুমিন বলা হয় । ঈমানের প্রথম স্তরে—নীতিকে মুখে স্বীকৃতি এবং তার প্রকাশ্য ঘোষণা এবং দ্বিতীয় স্তরে ঈমান পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে এবং ঈমানের শেষ স্তরের সূচনা করে এবং অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে প্রয়োজনীয় মানসিক ও আন্তরিক অবস্থা গড়ে তোলে । ইসলামের বেলায় ঠিক একরূপ। এর প্রথম স্তরে ইসলাম অর্থ শুধু আত্মসমর্পণ বা শান্তি স্থাপন করার ইচ্ছা প্রকাশ, যেমন উপরোল্লিখিত ৪৯ ঃ ১৪ আয়াতে বলা হয়েছে । এর শেষ স্তরে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ বা শান্তি স্থাপন বোঝায়, যেমন ঃ 'যে আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে এবং যে ভাল কাজ করে (অপরের প্রতি) তার স্রষ্টা কর্তৃক সে পুরস্কৃত হবে এবং তাদের জন্য ভয় নেই এবং তাদের দুঃখ করতে হবে না ।' ২ ঃ ১১২ এভাবে দেখতে

www.pathagar.com

পাওয়া যায় ঈমান ও ইসলাম উভয় শব্দই প্রথম ও শেষ স্তরে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়—শুধু স্বীকৃত ও ঘোষণা হতে শুরু করে পূর্ণতা প্রাপ্তি পর্যন্ত এবং মধ্যবর্তী সমস্ত স্তরও এদের ভেতরই নিহিত রয়েছে। উভয়েরই শুরু এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে। যে ব্যক্তি কেবল শুরু করেছেন এবং যিনি পূর্ণতা-প্রাপ্তি লাভ করেছেন এবং যারা মধ্যবর্তী স্তরে রয়েছে—যতই পার্থক্য তাদের ভেতর থাকুক না কেন, তাদের সবাইকে মু'মিন ও মুসলিম বলা হয়।

উল্লিখিত আলোচনা হতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামে গোঁড়ামি নেই, শুধু অন্ধ বিশ্বাস বলপূর্বক চালিয়ে তার পারলৌকিক মুক্তির কথাও ইসলাম শিক্ষা দেয় না। ইসলামের ঈমান অর্থ শুধু কোন নীতিতে বিশ্বাসই বোঝায় না, এটা প্রধানত বাস্তব জীবনে কাজ করার নীতি হিসাবেই এই স্বীকৃতি বা বিশ্বাস স্থাপনের উপর জোর দেয়। কুরআনেও এ সম্পর্কে এই সুস্পষ্ট মতই দেখা যায়। কুরআনে ফেরেশতাদের যেমন বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে, তেমনি শয়তানের উপরও অবিশ্বাস করতে বলা হয়েছে। সুতরাং যে শয়তানকে অবিশ্বাস এবং আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে, সে ঈমানকে মজবুত করে ধারণ করেছে, ২ ঃ ২৫৭। আল্লাহ্ ও ফেরেশতাদের উপর বিশ্বাস এবং শয়তানের উপর অবিশ্বাসই যথেষ্ট নয়। আল্লাহ্‌র উপর নিছক বিশ্বাস করাতেও কোন সার্থকতা নেই, যদি এই বিশ্বাসের সাথে কাজের যোগ না থাকে। বস্তুত আমলবিহীন ঈমান অসম্পূর্ণ। আল্লাহ্ স্বয়ংসিদ্ধ, স্বয়ংসম্পন্ন এবং স্বয়ং সন্তুষ্ট। তাঁর কোন সৃষ্ট জীব তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করলে বা না করলে তাতে তাঁর কিছুই যায় আসে না। বিশ্বাস করে তদনুসারে কাজ না করলে মানুষের ব্যক্তি বা সমাজ-জীবনে এই বিশ্বাস খুব বেশি কার্যকরী নয়। সুতরাং আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস স্থাপন করার সত্যিকার অর্থ ও তাৎপর্য হলো তাঁর বিধিনিষেধ মোতাবেক ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে সুনিয়ন্ত্রণ করা। কুরআনে বলা হয়েছে, ফেরেশতাগণ মানুষকে ভাল কাজ করার জন্য অনুপ্রাণিত করে এবং শয়তান তাকে খারাপ কাজে উৎসাহ দেয়। সুতরাং ফেরেশতাদের উপর বিশ্বাসের সত্যিকার অর্থ ও তাৎপর্য হলো সদাসর্বদা ভাল কাজ করা এবং শয়তানের উপর অবিশ্বাস অর্থ হলো সদা খারাপ কাজ করার প্রবৃত্তিকে দমন করা। সুতরাং ঈমান বা বিশ্বাস হলো আমল বা কাজের ভিত্তি—ইসলামের প্রত্যেক নীতি এই কথারই প্রতিধ্বনি করে। ইসলামে

www.pathagar.com

অন্যান্য ধর্মের ন্যায় কোন গোঁড়ামি, অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার, আকার এবং বাইরের খোলসের প্রতি বিশেষ জোর দেয় না। এতে এমন কোন রীতিনীতি নেই যা মানুষকে কাজ করতে উৎসাহিত না করে। মানুষের উন্নতি, প্রগতি ও ক্রমবিকাশের জন্য ইসলামের প্রত্যেক নীতিকে বাস্তব জীবনে রূপায়িত করতে হয়।

ইসলামের সমস্ত নীতি কলেমা তৌহিদের ভেতর নিহিত রয়েছে ঃ 'এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন আল্লাহ্ নেই ; হযরত মুহম্মদ তাঁর প্রেরিত পুরুষ।' কুরআনে এই দুটি আয়াত একই সাথে কোথাও উল্লেখ নেই। দ্বিতীয় আয়াতটি কুরআনে বহুবার উল্লেখিত প্রেরিত পুরুষকে ভিত্তি করেই ইসলামের মূলমন্ত্রের ভেতর যুক্ত করা হয়েছে ঃ হাদীস অনুসারে কলেমা তৌহিদের এই দুটি অংশে বিশ্বাস স্থাপনই হলো ইসলামে বিশ্বাস স্থাপন। এই বিশ্বাসকে 'ঈমান মুজম্মল' অর্থাৎ ঈমানের সংক্ষিপ্ত প্রকাশ এবং ঈমানের ব্যাপক প্রকাশ বা স্বীকৃতিকে 'মুফাচ্ছল' বলা হয়। কুরআনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথমে বলা হয়েছে—'আখিরাতে বিশ্বাস, পবিত্র রসূল মুহম্মদের নিকট প্রেরিত প্রত্যাদেশসমূহে বিশ্বাস, এবং তাঁর আগের পয়গম্বরদের নিকট যা প্রেরিত হয়েছিল তার উপর বিশ্বাস এবং পরকাল বিশ্বাস ২ ঃ ২-৪।' এই একই অধ্যায়ে ইসলামের পাঁচটি ঈমানের কথাও সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে ঃ 'আল্লাহতে বিশ্বাস, এবং শেষ দিনে, ফেরেশতাদের এবং কিতাবগুলি এবং নবীদের উপর বিশ্বাস ২ ঃ ১৭৭।' কুরআনে বার বার এই পাঁচ ঈমানের কথাই বলা হয়েছে।

প্রত্যেক ঈমান হলো কাজের ভিত্তি একথা বার বার বলা হয়েছে। আল্লাহ্ পূর্ণ এবং স্বয়ংসম্পন্ন। তিনি সমস্ত পূর্ণতম গুণাবলীর অধিকারী। সুতরাং আল্লাহ্তে সত্যিকার বিশ্বাস অর্থ হলো আল্লাহ্র নির্দেশ মোতাবেক চলা এবং তাঁর সিফাৎকে স্বকীয় জীবনে আয়ত্ত করে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করা। মানুষ সবচেয়ে সুন্দর ও পবিত্রতম আল্লাহ্র গুণাবলীকে সামনে রেখে স্বকীয় জীবনকে উন্নত, বিকশিত ও পূর্ণতা-প্রাপ্তির দিকে এগিয়ে নিতে চেষ্টা করলে তার উন্নতি, প্রগতি ও পূর্ণ বিকাশের কি বিরাট সম্ভাবনাই না সূচিত হবে। ফেরেশতাদের উপর বিশ্বাস অর্থ হলো মানুষ তার ভেতরকার সহজাত এবং স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নিয়ে ভাল কাজ করবে এবং সদা অন্যায় ও খারাপ কাজ

www.pathagar.com

থেকে দূরে থাকবে। আল্লাহ্‌র প্রদত্ত কিতাবের উপর বিশ্বাস অর্থ হলো—সেই সমস্ত কিতাবে বর্ণিত ন্যায় ও সত্য পথে চলা এবং ব্যক্তি ও সমাজ-জীবন তদনুসারে নিয়ন্ত্রণ করা। নবীদের উপর বিশ্বাস অর্থ হলো— মহানবী মহামানবদের ত্যাগ, সাধনা ও কর্মকৌশলের মহান আদর্শ অনুসারে আমাদের জীবন গড়ে তুলে বিশ্ব মানবতার কল্যাণ সাধনে ব্রতী হওয়া। শেষ দিনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে আমরা প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি কাজে অন্যায়, খারাপ কাজ ও অধর্ম হতে দূরে থাকব।

www.pathagar.com

কলেমার রূপ

আরব জাতিকে ইসলামের অগ্রণী করা নেহায়েত সুবিবেচনা প্রসূত। এটা আকস্মিক নয়। কোন বিশেষ উন্নত ও সভ্যজাতির ভেতর ইসলামের বৈপ্লবিক রূপ এবং বৈশিষ্ট্য ততটা পরিষ্কার এবং সুনিশ্চিতরূপে ফুটে উঠত না। কার্লমার্কসের মতবাদ এবং আশা-অনুসারে জগতের সবচেয়ে শিল্পোন্নত এবং সুসংগঠিত দেশ ইংল্যাণ্ডই মার্কস্‌বাদ রূপায়িত হবার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল। কিন্তু পক্ষান্তরে রাশিয়ার মত একটি অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ দেশ মার্কসবাদকে রূপায়িত করার গৌরব অর্জন করল। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। একটি উজ্জ্বল আলোকিত কামরায় খুব উঁচু শক্তিবিশিষ্ট মোমবাতি প্রজ্বলিত হলেও তার প্রভা ও উজ্জ্বলতা বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু অন্ধকার পরিবেশের মাঝে এর প্রভা সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। নিকৃষ্ট সীসার পাতের মাঝে হীরা সবচেয়ে উজ্জ্বল দেখায়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, হযরত মুহম্মদ (সা)-এর আবির্ভাবের সময় নৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক বাস্তবিক পক্ষে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে এবং প্রতি দিকে আরবজাতি সবচেয়ে অধঃপতিত ও অনুন্নত ছিল। তারা ছিল সভ্য ও উন্নত মানবতার সবচেয়ে নিকৃষ্ট শ্রেণী। রসূলে করীম (সা) মাত্র তেষট্টি বছর বেঁচেছিলেন এবং চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়ত পেয়েছিলেন। সুতরাং নবুয়ত প্রাপ্তির এই তেইশ বছরই তিনি তাঁর আদর্শ ও মতবাদ প্রচার ও কার্যকরী করেছেন। ইতিহাস আরও সাক্ষ্য দেয় যে, যে বেদুঈন যাযাবর আরবজাতি সামান্য কয়েক বছর আগে সবচেয়ে অধঃপতিত, অনুন্নত ও নিকৃষ্ট ছিল, তারাই রসূলে করীমের ইন্তিকালের সময় নৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এক কথায় জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে মানব জাতির ভেতর আদর্শতম বলে পরিগণিত হলো। অশিক্ষিত আরবজাতি সভ্য জগতের শিক্ষাগুরু হলো। ক্ষুদ্র জগত সভায় মহত হলো। যে অসভ্য আরবগণ সদা মদ, ব্যভিচার, জুয়াখেলা এবং সব রকমের নৈতিক ও মানসিক অশিষ্টাচারে ও বিপথ গমনে লিপ্ত ছিল, তারাই দুনিয়াকে সবচেয়ে সুন্দর ও আদর্শতম শিষ্টাচার শিক্ষা দিল। অসংখ্য জাতি, উপজাতি ও

www.pathagar.com

পরিবারে বিভক্ত এবং সদা সাংসারিক ও জাতীয় কলহ-কোন্দল, বিবাদ-বিসম্বাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত আরবগণ নিজেদের একটি ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত জাতিতে পরিণত করল এবং দুনিয়াকে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের সত্যিকার আদর্শ শিক্ষা দিল। যে উগ্র মস্তিষ্ক আরবগণ সামান্যতম লোভ ও উত্তেজনা সম্বরণ করতে সক্ষম হত না, তারাই দুনিয়ায় সংযম ও সহনশীলতার আদর্শতম নজির রেখে গেল। তেইশ বছরের ভেতর অসভ্য ও অশিক্ষিত আরবগণ এমন এক আদর্শ ও শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হলো, দুনিয়ার ইতিহাসে যার নজির নেই। এটাই ইসলামের বৈশিষ্ট্য। কোন ব্যক্তিবিশেষের জীবনে তেইশ বছর এমন বিশেষ অর্থ ও তাৎপর্যপূর্ণ নয়। সামগ্রিকভাবে জাতি বা মানবগোষ্ঠীর জীবনে তেইশ বছর তো সাগরে জলকণাতুল্য। প্রত্যেক জিজ্ঞাসু মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, কি করে এই বিরাট ও অলৌকিক পরিবর্তন এত অল্প সময়ের ভেতর সম্ভব হলো এবং হযরত মুহম্মদ (সা)-এর শিক্ষার ভেতর এমন কি বিশিষ্ট গুণ ছিল যা মানুষের চিন্তা, অনুভূতি এবং কাজের ভেতর এমন অনুপম বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিল।

এটা একটা অলৌকিক ব্যাপার। মাত্র তেইশ বছরে একটা জাতির জীবনে এমন বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ইতিহাসে আর দেখা যায় না। কিরূপে এই বিস্ময়কর ব্যাপার সম্ভব হলো ? এর একমাত্র জবাবঃ ইসলামই এটা করেছে।

'ইসলামের ইতিহাস—একটা বিপ্লবের ইতিহাস। কুরআনের শিক্ষা—একটা বিপ্লবের বাণী। হযরতের জীবন—একজন বিপ্লবীর সংগ্রাম। এই বিপ্লবের মূলসূত্র, ইসলামের শিক্ষার আসল স্পর্শমণি—কলেমা তৈয়ব—'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, মুহম্মদুর রসূলুল্লাহ্।' মাত্র এই চারটি শব্দে ইসলামের গোটা শিক্ষার এবং ভাবী দুনিয়ার সব সমস্যার সমাধান ও বিপ্লবের গুঞ্জায়েশ্ করা হয়েছে। এই চারটি শব্দের প্রকৃত ও সঠিক অর্থ ও তাৎপর্য ধরতে পারলে ইসলামকে বোঝা সহজ হয়ে যায়। ইসলামকে বুঝতে পারলে আরব জাতির বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের হেতু সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। কিন্তু চরম পরিতাপের বিষয় এই যে, কলেমার সত্যিকার অর্থ ও তাৎপর্য আমরা ভুলে গিয়েছি। এটা এখন শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে এবং নামমাত্র মুখে আওড়ান হয়। মানুষের চিন্তা ও কাজের ভেতর এর বাস্তব প্রয়োগ করা হয় না। দৈনন্দিন জীবনে এর বাস্তব প্রয়োগ না করার দরুন যদি কেউ মনে করে এর বাস্তব প্রয়োগ মানুষের ব্যক্তি

www.pathagar.com

ও সমাজ-জীবনে বিশেষ কোন কল্যাণকর পরিবর্তন সাধন করতে পারে না,তা হলে মহা ভুল করা হবে। মানুষ আশু ও সাময়িক সুখ-শান্তির ভেতর এতই মেতে গেছে যে, সে তার চরম উন্নতি, সুখ, শান্তি ও পূর্ণতা প্রাপ্তির কথা ভুলে গেছে। অস্ত্র বা হাতিয়ার সঠিকভাবে ব্যবহৃত না হলে তার শক্তি বা ক্ষমতা সম্পর্কে কোন ধারণা করা চলে না। কলেমা সম্পর্কেও ঠিক তাই বলা চলে। মার্কস্‌বাদ লেনিন ও স্ট্যালিন কর্তৃক রাশিয়ায় বাস্তবে রূপায়িত না হলে তা ক্যাপিটালের পাতায়ই লিপিবদ্ধ থাকতো। কলেমাকে সত্য ও সত্যানুসন্ধানের মূল ভিত্তিরূপে গ্রহণ করুন বা নাই করুন, এটা চিন্তা ও কাজের সঠিক পথ প্রদর্শক বলে বিবেচিত হোক বা না হোক—এর নিজস্ব গুণ ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং যুগ যুগ ধরে এটা ধীরে ধীরে কিন্তু সুনিশ্চিতরূপে মানুষকে সুখ, শান্তি, উন্নতি, প্রগতি ও পূর্ণতা প্রাপ্তির দিকে এগিয়ে নেবেই এবং এটা অনাদিকাল পর্যন্ত বিপ্লবের দীপবর্তিকা বহন করবেই। সাগরের উত্তাল তরংগের মাঝে যেমন কম্পাস জাহাজকে গন্তব্যস্থলে নিয়ে যায়, ঠিক তেমনি চিরন্তন সংঘাত-সংঘর্ষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, ক্রমবিকাশ এবং ক্রমোন্নতির ভেতর দিয়ে এটা মানবতাকে চিরন্তন সুখ, শান্তি ও পূর্ণতা প্রাপ্তির দিকে এগিয়ে নেবেই। যুক্তিজ্ঞান ও ধীশক্তি এবং অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ অনুভূতি জ্ঞানলাভের এই উভয়বিধ উপায় ও পদ্ধতি নিজ নিজ ক্ষেত্রে সবিশেষ প্রয়োজনীয়, উপকারী এবং শক্তিশালী। এর কোনটাকে অস্বীকার বা অবহেলা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কিন্তু মানুষের জ্ঞান ও ধীশক্তি সীমাবদ্ধ। এটা মানুষকে উন্নতি ও প্রগতির কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা পর্যন্ত নিয়ে দিশেহারা হয় এবং অধিকতর উন্নতি ও প্রগতির পথে এগিয়ে চলার সঠিক পথ খুঁজে বেড়ায়। প্রত্যক্ষ অনুভূতি বা এর সমশ্রেণীর আত্মজ্ঞান তখন মানুষকে পথনির্দেশ করে—চিরন্তন সুখ, শান্তি, উন্নতি ও প্রগতির পথে এগিয়ে চলার। 'কলেমার সত্যিকার অর্থ ও তাৎপর্যের উপলব্ধি এবং মানুষের চিন্তা ও কাজের ভেতর এর বাস্তব প্রয়োগ ও প্রভাবের স্বীকৃতিই নিয়ে আসবে মানুষের মুক্তি তাকে সঠিকভাবে পরিচালিত করবে ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতির পথে এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল করবে। নিউইয়র্ক বা লণ্ডনের পুঁজিবাদী পাশ্চাত্য বস্তুবাদ অথবা তার প্রতিক্রিয়া মস্কোর কমিউনিজম তা করতে সক্ষম হবে না।'

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, মুহম্মদুর রসূলুল্লাহ্—আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ প্রভু নেই, মুহম্মদ তাঁর বাণী বা তত্ত্ববাহক। এ ছোট্ট কথাটির তাৎপর্য কি ? প্রথম

www.pathagar.com

অংশে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ আমাদের প্রভু নেই, আর দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে মুহম্মদ তাঁর তত্ত্ববাহক প্রেরিত পুরুষ। প্রথম অংশের আবার দুটি দিক রয়েছে। প্রথম দিক—না-মূলক এবং দ্বিতীয় দিক— হ্যাঁ-মূলক। প্রথম দিক-এ বলা হয়েছে—লা-ইলাহা—কোন প্রভু নেই। দ্বিতীয় দিক-এ বলা হয়েছে—ইল্লাল্লাহ্—আল্লাহ্ ছাড়া। সুতরাং কলেমার তিনটি অংশ রয়েছে—প্রথম দেব-দেবী ও ভগবান এবং আল্লাহ্র বহুত্বে অস্বীকৃতি, দ্বিতীয়—আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাস এবং তৃতীয়—হযরতের নবুয়ত বা রিসালতে বিশ্বাস। প্রথম অংশ আল্লাহ্ ছাড়া সৃষ্টির সব কিছুর উপর মানুষের আসন প্রতিষ্ঠা করে মানুষকে আশরাফুল মখলুকাত বলে ঘোষণা করে। আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাস বিশ্ব-মানবজাতির একত্বের উপলব্ধি এনে দেয় এবং হযরতের নবুয়ত এবং ওহী বা প্রত্যাদেশের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে শিক্ষা দেয় এবং সব মানুষ যে সমান, হযরতও যে সাধারণ মানুষ ছিলেন তারই প্রমাণ করে। এই তিনটি বিশ্বাস মানুষের চিরন্তন বাঁচার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন এবং বিপ্লব সাধনের নির্দেশ দেয়। বস্তুত মানুষের দৈনন্দিন ও বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্ক ও প্রভাববর্জিত নিছক বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা ইসলামে নেই। বিশ্বাসের আরবী শব্দ ঈমান সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। আমল বা কাজবিহীন ঈমান অর্থহীন এবং ঈমান বা দার্শনিক পটভূমি ছাড়া আমল বা কাজ গোঁড়ামি ও অন্ধবিশ্বাস-প্রসূত। এর কোনটাই মানবের ব্যক্তিগত বা সমাজ-জীবনে ততটা কার্যকরী নয়। একের সাথে অপর অবিচ্ছিন্ন, একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি টিকতে বা উন্নত ও বিকশিত হতে পারে না।

দেব-দেবী ও ভগবান এবং আল্লাহ্র বহুত্বে অস্বীকৃতি এবং আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাস—না হয় বোঝা গেল, কিন্তু মুহম্মদের নবুয়তে ও রিসালতে বিশ্বাস করার প্রয়োজনীয়তা কি ? এটারও অপরিহার্য প্রয়োজন আছে। ধর্ম প্রবর্তকদের আল্লাহ্র অংশীদারে পরিণত করা সব যুগের, সব ধর্মের ভক্তদের একটা বাতিক ও দুর্বলতা। হযরত ঈসাকে আল্লাহ্র পুত্র করা হয়েছে। ভারতীয় মহাপুরুষদের ব্রাহ্মণেরা ঈশ্বরের অবতার বলেছেন। যুগে যুগে মানুষ এই ভুল করেছে। এভাবে তারা ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা হতে দূরে সরে গিয়ে অধঃপতিত হয়েছে। ইসলাম মানুষকে ঐ ভুলের পুনরাবৃত্তি হতে বাঁচার জন্য মূল সূত্রেই বলে দিয়েছে ; মুহম্মদ আল্লাহ্র তত্ত্ববাহক মাত্র—তার বেশি কিছু

www.pathagar.com

নয়। এই কথাটাই আরও স্পষ্ট করে বোঝার জন্য কুরআন শরীফের একাধিক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ 'কুল আনা বাশারুম মিস্‌লুকুম ইউহা এলাইয়া। বল (হে মুহম্মদ), আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ, পার্থক্য মাত্র এই য়ে, আমার উপর আল্লাহ্‌র ওহী নাজিল হয়েছে।'

কুরআনে আরও বর্ণনা করা হয়েছে ঃ 'যারা তোমার (মুহম্মদ) উপর যা নাজিল হয়েছে এবং তোমার আগে যা নাজিল হয়েছে তাতেও বিশ্বাস স্থাপন করে, তারাই রবের প্রদর্শিত সঠিক পথে রয়েছে এবং তারাই জয়যুক্ত হবে।' কুরআন হযরত মুহম্মদ (সা)-এর আগের প্রত্যাদেশসমূহেও বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য নির্দেশ দিয়ে এটাকে ঈমানের অন্যতম অংশ বলে ঘোষণা করে। বিভিন্ন যুগ, বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন জাতির ভেতর নবী প্রেরিত হয়েছে, একথা প্রত্যেক মুসলিমকে বিশ্বাস করতে হয়। হযরত মুহম্দ এদেরই মত একজন নবী। তবে পার্থক্য এই যে, অপরাপর সব নবী এসেছিলেন কোন বিশেষ যুগ, দেশ ও জাতির জন্য, আর মুহম্মদ এসেছিলেন সব যুগ, সব দেশ, সব জাতির জন্য। বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের ভেতর সমন্বয় সাধন করাই ছিল মুহম্মদের রিসালতের মূল ও মুখ্য উদ্দেশ্য। 'সমগ্র মানব এক জাতি' এই মহাসত্য দুনিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ইসলাম সব ধর্ম, মতবাদ ও সংঘাতের এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন করে। বস্তুত ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতির সাধারণ নিয়মানুসারে বিভিন্ন যুগ, বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন জাতির ভেতর অবতীর্ণ ধর্ম ও মতবাদ ধীরে ধীরে পূর্ণতা-প্রাপ্তি লাভ করে মুহম্মদের সময়। তাই ইসলামকে পূর্ণ 'দীন' বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং এরপর হতে আর নবী ও ওহীর প্রয়োজন হবে না বলেও ঘোষণা করা হয়েছে। হযরত মুহম্মদ ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তাঁর জীবন এবং জীবনাদর্শের খুঁটিনাটি সঠিকভাবে ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। কুরআন সম্পূর্ণ নির্ভুল এবং বিশুদ্ধভাবে আজও বিদ্যমান। জগতের অন্য সব ধর্মই পরবর্তীকালে বিকৃত হয়ে নানাভাবে আল্লাহ্‌র কল্পনা করেছে এবং তাঁর বিকৃত পরিচয় দিয়েছে। কোন্ আল্লাহ্ যে সত্যিকার এবং আসল, তা বুঝতে মানুষের কষ্ট হতে পারে। কাজেই আল্লাহ্ বলে দিয়েছেন ঃ সেই আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন আল্লাহ্ নেই—যে আল্লাহ্‌র রসূল মুহম্মদ। আল্লাহ্ সম্পর্কে যাবতীয় ভ্রান্ত ধারণা হতে মানুষের মনকে তিনি মুক্ত করেন এবং কেমন করে তাঁকে পাওয়া যায়, সে পথের সন্ধান দেন। একথার তাৎপর্য এই যে, যদি সত্যিকার আল্লাহ্‌কে পেতে চাও তবে তাঁর দূত

www.pathagar.com

মুহম্মদের কাছে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস কর এবং তাঁর 'তরীকা' অবলম্বন কর। মুহম্মদ যা বলেছেন তাই হচ্ছে আল্লাহ্‌র খাঁটি পরিচয় এবং যে মত ও পথের নির্দেশ দিয়েছেন তাই হচ্ছে আল্লাহ্‌ ও পূর্ণতা-প্রাপ্তির নিশ্চিত পথ। বলা বাহুল্য, এজন্যই আল্লাহ্‌র একত্ব ঘোষণার সাথে সাথে মুহম্মদকেও আল্লাহ্‌র রসূল বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

কলেমার প্রথম ভাগে অতি স্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাষায় দেব-দেবী ও ভগবান এবং আল্লাহ্‌র বহুত্বে অস্বীকৃতি এবং আল্লাহ্‌র একত্ব ঘোষণা করা হয়েছে। কলেমা শুরু হয়েছে—'লা' (নাই) কথা দ্বারা। 'লা-ইলাহা'— নাই কোন প্রভু আমাদের। মানুষ দুনিয়ার ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম সব প্রভুত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। তাই প্রভু কারা ? যেদিন ইসলাম এই বিদ্রোহ ঘোষণা করলো 'নহে কেহ প্রভু আমাদের' সেদিন প্রভুত্বের আসনে কারা সমাসীন ছিল ? পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, গাছপালা, পাথর বা মাটির নানরূপ মূর্তি, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা, ঝড়, বৃষ্টি, অগ্নি, বায়ু সবই মানুষের প্রভু। এমনকি পশু-পক্ষী, সাপ, ব্যাঙ সবই মানুষের দেবতা। মানুষের চেয়ে প্রকৃতির সব শক্তি, সব জীব শ্রেষ্ঠ—মানুষই সবচেয়ে অধম। এভাবে মানুষ নিজেকে অনেক নীচে নামিয়েছিলো, নিজেকে সে অতি হীন, নীচ প্রাণী মনে করতো। তাই মানুষ সবার পূজা করবে, সবার তাঁবেদার হয়ে থাকবে। মানুষের ভাগ্য, তাদের অন্ন, তাদের অধিকার সবই নির্ভর করে প্রকৃতির এসব শক্তি ও জীবের অনুগ্রহের উপর। তাই মানুষ সব জীবের 'দাসানুদাসরূপে ঐসব শ্রেষ্ঠ জীবের অনুগ্রহ লাভের আশায় ওদের পূজা, অর্চনা ও শান্তি স্বস্ত্যয়ন করে আসছে।' চারদিকের প্রভুত্বের চাপে মানুষের আত্মা অবনত মস্তকে ঘৃণিত জীবন যাপন করছে।

এই অবস্থায় ইসলাম এসে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করল ঃ সব মিথ্যা, সবই মিথ্যা। নহে এরা প্রভু আমাদের। এদের প্রভুত্বের আসন কেঁপে উঠল। সহস্র প্রভুর প্রভুত্বে নিষ্পেষিত মানুষ এই আশার কথা, এই ভক্তির বাণী শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল এবং বিস্ময়ানন্দে জিজ্ঞেস করল ঃ এরা আমাদের প্রভু নয় ? আমাদের উপর প্রভুত্ব করার তাদের আর কোন অধিকার নেই। কে তবে আমাদের প্রভু ? ইসলাম কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করল ঃ ইল্লাল্লাহ্‌—আল্লাহ্‌ ব্যতীত। আল্লাহ্‌ ছাড়া কেউ আমাদের প্রভু বা উপাস্য নেই। যত দেব-দেবী, মূর্তি ও প্রাকৃতিক শক্তি উপাস্য বলে পরিগণিত হয়ে আসছে তা সবই মিথ্যা, সবই ভুল। এরা কেউ আমাদের প্রভু বা

আধ্যাত্মিক রূপ

www.pathagar.com

উপাস্য নয়। একমাত্র আল্লাহ্-ই আমাদের প্রভু, উপাস্য। এক আল্লাহ্কেই উপাসনা করতে হবে। এক আল্লাহ্রই ইবাদত-বন্দেগী করতে হবে—অন্য কারও নয়। যুগ যুগান্তের নিষ্পেষিত অবমানিত মানবাত্মা মাথা উঁচু করে জিজ্ঞেস করল ঃ এই চাঁদ-সুরুজ, গ্রহ-তারা, ঝড়-বৃষ্টি, নদী-নালা, খাল-বিল, পাহাড়-পর্বত, জীব-জন্তু এরা তবে কারা ? এরা কি তবে আমাদের প্রভু নয় ? ইসলাম স্পষ্ট ভাষায় জবাব দিল ঃ না, এরা তোমাদের প্রভু নয়, তোমরাই এদের প্রভু। কুরআন বলল ঃ 'আসমান যমীনে যা-কিছু আছে সব কিছুকেই আমি তোমাদের সেবক বানিয়েছি। তোমরাই আশরাফুল মখলুকাত', তোমরাই আল্লাহ্র সৃষ্টির ভেতর সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। মানুষ তার আত্মার সত্যিকার পবিচয় পেল। এই অনুভূতি জীবনে আসার দরুন কেবল আত্মারই চরম উন্নতি সাধিত হলো না ; তার দেহ, মন, মস্তিষ্ক, ধীশক্তি ও প্রতিভার উন্নতি ও বিকাশের বিরাট সম্ভাবনা সূচিত হলো। সৃষ্টির আদিম কাল থেকে মানুষের মনে যে ভয়, ভীতি ও কুসংস্কার ছিলো—যা-কিছু প্রবল শক্তিশালী, বৃহৎ এবং আশ্চর্যজনক তার সামনেই সে মাথা অবনত করত, তাকেই ভয় করত। যুগ যুগান্তের পুঞ্জিভূত ভয়-ভীতি দূর হলো। মানুষ তার সত্যিকার পরিচয় পেল। কলেমা অনেকেশ্বরবাদী, অজ্ঞতা, ভয়-ভীতি ও কুসংস্কার এবং নাস্তিক্য জ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও অহমিকার অবসান করে মানুষকে সৃষ্টির ভেতর তার সঠিক এবং সত্যিকার মর্যাদা দান করল। মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। সে স্রষ্টাও নয় এবং অন্ধ বিকৃত বা পরিবেশেরও সৃষ্টি নয়। এই উপলব্ধিই মানব-জীবনে নিয়ে আসবে অফুরন্ত পুরস্কার এবং তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল হবে। কিন্তু মানবের শক্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কে ভুল ও অপূর্ণ জ্ঞানই নিয়ে আসবে মানব জীবনে চরম দুঃখ-কষ্ট, দুর্গতি এবং তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যকেও করবে ব্যর্থ। এটাই কলেমার আধ্যাত্মিক রূপ।

সাধনা ও গবেষণা শুরু করলো কি করে সৃষ্টি ও প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদকে পূজা না করে নিজের সুখ-শান্তির জন্য ব্যবহার করা চলে। কি করে আলো, হাওয়া, বাতাস, পানি, মাটি, গাছপালা, জীব-জন্তু, নদী-নালা, খাল-বিলকে নিজেদের কাজে লাগানো যায়। এই সাধনায় মানুষ প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনে লেগে গেল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় সে আত্মনিয়োগ করলো। স্থলে-জলে-অন্তরীক্ষে শুরু হলো মানুষের বিজয় অভিযান। প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ জয়ের এই প্রাণ মাতানো উন্মাদনায় মানুষ চাষ, ব্যবসা,

www.pathagar.com

কল-কারখানা, শিল্প, বাষ্পযান, আকাশযান, আণবিকশক্তি আরও কত কিছুর উদ্ভাবন ও আবিষ্কার করলো। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা শুরু হলো। এটাই হলো কলেমার বৈজ্ঞানিক রূপ।

গতকাল মানুষের প্রভু, দেবতা ও উপাস্য ছিলো হাজার হাজার। তাদের রুচি, তাদের চরিত্র, তাদের মর্জিও ছিলো হরেক রকম। এই বহুরূপী বহু প্রভুর মন তুষ্টি করতে গিয়ে মানুষের মনোরথ হয়ে পড়েছিল বিভ্রান্ত। তাদের জীবনে কোন সুনির্দিষ্ট আদর্শ গড়ে উঠতে পারেনি। আজ বহু প্রভুর স্থানে প্রতিষ্ঠিত হলো এক আল্লাহ্‌র প্রভুত্ব। মানুষের জীবনাদর্শ হয়ে গেল সুনির্দিষ্ট। তার নীতিশাস্ত্র হয়ে গেল এক। সমগ্র দুনিয়ার সমাজ সংস্কারক, রাষ্ট্রনায়ক এবং আইন প্রণয়নকারীরা সবাই সমবেতভাবে কোনো আদর্শ রাষ্ট্রের আদর্শ নাগরিক গড়ার জন্য উপায় বা নীতি উদ্ভাবন করুন, কিন্তু তাঁরা মানুষের মনে পুলিশ ও কড়া আইনের ভয়ভীতি ছাড়া অধিকতর শক্তিশালী অন্য কোন উপায় বা নীতি আজ পর্যন্ত উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়নি। পুলিশের ভীতি এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধা মানুষের মনে আদর্শ নাগরিক বা আদর্শ মানুষ হবার সমস্ত গুণাবলী জাগরুক করতে সক্ষম হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না। কারণ মানুষ কড়া আইন তৈরি করে এবং কর্মচারী নিযুক্ত বা নির্বাচিত করে তার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যও নানারূপ কলাকৌশল ও উপায় উদ্ভাবন করেছে। এরূপে আইন প্রণয়নকারিগণই আইনের চোখে ফাঁকি দেবার উপায় উদ্ভাবন করে এবং বাস্তব ক্ষেত্রে প্রতিদিন ফাঁকি দেয়। সমাজ ও জনমতের ভয় আইন বা পুলিশের ভয় হতে শক্তিশালী হলেও যথেষ্ট নয়। ইসলামের আল্লাহ্ ধারণাই মানুষের মনে আপনা হতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সব গুণসম্পন্ন এবং সহৃদয়বান সমাজ-সেবক এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শ ও প্রয়োজনীয় নাগরিক হবার উগ্র বাসনা জাগাবার মত উপায় উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছে। ইসলাম সেবাকে আল্লাহ্‌র উপাসনা বা ইবাদতের অপরিহার্য অংগ হিসাবে গ্রহণ করেছে। সমগ্র মানব জাতি আল্লাহ্‌র একমাত্র পরিবার। আমরা এমন এক পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহ্‌তা'আলার অপরিসীম প্রেম ও ভালবাসা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে যখন সমাজসেবা ও মানব-কল্যাণে আত্মনিয়োগ করি, তখন এবং একমাত্র তখনই কর্তব্য পালন আমাদের জীবন এবং প্রতি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে—সরকার, পুলিশবাহিনী, কঠোর আইন, সমাজ বা

নৈতিক রূপ

www.pathagar.com

জনমতের ভয় এবং পুরস্কার পাবার কোন লোভই আমাদের আদর্শ নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে না। কারণ আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস প্রতি কাজে, প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি আস্থায়, প্রতি ঘটনায়, এমন কি রাতের গভীর অন্ধকারে বদ্ধ কোঠায়ও মানুষকে অন্যায় কাজ এমনকি অন্যায় ও খারাপ চিন্তা থেকে রক্ষা করে। আল্লাহ্ মানুষের স্বকীয় নাড়ীর চেয়েও কাছে অবস্থিত। কাজেই কোন অবস্থায়ই সে অন্যায় ভাবনা ভাবতে পারে না। অন্যায় করা তো দূরের কথা। আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে সত্যিকার মুসলিম হলে সবাই আমাদের কাছে নিরাপদ থাকবে। একমাত্র তখনই সত্যিকার সুখী, সমাজতান্ত্রিক ও সমৃদ্ধিশালী আদর্শ সমাজ, রাষ্ট্র এবং মানবগোষ্ঠী গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এটাই হলো কলেমার নৈতিক রূপ।

গৃহ-দেবতা, গোষ্ঠী-দেবতা, গুরু বা পীররূপে মানুষের মন ও মগজে যেখানে যত প্রভু লাৎ ও মনাৎ আসর জমিয়ে বসেছিল, একদিনে লা-ইলাহার এক আয়াতে তাদের সকলের আসন হয়ে গেলো ধূলিসাৎ। আল্লাহ্ এবং তাঁর বান্দার মাঝে কোন মধ্যবর্তী রইলো না। ফলে মানুষের ভেতর প্রতিষ্ঠিত হলো সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সমানাধিকার। প্রতিটি মানুষ শুধু এই কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে এবং কাজেকর্মে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিফলিত করে, তবে সত্যিই দুনিয়ায় সাম্যের জয় হয়। কলেমার মূল শিক্ষা—মানুষের চেয়ে আল্লাহ্ বড়—অপর কেউ নয়—কোন মানুষ তো নয়ই। সুতরাং একটি মানুষের চেয়ে অপর মানুষ বড় হতে পারে না অথবা শ্রেষ্ঠত্বের দাবিও করতে পারে না। যদি কোন বিন্দু থেকে সমদূরবর্তী কতকগুলি সরলরেখা টানা যায় যাদের দূরত্ব প্রত্যেকটিরই বিন্দু হতে সমান, তাহলে সরল রেখাগুলিও পরস্পর সমান হবে। কেননা একটি রেখা অপরটির চেয়ে ছোট অথবা বড় হলে প্রত্যেক রেখা হতে বিন্দু সমান হবে না। এভাবে সামান্য একটু চিন্তা করলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে, প্রত্যেক মানুষই অপর মানুষের সমান—তার জ্ঞানবুদ্ধি, প্রতিভা, শক্তি সব কিছুতে কিন্তু বংশ পরিবার, সমাজ, পরিবেশ, শিক্ষা এবং সুযোগ-সুবিধাই এদের ভেতর তারতম্য বা বৈষম্য সৃষ্টি করে। পরিবেশ মানুষেরই সৃষ্ট। তেমনি মানুষে মানুষে ভেদাভেদ বা বৈষম্যও মানুষের গড়া এবং তার নিজ কর্মফল। মানুষ যে কাজ করে তার কর্মফল তাকে ভোগ করতেই হবে। ভাল খেলে, ভাল পরলে,সময়মত খাওয়া, গোছল, বিশ্রাম ও ঘুম পাড়লে অথবা অনিয়ম করলে, না খেয়ে থাকলে, অখাদ্য

সামাজিক রূপ

www.pathagar.com

খেলে তাঁর প্রতিক্রিয়া দেহের উপর হবেই। মানুষের বর্তমান অবস্থার জন্য মানুষই দায়ী। আরব দেশেও রেষারেষি, হিংসাদ্বেষ লেগেই ছিলো। সবল দুর্বলকে অত্যাচার করতো। শিক্ষিত মূর্খকে ঠকাতো। মানুষ মানুষকে ছোট বলে, নীচ বলে ঘৃণা করতো। আবার মানুষই মানুষকে বড় বলে ভয়, ভক্তি ও পূজা করতো। তাই তারস্বরে ঘোষণা হলো 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ্'—একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ বড় নয়। মানুষ ভাই ভাই সমান।

মানুষের ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে এই সাম্য বিশেষ করে আর্থিক সাম্য কি করে আনা সম্ভবপর। এনিয়ে হাজার হাজার পাতার হাজার হাজার বই দুনিয়ায় লেখা ও প্রকাশিত হয়েছে। হঠাৎ কয়েক লাইন লিখেই সে সব পাল্টানো যাবে না। ইসলামের আর্থিক সমাধান সম্পর্কে 'রব্বানিয়াৎ' নামক গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করবো। তবুও তার ভিত্তি কিসের উপর দাঁড়িয়ে আছে, এখানে সংক্ষেপে সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করবো। প্রথম কথা

আর্থিক রূপ

মানুষের মনের পরিবর্তন, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। প্রত্যেক মানুষ যদি মনেপ্রাণে কলেমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কাজেকর্মে প্রতিনিয়ত বাস্তবক্ষেত্রে তাকে অনুসরণ করে, তবে একে অপরের অকল্যাণকর কিছুই করতে পারে না। আবার একজন আর একজনের চেয়ে ছোটও হতে পারে না। প্রত্যেক মানুষ যখন ভাই ভাই সমান, তখন স্রষ্টার সৃষ্ট সম্পদের উপরে সবারই সমানাধিকার রয়েছে। বস্তুত দুনিয়ার সমস্ত ধন-সম্পদের স্রষ্টা এবং মালিক এক আল্লাহ্—'স্বর্গে মর্ত্যে যা-কিছু আছে সব আল্লাহ্র'। সুতরাং কোন কিছুর উপর ব্যক্তি বিশেষের অধিকার নেই। সে শুধু আল্লাহ্র প্রতিভূ হিসাবে দুনিয়ার উপর তার ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য এ ধন-সম্পদ সাময়িকভাবে ভোগদখল করতে পারে। প্রকৃতির ভেতর আমরা দেখতে পাই আলো, হাওয়া, পানির উপর সবার সমানাধিকার আছে। যার যতটা প্রয়োজন ততটাই প্রত্যেক মানুষ, জীবজন্তু, জানোয়ার ব্যবহার করতে পারে। হাতীর বেশি খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন সে তাই পায়। আবার পতঙ্গ সামান্যতম খাদ্য পেয়েই সুখী ও আনন্দিত থাকে। তেমনি মানুষও প্রয়োজনবোধে প্রত্যেকের দেহ, মন ও মস্তিষ্কের উন্নতি ও বিকাশের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ও প্রয়োগ করতে পারে। কিন্তু বাস্তব জীবনে আমরা আজ যে পরিস্থিতির সামনে এসে পড়েছি এ পরিস্থিতির ও আবেষ্টনীর পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত সমগ্র মানুষের মন, চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গি একরূপ হবে

www.pathagar.com

না। এজন্যই বর্তমান নাফ্সানি অর্থাৎ স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক ও ধনতান্ত্রিক শোষণমূলক পরিবেশকে ভেংগে চুরমার করে রব্বানী বা সত্যিকার মুসলিম পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে—যেখানে মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে আপনা হতেই এমনভাবে চলবে, এমন কাজ করবে, এমনভাবে ধন-সম্পদের ব্যবহার ও বিতরণ করবে যা তার নিজের এবং গোটা সৃষ্টির উন্নতি, প্রগতি, কল্যাণ, সুখ, শান্তি ও বিকাশকে সমভাবে এগিয়ে নেবে—দুনিয়ার উপর বেহেশত কায়েম হবে।

কলেমার রাজনৈতিক রূপ আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাবো মানুষ কোনো মানুষের সামনে মাথা নত করতে পারে না। মানুষের মনগড়া সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিয়মের সামনে মাথা নত করা কোন মুসলিমের পক্ষে জায়েজ নয়। একমাত্র আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র নিয়ম ও নীতি ছাড়া মানুষের কোনো কিছুর সামনে আমরা মাথা নত করতে পারি না। সুতরাং

রাজনৈতিক রূপ

মুসলিমের পক্ষে পরাধীন থাকা অসম্ভব। পরাধীন দেশ ও জাতি স্বাধীনভাবে স্বকীয় দেহ, মন ও মস্তিষ্কের বিকাশের জন্য আল্লাহ্র নিয়ম ও নীতিকে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে রূপায়িত করতে পারে না। তাই দারুল হরব বা বিরুদ্ধ পরিবেশের ভেতর যতদিন না সেখানে স্বাধীন ও সার্বভৌম সমাজ-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র কায়েম হবে, ততদিন প্রত্যেক মুসলমান নর ও নারীর পক্ষে জিহাদ বা সংগ্রাম করা অপরিহার্য কর্তব্য। আবার স্বাধীনতা বা সার্বভৌমত্ব কায়েম হবার পর কোন ব্যক্তি, দল বা শ্রেণী বিশেষের প্রাধান্য বা প্রভুত্ব কায়েম না হয়ে যাতে আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র নিয়মের সার্বভৌমত্ব কায়েম হয়, তার জন্য অবিরাম জিহাদ বা সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। জিহাদের অবস্থায় গাজী বা বিজয়ী এবং শহীদ বা মৃত্যু ছাড়া মুজাহিদের সামনে তৃতীয় কোন পথ খোলা নেই। কোন খলীফা বা রাষ্ট্রনায়ক, এমন কি নবী বা রসূলও আল্লাহ্র দেয়া মূল নিয়ম বা নীতির পরিবর্তন করতে সক্ষম ছিলেন না এবং ভবিষ্যতেও কেউ সক্ষম হবেন না। এসব মূল নিয়ম ও নীতির ব্যখ্যা ও প্রয়োগ জনসাধারণের সাথে পরামর্শ করে তাদের মতানুসারেই করতে হবে।

হযরত মুহম্মদ (সা)-এর ইন্তিকালের পর হতে খলীফাই রাষ্ট্রের সর্বপ্রথম খাদেম ছিলেন। কিন্তু খলীফাও আইন প্রণয়নের মূল উৎস ছিলেন না। তাঁর কোন সার্বভৌম ক্ষমতা ছিলো না। জনগণের হাতেই সমস্ত সার্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত ছিলো। খলীফা স্বয়ং কোন আইন প্রণয়ন করতে পারতেন না। তিনি

www.pathagar.com

জনগণের সাথে আলাপ-আলোচনা করে মূল আইনের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করতে পারতেন এবং যাতে আইন কার্যকরী হয় তার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন। কোনো নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হলে তিনি জনসাধারণের সাথে আলোচনা করেই তা করতেন। খলীফা এবং অন্যান্য প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজের জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য ছিলেন। কারো কোনো বিশেষ অধিকার বা সুবিধার ব্যবস্থা ছিলো না। জনগণের হাতে সরকার বা শাসনভার ন্যস্ত ছিল। সরকার জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্য ছিলো। অধিক সংখ্যক লোকের জন্য না থেকে সরকার সকলের জন্য, সমগ্র জাতির জন্য কাজ করতো। সংখ্যাগুরু কখনও সংখ্যালঘুর উপর অত্যাচার করতে পারতো না এবং আইন কখনও সংখ্যাগুরুর ইচ্ছামত তাদের সুবিধার জন্য তৈরি হতো না। সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘুর মতামত বিচার করে কোনো মৌলিক আইন-কানুন তৈরি হতো না এবং আজও হতে পারে না। সাধারণ এবং মৌলিক নিয়ম ও নীতিসমূহের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণের ব্যাপারেও খলীফা বা রাষ্ট্রনায়কের সর্বময় ক্ষমতা ছিলো না এবং এখনও নেই। একবার হযরত উমর (রা) দেনমহর নির্দিষ্ট পরিমাণের উপর হতে পারবে না বলে ঘোষণা করতেই—একজন বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে বললেন, কুরআনে দেনমহরের কোন সীমা নির্দেশ নেই। খলীফা নিজের দোষ স্বীকার করলেন এবং বৃদ্ধার ব্যাখ্যাই বহাল রইল। সংক্ষেপে বলতে গেলে এটাই কলেমার রাজনৈতিকরূপ। পূর্ণ ব্যক্তি ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং সার্বভৌম শাসন ক্ষমতা ছাড়া কলেমার উপর পূর্ণ ঈমান আনা চলে না।

বাদশার বাদশাহী ধসে পড়লো, কারণ আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ রাজা নেই। দেবতার দেবত্বের খোলস খসে পড়লো, কারণ আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ উপাস্য নেই। গুরুত্ব বুজরুগী উঠে গেল; কারণ আল্লাহ্র দরবারে কোন উকিলের প্রয়োজন নেই, আল্লাহ্ ছাড়া আর বাদশাহ নেই, আল্লাহ্র আইন ছাড়া আর কোন আইন নেই, কোন মানুষের বা কোন গোষ্ঠীর বা কোন জাতির কোন বিশেষ অধিকার নেই, মানুষে মানুষে, বর্ণে বর্ণে, জাতিতে জাতিতে কোন ভেদাভেদ নেই, আল্লাহ্র কাছে সবাই সমান। মানুষের উপর প্রভুত্ব করার অধিকার এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নেই। দেবতার কাছে, প্রকৃতির কাছে, স্বয়ং মানুষের কাছে এই যে মর্যাদা-বোধ বেড়ে গেলো, এটাই আসল মানুষের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা বড় বিপ্লব। একদিনে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি উলট-পালট হয়ে

www.pathagar.com

গেলো, মানুষ আত্মমর্যাদার অধিকারী হলো। সৃষ্টি, তার রহস্য ও তার অভিব্যক্তি সম্বন্ধে মানুষের এ নবচেতনা সার্চ লাইটের উজ্জ্বলতায় মানুষের গতিপথ আলোকিত করতে চললো। মাত্র চারটি শব্দের এই কলেমা এমনি করে দুনিয়ার ইতিহাসে এক ভূমিকম্প সৃষ্টি করলো। মাত্র তেইশটি বছরে অধঃপতিত আরব জাতিকে এবং তাদের মারফতে গোটা দুনিয়াকে ধর্মে, রাষ্ট্রে, সমাজে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে এক নতুন জাতিতে পরিণত করলো।*

---

* জনাব আবুল হাশিম লিখিত 'কলেমার বৈপ্লবিক রূপ' নামক গ্রন্থে এবং সাপ্তাহিক মিল্লাতের প্রথম অধ্যায় 'কলেমা' শীর্ষক প্রবন্ধ অবলম্বনে লেখা।

www.pathagar.com

মানুষের কর্তব্য

ইসলাম প্রত্যেক মানুষকে দু'টি কর্তব্য পালন করতে শিক্ষা দেয় ঃ

(১) হক্কুল্লাহ্—আল্লাহ্র প্রতি কর্তব্য ।

(২) হক্কুল-এবাদ—মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্ট জীবের প্রতি কর্তব্য ।

এ দু'টি কর্তব্যই পাশাপাশি পালন করতে বলা হয়েছে । কুরআনে বহুবার উল্লেখ আছে 'সালাত কায়েম কর এবং যাকাত দাও ।' বস্তুত কুরআনে যতবার সালাত কায়েম করতে বলা হয়েছে ততবারই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যাকাত দেবার বা মাল দান করার জন্য তাগিদ দেয়া হয়েছে । আল্লাহ্তে বিশ্বাস দ্বারা প্রত্যেক মানুষ স্রষ্টা ও সৃষ্টিব প্রতি কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ হয় । তাই কুরআনে বার বার জীবের কর্তব্যকে মানুষের জন্য অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করতে বলা হয়েছে । আল্লাহ্র প্রতি কর্তব্য পালনের ভেতরই জীবের প্রতি, মানুষের প্রতি কর্তব্যের কথা রয়েছে । যদি কেউ সমাজ, মানব বা জীবের প্রতি কর্তব্যে অবহেলা করে তাহলে সে আল্লাহ্র প্রতি কর্তব্যেই অবহেলা করলেন । তাই কুরআনে সরাসরি এবং সোজাসুজি সাবধান করা হয়েছে ঃ 'তুমি পশ্চিম মুখো হয়েই পড়, অথবা পুব মুখো হয়েই নামায পড় তাতে ভাল-মন্দ নিহিত নেই ।' আরও বলা হয়েছে ঃ 'ভাল নিহিত আছে আল্লাহ্র উপর, রোজ কিয়াতমের উপর, ফেরেশতাদের উপর, কিতাব ও নবীদের উপর বিশ্বাস স্থাপনে ।' কিন্তু নিছক বিশ্বাসই যথেষ্ট নয় । আল্লাহ্র উপর ও নবীদের উপর বিশ্বাস করাতেও কোন সার্থকতা নেই । আল্লাহ্ স্বয়ংসিদ্ধ, স্বয়ং সম্পন্ন এবং স্বয়ং সন্তুষ্ট । কোন মানুষ তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন না করলে তাঁর কিছু আসে যায় না । আমলবিহীন নিছক বিশ্বাসে মানুষেরও কিছু লাভ হয় না । সৃষ্টি রহস্যের প্রথম কারণ আছে কি নেই, এই বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে অথবা আপনা হতেই ক্রমবিকশিত হয়েছে—এ সমস্ত প্রশ্নের দর্শনশাস্ত্র সম্পকীয় আলোচনা বা গবেষণা মানুষের বাস্তব জীবনে খুব বেশি কার্যকরী নয় । সত্যি কথা বলতে কি, শুধু মন্ত্র বা আয়াত পাঠ করাতে অথবা প্রার্থনা বা সালাত আদায়ে এবং মসজিদ বা ইবাদত গৃহে যাওয়াতেই এ কথা

www.pathagar.com

প্রমাণ হবে না যে, আমরা খুব মহানুভব ব্যক্তি । ইসলামের সারবাণী ও মূল কথা হলো সত্য ও ন্যায় পথে চলা এবং ভাল কাজ করা এবং সমস্ত জীবের সমষ্টিগত কল্যাণ সাধন করা । ঐ একই সূরায় আরও ঘোষণা করা হয়েছে ঃ 'তোমার নিকট-আত্মীয়-স্বজনকে মহব্বতের সাথে মালদার করো । পাড়া প্রতিবেশী, অনাথ, মিসকিন, অভাবগ্রস্ত, পথিক, ভিক্ষুক এবং যুদ্ধবন্দীকে সাহায্য দান করো এবং সালাত কায়েম করো ও যাকাত দাও ; প্রতিজ্ঞা করে প্রতিজ্ঞা রাখো এবং চরম বিপদ, অভাব, যুদ্ধ ও সংগ্রামের সময় যারা ধৈর্যশীল, তারাই সত্যবাদী এবং তারাই মুত্তাকিন ।' পবিত্র কুরআনে এ ধরনের আরও অনেক আয়াত আছে ঃ 'মাতাপিতার প্রতি সদয় হও এবং ভাল ব্যবহার করো আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি এবং মিসকিনদের প্রতি এবং পাড়া প্রতিবেশীদের ভেতর যিনি তোমার আত্মীয় এবং শিক্ষিত প্রতিবেশীকে এবং সফরের বন্ধুকে এবং পথিককে এবং তোমার দক্ষিণ হাতের অধীনদের (বেকার অথবা তোমার অধীন দাসদাসী বা কর্মী) সাহায্য দান করো ।'

সেবার কি মহান ব্রতের কথা উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহ এবং কুরআনে আরও বিভিন্ন আয়াতে বলা হহয়েছে। কি মহান এবং মহত চরিত্রের অধিকারী হলেই না সত্যিকার মুত্তাকিন বলা চলে ! বস্তুত মুত্তাকিন অর্থ সাবধানী—যিনি ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ হতে খুব সাবধানে প্রতিনিয়ত, প্রতি মুহূর্তে, প্রতি ক্ষেত্রে জীবন পরিচালিত করেন, ভুলক্রমেও কখনও অন্যায় বা খারাপ কাজ করেন না । শুধু লোক দেখানো ইবাদত করলেই হবে না ।

'আলা হব্বেহি' এই আয়াত দ্বারা সমাজ-সেবাকে একেশ্বরবাদের উপর ভিত্তি করা হয়েছে । এটা দুস্থ মানবতার প্রতি আমাদের নিঃস্বার্থ সমাজ-সেবাকে অনেক উর্ধ্বে স্থান দিয়েছে । পরের সেবা করতে হবে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে । কোনরূপ স্বার্থ বা লোভের বশবর্তী হয়ে এমন কি জান্নাতের আশায় সেবা করাও ইসলামে জায়েজ নয় । এক কথায় কোন প্রকার লাভ বা ফলের প্রত্যাশা না করে নিছক স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি কর্তব্য পালন হিসাবেই সেবা ও কাজ করে যেতে হবে—কোনরূপ ফলের প্রত্যাশা করা চলবে না ।

কুরআনে বার বার প্রশ্ন করা হয়েছে তৌহিদে বিশ্বাস স্থাপন করাতে মানব-জীবনে এমন কি ক্ষতি সাধন হতে পারে ? যাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন সমগ্র মানবতার প্রতি আমাদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত, উপকারী এবং সমাজ

www.pathagar.com

কল্যাণকর কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং বিস্ময়কর মনের বল, শক্তি, সাহস ও বদান্যতা শিক্ষা দিয়ে মানুষকে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রের সবচেয়ে আদর্শ নাগরিক এবং আন্তর্জাতিক বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের সবচেয়ে প্রগতিশীল মানবদরদী এবং প্রয়োজনীয় সদস্য হিসাবে গড়ে তোলে। বস্তুত কুরআনে বর্ণিত একত্ববাদে পূর্ণ বিশ্বাস এবং আল্লাহ্‌র উপায় ও পদ্ধতি ব্যতিরেকে সমাজসেবা এবং মানবকল্যাণের সমস্ত প্রচেষ্টাই শেষ পর্যন্ত এর আসল উদ্দেশ্য সমগ্র সৃষ্টির পালন, পোষণ ও প্রগতি হাসিল করতে ব্যর্থ হবে।

কুরআনে আরও বলা হয়েছে যে, সমাজ, মানব বা জীবের প্রতি কর্তব্যে অবহেলা করলে আল্লাহ্ নিজে তা ক্ষমা করবেন না। যার বা যাদের প্রতি কর্তব্য ছিলো তিনি বা তারা যতক্ষণ ক্ষমা না করবেন, ততক্ষণ আর কেউ এমনকি স্বয়ং আল্লাহ্‌তা'আলাও তাকে জীবের প্রতি কর্তব্যে অবহেলা করার দরুন রেহাই দেবেন না। এতে সুস্পষ্ট বোঝা যায়, ইসলামে মানুষ ও জীবের প্রতি কর্তব্য পালনে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ইবাদতের ভেতরেও মানুষ ও জীবের প্রতি কর্তব্য এবং সৃষ্টির পালন ও পোষণের কাজকে সুষ্ঠু ও সুন্দররূপে পালনে সহায়তা কামনারই নির্দেশ রয়েছে। আমাদের সৃজনের উদ্দেশ্যই হলো সমগ্র সৃষ্টিকে সুখ, শান্তি, কল্যাণ, প্রগতি ও পূর্ণতা-প্রাপ্তির দিকে এগিয়ে নেয়া, একথা বহুবার বলা হয়েছে। ইসলামের বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা মানুষকে আপনা হতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমাজ, রাষ্ট্র, মানবতা বিশ্ব এবং সৃষ্টির সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য আত্মনিয়োগ করার নির্দেশ দেয়। এর জন্য কোন আইন-কানুন বা শাসনের প্রয়োজন হয় না।

ইসলামের আর একটি চরম বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা অন্যান্য ধর্মের ন্যায় আচার, রীতি-নীতি, চাল-চলন এবং তার বাইরের খোলসের প্রতি বিশেষ জোর দেয় না। কলেমার রূপ আমরা আলোচনা করেছি। সালাত, যাকাত, রোযা ও হজ প্রভৃতি ইসলামের অপর চারটি মূল স্তম্ভের ভেতর আমরা এই একই রূপ দেখতে পাবো। বস্তুত ইসলাম প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আল্লাহ্‌র প্রতি এবং মানুষ ও অন্যান্য জীবের প্রতি কর্তব্য পালন করার জন্য মানুষকে নির্দেশ দিয়েছে। সালাত, যাকাত, রোযা ও হজ প্রভৃতি ইসলামের প্রত্যেকটি স্তম্ভের আধ্যাত্মিক দিক ছাড়া বিশেষ রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক রয়েছে। এর প্রত্যেকটির ভেতর নিয়ে ইসলামী সমাজ বিধানের অভিনব রাজনৈতিক এবং সমাজতান্ত্রিক রূপ ফুটে উঠেছে।

www.pathagar.com

সালাত কায়েম

সালাত কায়েম করা প্রত্যেক মুসলিমের প্রথম, প্রধান এবং অপরিহার্য কর্তব্য। যদিও সালাত ও যাকাত একই সাথে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে সালাতের সাথে যাকাতের কথা সরাসরি উল্লেখ না থাকলেও পরোক্ষভাবে মালদান এবং দুস্থ মানবতাকে সাহায্য দান করতে বলা হয়েছে, তবুও সালাতের কথা সব ক্ষেত্রেই আগে বলা হয়েছে। কুরআনে সালাত কায়েম করার তাগিদ সবচেয়ে বেশি রয়েছে। রসূলে করীম (সা)-এর উপর সালাত কায়েম করার নির্দেশই সর্বপ্রথম হয়েছিলো। বস্তুত আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইসলামী মনোভাব গড়ে তোলার জন্য সালাতই প্রথম এবং প্রধান সিঁড়ি। সালাত মানুষকে কুপ্রবৃত্তি এবং খারাপ কাজ হতে দূরে রাখে এবং ধীরে ধীরে স্বকীয় দেহ-মন ও মস্তিষ্কের উন্নতি, প্রগতি ও ক্রমবিকাশ করে এবং পূর্ণতা-প্রাপ্তির দিকে এগিয়ে নেয়। সালাত মানুষকে নিজের ভেতর আল্লাহ্‌র অনুভূতি এনে দেয় এবং এ অনুভূতি শুধু তাকে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে মানব সেবায় ব্রতী করে না, তাকে নির্ভীক করে ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে পূর্ণতা-প্রাপ্তির পথে এগিয়ে নেয়। সালাত জাতি, বর্ণ ও পদমর্যাদাজনিত সমস্ত ভেদ-বৈষম্য ও পার্থক্যের অবসান করে মানুষের ভেতর সত্যিকার সাম্য ও ঐক্য স্থাপন করে এবং মানুষকে চিরন্তন সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও প্রগতির দিকে নিয়ে যায়।

কুরআনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আয়াতগুলির উল্লেখ করলেই আমরা সালাতের সত্যিকার অর্থ ও তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হবো। সেখানে চরম আত্ম-প্রকাশ লাভ করতে হলে প্রত্যেক মুসলিমকে কতকগুলি মূলনীতিতে বিশ্বাস স্থাপন এবং কতকগুলি কর্তব্য পালন করার নির্দেশ রয়েছে ঃ "এই কিতাব, যার ভেতর সন্দেহ করার কিছু নেই, যারা অন্যায় কাজ থেকে সাবধান ও দূরে থাকে, যারা অদেখায় বিশ্বাসী এবং যারা সালাত কায়েম করে এবং আমাদের দেওয়া ধনসম্পদ হতে (অপরের জন্য) ব্যয় করে এবং যারা তোমার উপর যা নাজিল করা হয়েছে এবং তোমার আগে যা নাজিল করা হয়েছে তার

www.pathagar.com

উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আখিরাত সম্পর্কে যারা সুনিশ্চিত, তারাই তাদের স্রষ্টার সঠিক পথে পরিচালিত এবং, তারাই মুফলেহুন অর্থাৎ তারাই আত্মবিকাশ লাভ করতে সক্ষম হবে।" মুফলেহুন হলো 'মুফ্‌লিহ্' শব্দের বহুবচন। ফালাহ্ শব্দ হতেই মুফলেহুন শব্দের উৎপত্তি। ফালাহ্ শব্দের অর্থ হলো—কৃতকার্যতা এবং আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ে চরম সিদ্ধিলাভ। ফালাহ্ আবার দু'রকমের হতে পারে ঃ এক অর্থ বর্তমান জীবন সম্পর্কে এবং অপর অর্থ পর-জীবন সম্পর্কে। প্রথম অর্থে ফালাহ্ মানুষের বর্তমান জীবনে কৃতকার্য, সুখী ও সমৃদ্ধিশালী হবার এবং ভাল কাজ করার মতো গুণাবলী এবং ধন-সম্পদ ও মান-মর্যাদা অর্জন করা ঃ বাকা-স্থায়ী, ঘিনা-অভাবমুক্ত ধনসম্পদ এবং ইজ্জৎ-মর্যাদার অধিকারী হওয়া। রাঘিবের মতে পর-জীবন সম্পর্কে ফালাহ্ চার অর্থে ব্যবহৃত হয় ঃ মৃত্যুহীন জীবন, অভাবমুক্ত ধন-সম্পদ, অপমানবিহীন মর্যাদা এবং অজ্ঞতাবর্জিত পূর্ণ ও পরিপক্ক জ্ঞান। ইহজীবন বা পরজীবন সম্পর্কে ফালাহ্ অর্থ হলো আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং বাস্তব জীবনে মানুষের মনের বল, ধীশক্তি এবং প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ। এক কথায় ফালাহ্ অর্থ হলো মানবের চরম আত্মবিকাশ। পবিত্র কুরআনের নির্দেশ মোতাবেক আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, তাঁর প্রেরিত প্রত্যাদেশ এবং পরকালে বিশ্বাস স্থাপন এবং সালাত কায়েম এবং স্বকীয় ধন-সম্পদ মানবের সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য বিতরণ করার ভেতর দিয়েই মানবের চরম আত্মবিকাশ সম্ভবপর। সালাত কায়েম যে মানুষের ইহ ও পর উভয় জীবনে আত্মবিকাশ, তার প্রকৃত প্রমাণ হলো আযানের ভেতর সালাতে যোগদানের আহ্বানের সাথে সাথেই ফালাহ্ বা সাফল্যের দিকে আসার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

সালাতের মারফত নিজের ভেতর আল্লাহ্‌র অনুভূতি আসে একথা আগেই বলেছি। অদেখাতে বিশ্বাস করার পরে সালাত কায়েম করতে বলা হয়েছে। তার অর্থ আল্লাহ্‌কে স্থূলদৃষ্টি দ্বারা দেখা যায় না, তবে ইবাদতের মারফত তাঁকে অন্তরে উপলব্ধি করা যায় এবং এ উপলব্ধির উল্লেখ প্রসংগেই কুরআনে বলা হয়েছে ঃ 'এবং ধৈর্য ও ইবাদতের মারফত সাহায্য প্রার্থনা করা এবং মুত্তাকিন ছাড়া অপরের পক্ষে এর উপলব্ধি হওয়া খুবই কঠিন এবং একমাত্র মুত্তাকিনরাই জানেন যে, তাঁরা তাঁদের স্রষ্টাকে দেখতে পাবেন এবং তাঁর কাছেই ফিরে যাবেন' (হঃ ৪৫, ৪৬)। ধন-সম্পদ দান বস্তুত প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বাসের স্বাভাবিক পরিণতি এবং এটা একথাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ

www.pathagar.com

করে যে, মানুষের অন্তরে আল্লাহ্‌র অনুভূতিই মানুষের সমষ্টিগত কল্যাণের কাজে ও সেবায় তাকে আত্মনিয়োগ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে । কুরআনের অপর একটি আয়াত দ্বারা একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইবাদত-এ-এলাহী খেদমত- এ-খালিকের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে না তুললে ইবাদত-বন্দেগীর কোন অর্থ হয় না । 'সুতরাং সে সব মুত্তাকিন অভিশপ্ত, যাঁরা তাঁদের সালাতের প্রতি অমনোযোগী এবং যাঁরা লোক-দেখানো ভাল কাজ করেন এবং যাকাত দানে বিরত থাকেন' (১০৭ ঃ ৪-৭)।

মানুষের সাধারণ এবং সার্বজনীন অভিজ্ঞতা কুরআনে বর্ণিত সত্যকেই প্রমাণ করে । আজকাল যদিও অধিকাংশ লোক আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাসকে অবাস্তব, কল্পনাপ্রসূত এবং অনুমানজনক বলে মনে করে, তবুও যুগে যুগে বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন জাতির ভেতর বিভিন্ন মহাপুরুষগণ প্রার্থনা, ধ্যান ও সাধনার মারফত আল্লাহ্‌কে তাঁদের অন্তরে উপলব্ধি করেছেন এবং এ উপলব্ধি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই তাঁরা বিশ্ব মানবের সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য আত্মোৎসর্গ করেছেন । তাঁদের কাছে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস এক বিরাট এবং বিপুল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির উৎস হিসাবে পরিগণিত হয়ে শুধু তাঁদের জীবনেই যে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে তা নয়, বহু শতাব্দীর জন্য সমগ্র জাতির জীবনে পরিবর্তন এনে দিয়েছে এবং বিভিন্ন জাতি ও দেশের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে চরম বিপ্লব সাধন করেছে । তাঁদের নিঃস্বার্থপরতা এবং সত্যবাদিতার তুলনা হয় না । তাঁদের জীবনের কঠোর সাধনা ও অগ্নি-পরীক্ষাই সব যুগের, সব দেশে, সব জাতির কঠোর সাধনা ও অগ্নি-পরীক্ষা এবং এটা একথাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব একবার যদি অন্তরে অনুভূত হয় তাহলে নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও মানসিক শক্তি এতই বৃদ্ধি পায় যে, এর তুলনায় সবচেয়ে শক্তিশালী বৈষয়িক শক্তিও তুচ্ছ এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বলতর বলে মনে হয় । তাঁদের আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানসিক শক্তি আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠতম আবিষ্কার আণবিক শক্তির চেয়েও শক্তিশালী । এসব বিরাট ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মহামানব সর্বসাধারণের জন্য যুগে যুগে আলোর দীপ্তবর্তিকা বহন করে আনেন এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র উপলব্ধি লাভ করে স্বকীয় আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেন ।

www.pathagar.com

চরম পরিতাপের বিষয় এই যে, একদিকে যেমন আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে অবাস্তব, কল্পনা-প্রসূত এবং অনুমানজনক মনে করা এবং ঠিক তেমনই অপর দিকে আগের দিনে মহামানবগণের জীবনে যা সম্ভব হয়েছে আজ আর তা সম্ভব নয় বলে বিশ্বাসই নিয়ে এসেছে মানুষের জীবনে চরম অধঃপতন । কোন মানুষ চেষ্টা ও সাধনা দ্বারা যা আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছে তা অপরের পক্ষেও নেহায়েত স্বাভাবিকভাবেই সম্ভবপর এবং অতীতকালে মহামানবগণের পক্ষে যা সম্ভব হয়েছিলো যুগে যুগে চেষ্টা ও সাধনা করলে প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই সে সব জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, ধীশক্তি, প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব এবং প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করা সম্ভবপর । এ বিশ্বাস নিয়ে প্রতি মানুষ যদি আল্লাহ্‌র সত্যিকার উপাসনা মারফত তাঁকে তাদের অন্তরে উপলব্ধি করতে পারে এবং আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত হয়ে অতুলনীয় আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মনের বলের অধিকারী হয়ে জ্ঞান, বিবেক, বিচার-বুদ্ধি, ধীশক্তি, প্রাণ-শক্তি, জীবন-শক্তি, মেধা, প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশ সাধন করে তাহলে ইহজীবনেও তাদের পূর্ণতম আত্মবিকাশ হবে—ধরার বুকে আদর্শ মানবগোষ্ঠী গড়ে উঠবে ।

আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানসিক উন্নতির আশা-আকাঙ্ক্ষা মানুষের অন্তরে বৈষয়িক উন্নতির চেয়েও প্রবলতর । চরম আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানসিক বিকাশলাভ সমস্ত শক্তি, পবিত্রতা ও নৈতিকতার চিরন্তন উৎস স্রষ্টার অনুভূতি স্বকীয় অন্তরে গভীর ও নিবিড়ভাবে অনুভব করার ভেতর দিয়েই হতে পারে । পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ 'সব পূর্ণতম গুণ আল্লাহ্‌র' ৭ ঃ ১৮০ । মানুষেরও প্রয়োজন এসব পূর্ণ ও পরিপক্ক গুণ ও জ্ঞানের । কারণ দিন দিন উন্নতি, প্রগতি ও পূর্ণতা-প্রাপ্তির দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তিই মানুষের অন্তরের সহজাত ও স্বাভাবিক আকাংক্ষা ও প্রবৃত্তি । কাজেই সম্পূর্ণ দোষ-ত্রুটিমুক্ত সমস্ত পূর্ণ ও পরিপক্ক গুণ ও জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভ ব্যতিরেকে তা আয়ত্ত করা সম্ভবপর নয় । ইবাদত-এ-এলাহী আল্লাহ্‌র নৈকট্য বা সান্নিধ্য লাভেরই প্রচেষ্টা মাত্র । সুতরাং আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত হবার উপায় ও পদ্ধতি হলো দুনিয়ার সংকীর্ণ ও পংকিল আবর্ত থেকে কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে টেনে নিয়ে ইবাদতের মারফত সমস্ত শক্তি, প্রেরণা, উৎসাহ, গুণ ও জ্ঞানের চিরন্তন উৎসের নৈকট্য বা সান্নিধ্য লাভ করত আত্ম-শক্তির চরমতম উন্মেষ ও বিকাশ সাধন এবং তদ্দ্বারা দুনিয়ার সংকীর্ণ ও পংকিল আবর্তের ভেতরে থেকেও নিজেকে সরল,

www.pathagar.com

সহজ, ন্যায় ও সত্যপথে পরিচালিত করার দৃঢ় পণ ও প্রতিজ্ঞা নিয়ে আবার কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া।

হাদীসে ইবাদতকে মুনাজাত বা আল্লাহ্‌র সাথে গোপন আলাপ বলে অভিহিত করা হয়েছে। (বুখারী ৮ ঃ ৩৯; ৯ ঃ ৮; ২১ ঃ ১২)। অপর একটি হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ 'মানুষ আল্লাহ্‌কে দেখে এরূপ ভেবে তাঁর উপাসনা করতে হবে' (বুখারী ২ ঃ ৩৯)। আল্লাহ্‌র ইবাদত সম্পর্কে এসব বর্ণনা একথাই প্রমাণ করে যে, ইবাদতের প্রকৃত রূপই হলো আল্লাহ্‌র সাথে গোপনে কথাবার্তা বলা বা সম্পর্ক স্থাপন করা। আর আল্লাহ্‌র সাথে কথাবার্তা বলা বা সম্পর্ক স্থাপন করার সত্যিকার অর্থ ও তাৎপর্য তাঁর গুণে গুণান্বিত ও অনুপ্রাণিত হবার জন্য গভীর মনোনিবেশসহ যথাসাধ্য চেষ্টা ও কঠোর সাধনা করা।

অন্তরের কু-প্রবৃত্তিকে দমন এবং স্বকীয় রিপুকে সংযত, নিয়ন্ত্রিত ও মার্জিত করার উপরই নির্ভর করে মানুষের জ্ঞান, বিবেক, বিচার-বুদ্ধি, ধীশক্তি ও প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ। 'যিনি এটাকে (অন্তরকে) পবিত্র করেন; তিনি অবশ্যই কৃতকার্য হবেন' (৯১ ঃ ৯)। আল্লাহ্‌র ইবাদতকে আত্মা পবিত্রকরণের উপায়রূপে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ 'যদি তোমার নিকট যা নাজিল হয়েছে কিতাব হতে তাই আবৃত্তি করো এবং সালাত কায়েম করো; সালাত অবশ্যই পাপ ও অশ্লীলতা হতে মানুষকে দূরে রাখে' (২৯ ঃ ৪৫)। দিনের দু'বেলায় এবং রাতের প্রথম দিকে সালাত কায়েম করার নির্দেশ দিয়ে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ 'নিশ্চয় ভাল (সওয়াব বা নেকির) কাজ, মন্দ বা খারাপ কাজ হতে বিরত রাখে' (১১ ঃ ১৪)। হাদীসে আল্লাহ্‌র ইবাদতকে নদীতে গোছল করার সাথে তুলনা করা হয়েছে ঃ 'যদি কারো বাড়ির পাশে নদী থাকে এবং সে দিনে পাঁচবার সেই পানিতে গোছল করে, তোমরা কি মনে কর যে তারপরও তার দেহে কোন ময়লা থাকবে ? (বুখারী ৯ ঃ ৬)। এটা দ্বারা রসূলে করীম (সা) এ কথাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, দিনে পাঁচবার আল্লাহ্‌র ইবাদত-এর মারফত আল্লাহ্‌র গুণে নিজেকে ধৌত করলে মানুষের ভেতর-বাইরে আর কোন কু-প্রবৃত্তি থাকতে পারে না, মানুষ কোনরূপ খারাপ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হতে পারে না। প্রতিনিয়ত আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে আল্লাহ্‌র অতুলনীয় গুণাবলী সে স্বকীয় জীবনে রূপায়িত করার চেষ্টা করবে। প্রতি কাজ, কথা, আচার-ব্যবহার, চলাফেরা, উঠা-বসা এক কথায় সব কিছুই সে করবে

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে । সব কিছুর ভেতরই তখন সে উপলব্ধি করবে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, সব কিছুই তাঁর কাছে মনে হবে আল্লাহ্‌র কুদরত, সব কিছুর ভেতরই সে দেখতে পাবে আল্লাহ্‌র চিরন্তন ও অফুরন্ত শক্তির বিকাশ ও প্রকাশ। বহু হাদীসে সালাতকে কাফ্‌ফারা বা মানুষের কুপ্রবৃত্তিকে দমন করার উপায় বলে বর্ণনা করা হয়েছে (২০ ঃ ৬৪)। অন্যত্র আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা সালাত কায়েমের উদ্দেশ্য এবং আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা আবার অন্যায়, খারাপ কাজ ও পাপ চিন্তা হতে বিরত থাকার সবচেয়ে শক্তিশালী উপায় বলে বর্ণনা করা হয়েছে । একটু ধীরস্থিরভাবে চিন্তা করলে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে, প্রত্যেক নিয়ম বা আইনের পেছনেই কোন না কোন অনুমোদনের প্রয়োজন হয় এবং যে সমস্ত ঐশ্বরিক নিয়ম বা আইন মানুষের আধ্যাত্মিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি এবং নৈতিক চরিত্র গঠনে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় তার পেছনে একমাত্র অনুমোদন হলো এসব মৌলিক নিয়ম বা আইনের স্রষ্টার অস্তিত্ব ও একত্বে বিশ্বাস স্থাপন । কাজেই মানুষ যতই দুনিয়ার আকর্ষণ ও প্রলোভন হতে নিজেকে মুক্ত করে, যতই সে আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল হয় এবং যতই সে আল্লাহ্‌র উপস্থিতি এবং অনুভূতিকে বাস্তব সত্য বলে অনুভব করে ততই আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের উপর তার বিশ্বাস দৃঢ়তর হয় এবং সে সব নিয়ম বা আইন বিরোধী না হওয়ার ইচ্ছা ও আকাংক্ষা দৃঢ়তর হয় । এভাবে আল্লাহ্‌র উপাসনা মানুষের কু-প্রবৃত্তিগুলিকে দমন করে তার আত্মাকে সমস্ত কু-প্রবৃত্তি ও পাপচিন্তা হতে মুক্ত ও পবিত্র করে এবং তাকে তার ভেতরের সুপ্ত ও লুক্কায়িত জ্ঞান, বিবেক, বিচার-বুদ্ধি, ধীশক্তি ও প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের পথে পরিচালিত করে ।

সালাত ব্যক্তিগতভাবে এবং জামাতে উভয়বিধ উপায়ে কায়েম করা চলে । বস্তুত ফরজ বা অবশ্য পালনীয় সালাত সমবেতভাবে মসজিদে আদায় করাই অধিকতর বাঞ্ছনীয় । ব্যক্তিগত সালাত মানুষের ভেতরের সুপ্ত ও লুক্কায়িত শক্তি, কর্মক্ষমতা ও প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের জন্য । সামাজিক বা জামাতে সালাত কায়েম আত্ম-বিকাশের সাথে সাথে সমগ্র মানবজাতিকে তার সমষ্টিগত উন্নতি, প্রগতি, বিকাশ ও কল্যাণ সাধনের দিকে এগিয়ে নেয় । একই মহল্লা, গ্রাম বা শহরে অবস্থিত সবাই দিনে পাঁচবার জামাতে সমবেত হলে সবার ভেতর আন্তরিকতা, প্রীতি ও সৌহার্দ্য গড়ে উঠবে । দৈনিক জামাতে এটা খুবই অল্প জায়গার ভেতর সীমাবদ্ধ থাকে । প্রতি শুক্রবার এই জামাত আরও

www.pathagar.com

বড় হয় । বছরে দু'দিন ঈদের জামাত আরও বড় হয় । তারপর সমগ্র দুনিয়ার মানুষের আন্তর্জাতিক মহাসভা হলো হজ ।

ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-মূর্খ, আশরাফ-আতরাফ, সবল-দুর্বল, রাজা-প্রজা, ফকির-মিসকিন সবাই নিজ নিজ বেশে জামাতে পাশাপাশি দাঁড়ায় । রাজা পেছনের লাইনে আল্লাহ্‌র প্রতি সিজদায় রত অবস্থায় সামনের প্রজা, মজদুর অথবা ভিক্ষুকের পায়ের উপর মাথা রাখতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেন না । দুনিয়ায় মানুষে মানুষে ভেদ-বৈষম্য দূর করে সাম্য স্থাপনের এর চেয়ে বড় নজির আর কোথায় আছে ? ধন-সম্পদ, পদমর্যাদা, বংশ, বর্ণ ও শ্রেণীভেদের সব বৈষম্য মুহূর্তে বিলীন হয়ে গিয়ে এমন এক প্রেম, ভ্রাতৃত্ব এবং সাম্যের পরিবেশ এবং মনোভাব গড়ে উঠে যার তুলনা হয় না । সদা হিংসা-দ্বেষ, রেষারেষি, বিবাদ-বিসম্বাদ, কলহ-কোন্দল, যুদ্ধ-বিগ্রহ, শঠতা-প্রবঞ্চনায় লিপ্ত নাফসানি বা স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক, ধনতান্ত্রিক শোষণমূলক সমাজ ও পরিবেশ হতে সরে দিনে পাঁচবার মসজিদে আত্ম-নিবেদন সত্যি রহমতস্বরূপ। এটাকে রহমত বা আশীর্বাদ বললেই যথেষ্ট বলা হলো না । এটাই জীবনের মূল ও চরম শিক্ষা । কারণ মানুষকে দুনিয়ার সংকীর্ণ ও পংকিল আবর্তের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে কিন্তু সুনিশ্চিতরূপে উন্নতি, প্রগতি ও ক্রমবিকাশের দিকে এগিয়ে যেতে হবে । তাই দিনে পাঁচবার এর ভেতর হতে টেনে এনে তাকে প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের মহান আদর্শ শিক্ষা দেয়া হয় । দিনে পাঁচবার সবাই সমবেতভাবে আল্লাহ্‌র কাছে আত্ম-নিবেদন করে শুধু তারা নিজের জীবনে আল্লাহ্‌র অনুভূতি লাভ করে আত্মবিকাশের উৎসাহ ও প্রেরণাই লাভ করে না, মানুষ যে ভাই ভাই সমান, মানুষে মানুষে কোন ভেদ-বৈষম্য নেই, থাকতে পারে না, মানুষে মানুষে রেষারেষি, কলহ-কোন্দল, হিংসা-দ্বেষ, বিবাদ-বিসম্বাদ এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ যে মানুষের গড়া এবং নিজ কর্মফল এ চরম অনুভূতিও তাদের জীবনে আসে। এভাবে মানুষ তার ব্যক্তি ও সমাজ-জীবন এবং জীবনাদর্শ সম্পর্কে সত্য ও সম্যক জ্ঞান লাভ করে সমগ্র মানব জাতিকে প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ এক মহান জাতিতে পরিণত করার মত মনোভাব গড়ে তোলে । বস্তুত ইসলামের প্রেম, সাম্য ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের মহান আদর্শ জামাতে সমবেতভাবে সালাত কায়েমের ভেতর দিয়েই মানুষের দৈনন্দিন জীবনে রূপায়িত হয়ে ভবিষ্যতের আদর্শতম সুখ ও শান্তিকামী বিশ্ব-মানবজাতি গড়ে তোলার মতো মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলছে ।

www.pathagar.com

সালাতের প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা পড়তে হয়। সূরা ফাতিহাই ইসলামিক উপাসনার সবচেয়ে সারবাণী। ব্যক্তিগত অথবা জামাতে যে ভাবেই সালাত কায়েম করুন না কেন এর সাথে অপর কোন সূরা বা কুরআনের আয়াত পাঠ করুন বা না করুন, সূরা ফাতিহা পড়তেই হবে।

ফাতেহা

বস্তুত সূরা ফাতিহা হলো পবিত্র কুরআনের সারকথা। ইসলামের মূলনীতি বা সারবাণী অতি সংক্ষেপে সূরা ফাতিহায় দেয়া আছে। বাকি সব এরই ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ। সূরা ফাতিহার মূলনীতি আবার এর প্রথম আয়াতেই নিহিত রয়েছে। তাই ওলীশ্রেষ্ঠ হযরত কুতুবউদ্দীন কাকী কুরআন পাঠ করতে বসে প্রথম দিন এই প্রথম আয়াত পড়েই দাবি করেছিলেন, তাঁর কুরআন পাঠ খতম হয়েছে, ইসলাম সম্পর্কে সত্য ও সম্যক জ্ঞান লাভ হয়েছে। স্রষ্টা, সৃষ্টি এবং সৃষ্টির ফিতরৎ তাঁর জানা হয়েছে। এই আয়াতের দু'টি অংশ আছে। প্রথম অংশে বলা হয়েছে ঃ সব হামদ আল্লাহ্‌র জন্য। মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে কেন সব হামদ আল্লাহ্‌র জন্য ? কেন তা তোমার, আমার বা অপরের জন্য নয় ? পরক্ষণেই জবাব দেয়া হয়েছে—কারণ, তিনি 'রব্বুল আলামিন'—সমগ্র বিশ্বের সমগ্র সৃষ্টির রব। কাজেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে, তিনি আমাদের রব বলে আমরা তাঁর ইবাদত-বন্দেগী বা হামদ আদায় করছি।

হামদ অর্থ সাধারণত প্রশংসা বলে ধরে নেয়া হয়। প্রশংসা সবার জন্য ব্যবহৃত হতে পারে; কিন্তু হামদ একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য ব্যবহৃত হয়। অন্য কারো জন্য নয়। কোন কাজ, উপকার বা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে মানুষ একজন অপর একজনকে প্রশংসা করে থাকে। আল্লাহ্‌র হামদ স্বতঃস্ফূর্ত। আপনা হতে প্রতিনিয়ত, প্রতি মুহূর্তে, প্রতি কাজে, প্রতি ঘটনায়, প্রতি অবস্থায় মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতি হামদ করবে। যে কোন অবস্থা, বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্টই জীবনে আসুক না কেন দিনে পাঁচবার তাকে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতেই হবে। জীবনে উত্থান-পতন, বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট প্রভৃতি নানারূপ বিপর্যয় আসতে পারে। আত্মীয় বা বন্ধু, ছেলেমেয়ে, মা-বাপ, স্বামী-স্ত্রীর চরমতম বিপদ এমনকি তাদের মৃত্যুতেও মানুষের কর্তব্য আল্লাহ্‌র প্রশংসা করা। সুখের দিনে আল্লাহ্‌র রহম বা আশীর্বাদ পেয়ে সে যেমন খুশি ও আনন্দিত হবে, ঠিক তেমনি তার চরমতম বিপদেও সে থাকবে উৎফুল্ল। সালাতের মারফত কঠোর চেষ্টা ও সাধনা করে এমন মনোভাব গড়ে

হামদ

www.pathagar.com

তুলতে হবে, যাতে মানুষ তার উপস্থিত পরিবেশ ও অবস্থার ভেতর সম্পূর্ণ সুখে ও শান্তিতে থাকতে পারে এবং চরম বিপদের দিনে যেমন তাকে বিচলিত এবং হতাশ হলে চলবে না, ঠিক তেমনি চরম সুখ ও আনন্দের দিনেও তাকে আনন্দে উল্লসিত ও আত্মহারা হলেও চলবে না । চরম সুখের দিনে যে আত্মহারা হয়ে কর্তব্য কাজে গাফ্‌লতি করে তার পক্ষে ইহজীবনে কৃতকার্য হওয়া যেমন দুরূহ, তেমনি আল্লাহ্‌র নৈকট্য বা সান্নিধ্য লাভ করাও সম্ভবপর নয় । হুমায়ুন বাদশাহ শেরশাহের সাথে যুদ্ধে প্রথম জয়লাভে আত্মহারা হয়ে আনন্দে মেতে গেলেন । ফলে শেরশাহের দ্বিতীয় আক্রমণে সম্পূর্ণ পরাজিত হয়ে তাঁকে ভিস্তীর হাতে প্রাণ বাঁচাতে হয়েছিলো । সুখের দিনে যারা এমনি অনন্ত আত্মহারা হয়ে কর্তব্যচ্যুত হয়, তাদের জীবনে চরম বিপর্যয় দেখা দেয় । অপরদিকে যারা কেবল দুঃখ করে, সর্বদা মুখ ভার করে থাকে, সদা সর্বদা এটা নেই, সেটা চাই—এই যাদের ভাব, তারা জীবনে কখনও সুখ-শান্তি, তৃপ্তি বা আনন্দলাভ করতে পারে না, সত্যের সন্ধান পায় না এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করতে পারে না। বস্তুত যারা দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদে ম্রিয়মাণ, হতাশ ও বিচলিত হয় তারা কখনও কোন কাজ সুচারু ও সুন্দররূপে সমাধা করতে পারে না। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি কাজে তারা ব্যর্থ মনোরথ বা বিফলকাম হয়। এমনি করে তারা নিজের ভেতরের সব শক্তি, প্রতিভা ও কর্মক্ষমতাকে দিন দিন নষ্ট করে ফেলে। জীবনে প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি কাজে, প্রতি ঘটনায়, প্রতি অবস্থায় আল্লাহ্‌র অতুলনীয় গুণাবলীর দ্বারা নিজেকে গুণান্বিত করে এবং তাঁর অনুভূতি দ্বারা নিজেকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করে জীবন সংগ্রামে জয়যুক্ত হতে চাইলে সংসারটাকে কিরূপভাবে দেখতে হয় এবং কিরূপ মনোভাব গড়ে তুলতে হয়, চিত্তটাকে কিরূপ সরস এবং নির্বিকার রাখতে হয় তাই অতি সংক্ষেপে এই অংশে বলা হয়েছে। যার চিত্তে এভাব আছে অর্থাৎ যিনি প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি কার্যে, প্রতি অবস্থায় আল্লাহ্‌র হামদ করেন তিনি ভাগ্যবান। জীবন সংগ্রামে তিনি জয়ী। এ ভাব যত দৃঢ় হবে, যত বেশি স্বতঃস্ফূর্ত ও স্থায়ী হবে ততই তিনি সুখ, শান্তি, তৃপ্তি, আনন্দ, উন্নতি, প্রগতি, ক্রমবিকাশ ও পূর্ণতাপ্রাপ্তির দিকে এগিয়ে যাবেন এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করবেন ।

এরূপ মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা, এ মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি দৃঢ় এবং স্থায়ী করা বড় সহজ নয় । ইহজীবনে দুঃখটাও বাস্তববোধ । দুঃখ-কষ্ট,

www.pathagar.com

শোক-তাপ, বিপদ-আপদ যখন আসে তখন স্বভাবতই লোকে মুহ্যমান হয়। কিন্তু সে অবস্থায় জ্ঞানী, বিশ্বাসী বা মু'মিনের পক্ষে হা-হুতাশ না করে পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহ্‌র কাছে দুঃখ মোচনের জন্য প্রার্থনা করা উচিত। তিনি দয়াময় ও করুণার আধার। করুণা ভিখারীর প্রার্থনা তিনি শোনেন। তবে তার প্রার্থনাটাও আবার সেরূপ হওয়া চাই ঃ

'বিপদে মোরে রক্ষা করো,
এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না করি যেন ভয়।
দুঃখ তাপে ব্যথিত চিতে
নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখ যেন করিতে পারি জয়।
নম্রশিরে সুখের দিনে
তোমার মুখ লইব চিনে,
দুঃখের রাতে নিখিল ধরা
যেদিন করে বঞ্চনা,
তোমারে যেন না করি সংশয়।'—রবীন্দ্রনাথ।

'তোমারে যেন না করি সংশয়'—এটাই মূল কথা। সংসার কেবল দুঃখময় বা কেবল সুখময় নয়, জগত সুখ-দুঃখময়। সুখ-দুঃখ, শুভাশুভ, বিপদ-আপদ, উত্থান-পতন এসব দ্বন্দ্ব ও সংঘাত নিয়েই সৃষ্টি। এই দ্বন্দ্ব ও সংঘাতবোধ দূর হলেই মানুষ সদা প্রফুল্ল ও আনন্দ-চিত্ততা লাভ করে আল্লাহ্‌র অনুভূতি হৃদয়ে উপলব্ধি করতে পারে। যতদিন সুখ-দুঃখাদি বোধ আছে, ততদিন আমরা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের অনুভব করতে পারি না। আমাদের মনে এই সংশয় উপস্থিত হতে পারে যে, দয়াময় ও করুণাময় সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে মানুষের জীবনে এত দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ কেন ? যখন সুখ পাই তখন আনন্দে আত্মহারা হই, আর যখন নিদারুণ দুঃখে পড়ি তখন দুঃখে ম্রিয়মাণ হই। কিন্তু তাঁর অস্তিত্বে অটুট বিশ্বাস ও অবিচল ভক্তি রেখে যদি আনন্দে আত্মহারা এবং দুঃখে ম্রিয়মাণ না হই—তাহলেই আমরা আমাদের ভেতরে সুপ্ত ও লুক্কায়িত প্রতিভা, ধীশক্তি ও কর্ম-ক্ষমতার চরমতম বিকাশ সাধন করে দিন দিন সুখ, শান্তি, তৃপ্তি, আর্নন্দ, উন্নতি, প্রগতি, সমৃদ্ধি, ক্রমবিকাশ ও পূর্ণতা-প্রাপ্তির দিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবো।

www.pathagar.com

হযরত বড়পীর সাহেবের জীবনের একটি ঘটনা উল্লেখ করলে আল্লাহ্‌র হামদ আদায় করার সত্যিকার অর্থ ও তাৎপর্য আমরা উপলব্ধি করতে পারবো। কোন এক ব্যক্তি হযরত বড়পীর সাহেবের সাথে দেখা করার জন্য তাঁর দরবারে যান। প্রাসাদতুল্য বিরাট বাড়ি এবং দরবারের শান-শওকত দেখে তার মনে প্রশ্ন জাগলো—সংশয় হলো। এসব দ্বন্দ্ব ও সংশয় তার মনকে পীড়া দিচ্ছিল,—এর ভেতর হযরত বড়পীর সাহেবের কোন এক বাণিজ্য জাহাজ বহু মালপত্রসহ সাগরে ডুবে গেছে, খবর এলো। তিনি খানিকক্ষণ চুপ করে এবং চোখ বুঁজে থেকে বললেন— 'আলহামদুলিল্লাহ্'—সব প্রশংসা বা হামদ আল্লাহ্‌র জন্য। খানিকক্ষণ পর আবার যখন খবর এলো যে, জাহাজ মালপত্রসহ বন্দরে এসে পৌঁচেছে তখনও তিনি ঠিক তেমনি কিছুক্ষণ চুপ করে এবং চোখ বুঁজে থেকে বললেন ঃ 'আলহামদুলিল্লাহ্'—সব প্রশংসা বা হামদ আল্লাহ্‌র জন্য। হযরত বড়পীর সাহেব বড় সওদাগর ছিলেন, বিরাট প্রাসাদতুল্য বাড়িতে বাস করতেন, কিন্তু এ ধনসম্পদের প্রাচুর্যের ভেতরে থেকেও তিনি চিত্তকে নির্বিকার রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। বস্তুত ধন-সম্পদের প্রকৃত মালিক হলেন—'রব্বুল আলামিন', 'স্বর্গে-মর্ত্যে যা-কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র'। মানুষ শুধু ভোগদখলের মালিক। সুতরাং আল্লাহ্‌র গচ্ছিত ধনসম্পদের কমবেশিতে দুঃখ করার, বিচলিত হবার কিছুই নেই। যা-কিছু ধনসম্পদ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হিসাবে মানুষ পাবে তার সদ্ব্যবহার করাই মানুষের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য। এটাই হলো মানুষের স্বাভাবিক এবং ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মনোভাব। সব ক্ষেত্রে, সব অবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রশংসা করার নির্দেশের অর্থ এই নয় যে, আমরা সদা দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদেই থাকবো। এর সত্যিকার অর্থ এবং তাৎপর্য হলো এই দুনিয়ার সংকীর্ণ ও পংকিল আবর্তের ভেতর থেকেও চিত্তকে প্রশান্ত মহাসাগরের মতো শান্ত এবং বিশ্বাসকে পাথরের মতো শক্ত ও দৃঢ় করতে হবে। যখন বহু মূল্যবান মালপত্রসহ জাহাজ ডুবে যাবার খবর এলো তখন তিনি চুপ করে এবং চোখ বুঁজে দেখলেন, এতে তাঁর কোনরূপ চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটেছে কি-না। যখন বুঝতে পারলেন যে, এত বড় আর্থিক ক্ষতিও তাঁর চিত্তে কোনরূপ চিত্ত-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করতে পারেনি তখনই তিনি আল্লাহ্‌র হামদ আদায় করলেন। তারপর আবার যখন জাহাজ ফিরে আসার খবর পেলেন তখনও ভাবলেন, এতে তাঁর চিত্ত আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছে কি-না। যখন তিনি বুঝতে পারলেন এ সুখবরও তাঁর

www.pathagar.com

চিত্তে কোনরূপ চাঞ্চল্য আনতে সক্ষম হয়নি, তখনই তিনি বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ্' । বস্তুত সূরা ফাতিহার প্রথমে এর উল্লেখ এবং প্রতি কাজে, প্রতি ঘটনায়, প্রতি অবস্থায়, আলহামদুলিল্লাহ্ বলার নির্দেশ আমাদেরকে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি এবং মনোভাব গড়ে তুলে সুখ, শান্তি, উন্নতি, প্রগতি, ক্রমবিকাশ ও পূর্ণতা-প্রাপ্তির দিকে এগিয়ে যাবার শিক্ষা দেয় ।

হযরত বড়পীর সাহেবের এ ঘটনা একদিকে আমাদেরকে সত্যিকার মুসলিম বা শান্তিকামী মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয় অপরদিকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, হযরত আবদুল কাদের জিলানীর মতো সংযমী ও আত্মজয়ী দরবেশও যখন প্রতি ঘটনায় নিজের চিত্তে চাঞ্চল্য এলো কি-না বিচার করে দেখেছেন তখন আমাদের মত সাধারণ মানুষের চিত্ত-চাঞ্চল্য হলে হতাশ বা বিচলিত না হয়ে নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা ও কঠোর সাধনা করতে হবে নির্বিকার-চিত্ততা লাভ করার জন্য । নিদারুণ দুঃখের ভেতরও আমরা দুঃখে মুহ্যমান হবো না—সকল অবস্থায়ই আমরা থাকবো শিশুর ন্যায় আনন্দিত ও উৎফুল্ল । কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য এই ছয় রিপুকে ধ্বংস না করে সুনিয়ন্ত্রিত করতে হবে । বস্তুত ইসলামের চরম বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা কখনও কোন রিপুকে ধ্বংস করতে বলে না— তাকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে বলে । স্বকীয় রিপু ও প্রকৃতিকে জয় করে এমন নির্বিকার চিত্ততা লাভ করতে হবে যেন আঘাতে আহত না করতে পারে, আগুনে পোড়াতে না পারে, পানিতে ভেজাতে না পারে এবং শোক-তাপে ম্রিয়মাণ করেত না পারে । এসব অলৌকিক বলে মনে হলেও মানুষের বাস্তব এবং লৌকিক জীবনেও এটা সম্ভবপর ।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, কি করে আমি রিপুকে জয় করে নির্বিকার চিত্ততা লাভ করবো । শোক-তাপ, দুঃখ-বিপত্তি যখন চিত্তকে অভিভূত করে, তখন কিরূপে আমি আনন্দ ও তৃপ্তিলাভ করে ক্রমবিকাশ এবং ক্রমোন্নতির চিরন্তন লড়াইয়ে আত্মনিয়োগ করবো ? বিক্ষিপ্ত চিত্তকে কি উপায়ে শান্ত-সংযত করবো ? এর একমাত্র জবাব সালাতের মারফত আল্লাহ্র অনুভূতি লাভ করা এবং সদাসর্বদা আল্লাহ্তে চিত্ত রাখা, আল্লাহ্কে হামদ এবং স্মরণ করা । আল্লাহ্ই পাপ-তাপ, শোক-দুঃখ হতে মুক্ত করবেন । এর নামই ইসলাম বা পূর্ণ আত্মসমর্পণ। আল্লাহ্র নাম হৃদয়ে ধারণ করলে চিত্ত শুদ্ধ হয়, কখনও কু-প্রবৃতি, খারাপ কাজ এবং পাপচিন্তা মনে জাগতে পারে না । তাই সালাতের প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা আবৃত্তি এবং প্রতি কাজে, প্রতি অবস্থায়, আল্লাহ্র

www.pathagar.com

হামদ করতে বলা হয়েছে । দুঃখের বাহ্যিক কারণ যা-ই হোক না কেন, এর আসল অনুভূতি মনের দ্বারাই হয় । তাই দুঃখ নিবারণের মহৌষধ এবং দুঃখে ম্রিয়মাণ, হতাশ ও বিচলিত হয়ে জীবন সংগ্রামে ব্যর্থ না হবার চেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার দুঃখ বিষয়ে অন্যমনস্ক হয়ে সব ক্ষেত্রে, সব অবস্থায় আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা এবং তাঁর হামদ করা । এক কথায় শোক-তাপ, দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদের বিষয় মনে চিন্তা না করা ।' দুঃখের দ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত হলে সুখের বিষয় চিন্তা করতে হয় । এরূপ চিন্তা সর্বদা মনে রাখলে চিত্ত সুপ্রসন্ন এবং উৎফুল্ল থাকে এবং সম্যক ও সত্য জ্ঞানের সন্ধান দেয় । মনের শক্তি অসাধারণ। যে কোনো বিষয় অবিচ্ছেদ্য চিন্তা করা যায় মন তদাকার প্রাপ্ত হয় । মনে সদা আল্লাহ্‌র চিন্তা-ভাবনা করাই এ বিষয়ে সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার বা উপায় একথা আগেই বলেছি । আদর্শ মানুষের সাথে চলাফেরা, উঠাবসা এবং সদগ্রন্থ পাঠেও মন নিবিষ্ট থাকে, চিত্ত সরস হয়, দুঃখ-কষ্টের লাঘব হয় এবং সদা ভাল চিন্তা করতে এবং ভাল কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে ।

আসুন আমরা বর্তমান দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট, শোক-তাপ, ব্যথা-বেদনা, বিপদ- আপদ, হিংসা-দ্বেষ, রেষা-রেষি কলহ-কোন্দল, বিবাদ-বিসম্বাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহে ভ্রূক্ষেপ না করে সুখের জীবন, সুখের সংসার, শান্তির পরিবেশ এবং আদর্শতম সমাজ ও মানবগোষ্ঠী গড়ে তোলবার অর্থাৎ ধরার বুকে জান্নাত প্রতিষ্ঠা করার চিন্তায় মনোনিবেশ করি । জীবন সুখময়, এই বিশ্বাস দৃঢ় করে দুনিয়ার উপর চিরন্তন সুখ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জিহাদ বা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করি ।

চিত্ত যাঁর সরস, তিনি সৃষ্টির সকল বস্তুতেই স্রষ্টার অস্তিত্বের মধুর অনুভূতি বা পরশ অনুভব করেন । নদীর পানিতে, গাছের ফলে, চাঁদের স্নিগ্ধ কিরণে, সান্ধ্য সমীরণে, ফুলের ঘ্রাণে, পাখীর কলরবে, উষার আলোকে, প্রেমের পুলকে, স্নেহের ডাকে, সর্বত্রই তিনি আল্লাহ্‌র মধুর পরশ বা অস্তিত্বের অনুভব করেন । খোলা আকাশের সব দিকে তাকালে যেমন সব কিছু সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়, সেরূপ জ্ঞানিগণ সদাসর্বদা সব কিছুতে, সব অবস্থায় আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব অনুভব করেন । আকাশে, পাতালে, জলে, স্থলে, জীবে, অজীবে সর্বত্রই তাঁর কুদরতের প্রকাশ দেখতে পান । তাই তাঁদের কাছে সব কিছু মধুময় । প্রকৃতিতে সৌন্দর্য আছে, সৌরভ আছে, সরসতা আছে, মানুষের হাসি আছে, ভালবাসা আছে, আনন্দ আছে, তৃপ্তি আছে, সুখ আছে, শান্তি আছে, তবে মানুষ

www.pathagar.com

সদা হাসিমুখে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করবে না কেন এবং তাঁর অতুলনীয় গুণে গুণান্বিত হয়ে সদা হাসিমুখে স্বকীয় কর্তব্য পালনে ব্রতী হবে না কেন ?

এতক্ষণ আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্য পালনে অর্থাৎ সদা সর্বদা আল্লাহ্‌র প্রশংসা করাতে মানুষের কিরূপ মনোভাব গড়ে ওঠে তাই আলোচনা করলাম। এখন এ মনোভাব মানুষকে কোন্ মহান কর্তব্য পালনে সহায়তা করে তারই সন্ধান পাই আমরা এ আয়াতের দ্বিতীয় অংশে। সেখানে আল্লাহ্‌কে 'রাব্বুল আলামিন'—বিশ্ব বা সৃষ্টির রব বলে বর্ণনা করা হয়েছে একথা আমরা আগেই বলেছি। প্রথম অংশে খুব সংক্ষেপে প্রধানত ইসলামের আধ্যাত্মিক রূপ ফুটে উঠেছে, আর দ্বিতীয় অংশে আমরা দেখতে পাবো ইসলামের বৈষয়িক রূপ। প্রথম অংশে দেখেছি আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্য পালনে আমাদের জীবন ও মনের উপর কিরূপ প্রভাব হয়, এবার দেখতে পাবো আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন এবং সদা তাঁর হামদ করার মনোভাব জীবের প্রতি কর্তব্য পালনের নির্দেশ দিয়ে আমাদের বাস্তব জীবনকে কিভাবে এবং কতখানি প্রভাবান্বিত করে ?

মানুষের সাথে, সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার বড় সম্পর্ক রব হিসাবে, রব হিসাবেই দুনিয়ার উপর আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ কাজ। খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে—সমগ্র সৃষ্টিকে স্তরের পর স্তর, ধাপের পর ধাপ, পরিবর্তনের পর পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে সৃষ্ট জীবের বাঁচার লড়াইর বিভিন্ন পর্যায়ে সৃজন, পালন ও পোষণের ভেতর দিয়ে যিনি সমগ্র সৃষ্টিকে ধীরে ধীরে সুখ, শান্তি, প্রগতি, সমৃদ্ধি ও পূর্ণতা-প্রাপ্তির দিকে নিয়ে যান তিনিই রব—একথা আগেই বলেছি। আরও সংক্ষেপে বলতে গেলে রব-এর অর্থ স্রষ্টা, পালক ও ক্রমবিকাশক। রব হতে রবুবিয়াৎ বা বিশ্ব পালনবাদের উৎপত্তি। উপরোল্লিখিতভাবে সৃষ্টিকে সুখ, শান্তি ও প্রগতির দিকে নিয়ে যাওয়ার কাজকেই বলা হয় রবুবিয়াৎ। আল্লাহ্ রব বা স্রষ্টা, পালক বা ক্রমবিকাশক হিসাবে দুনিয়ায় রবুবিয়াৎ-এর কাজ করেন বলেই তাঁকে হামদ আদায় করতে হয়। তাহলে একথা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, দুনিয়ার উপর আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ কাজ রবুবিয়াৎ এবং রব হিসাবেই তার সাথে সৃষ্টি, পালন ও পোষণের বিশেষ করে মানুষের সবচেয়ে বেশি সম্পর্ক।

রবুবিয়াৎ

স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ কাজ দুনিয়ার উপর রবুবিয়াৎ হলে মানুষের শ্রেষ্ঠ কাজ, প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য কি হওয়া উচিত ? এ বিষয়েও কুরআনে অতি সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। মানুষকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ফেরেশ্‌তার

www.pathagar.com

জবাবে তিনি বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করেছেন ঃ 'এরা (মানুষ) দুনিয়ার উপর আমার খলীফা। খলীফা বা প্রতিভূর কর্তব্য হলো প্রভুর কাজ করা। আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিভূ হিসাবে দুনিয়ার উপর আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠ কাজ রবুবিয়াৎ বা বিশ্ব পালনই হবে মানুষের শ্রেষ্ঠ কাজ, প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য। এ কর্তব্য সুষ্ঠু, সুন্দর ও সুচারুরূপে পালন করার জন্যই আমাদের সৃজন করা হয়েছে।'

ব্যাপকতম অর্থে রবুবিয়াৎ সৃষ্টির সব কিছুর সব পর্যায়ে, সব অবস্থায়, সব স্তরে, সব ধাপে, সব অভাব ও প্রয়োজন মেটানোর কাজ। মানুষ, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, গাছপালা প্রভৃতি সমস্ত জীবের সব রকম অভাব মেটানোর কাজই রবুবিয়াৎ। প্রশ্ন হতে পারে পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, গাছপালা, জীব-জন্তু অতসব নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন কি ? এ প্রশ্নই আজ বস্তুতান্ত্রিক জগতের প্রতি মানুষের প্রতি ধমনীতে প্রবাহিত। তারা সদাই স্বকীয় সুখ ও শান্তির জন্য ব্যস্ত। আবার মানবগোষ্ঠীরও কেবল দৈহিক অভাব ও প্রয়োজন মেটানোর কাজ হলো রবুবিয়াৎ-এর সবচেয়ে সংকীর্ণতম অর্থ। কিন্তু মানুষের সর্বাঙ্গীন উন্নতি, কল্যাণ ও পূর্ণ বিকাশের জন্য তার দেহ, মন, আত্মা ও মস্তিষ্কের সব অভাব ও প্রয়োজনের ভেতর এমন এক সমন্বয় সাধন করতে হবে যাতে করে তার দৈহ, মন, আত্মা ও মস্তিষ্কের চরমতম বিকাশ ও উন্নতি সম্ভব হয়। স্বকীয় দেহ, মন, আত্মা ও মস্তিষ্কের উন্নতি ও বিকাশের সাথে সমগ্র মানব জাতির দেহ, মন, আত্মা ও মস্তিষ্কের উন্নতি ও বিকাশের সমন্বয় সাধন করতে হবে। একের উন্নতি ও বিকাশ অপরের উন্নতি বিকাশকে ব্যাহত না করে সহায়তা করবে। সবাই সমভাবে প্রগতির পথে এগিয়ে যাবে।

শুধু মানুষকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলেই চলবে না। পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, জীব-জন্তু, গাছপালা প্রভৃতি সৃষ্টির অন্য সমস্ত জীবের সামগ্রিক পুষ্টি, উন্নতি ও বিকাশের সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। ভাল শাক-সবজি, তরি-তরকারি, গাছপালা না জন্মালে প্রয়োজন মত মানুষের খাদ্য, পথ্য, ওষুধ, কাপড় প্রভৃতি সুষ্ঠু ও সুন্দররূপে মেটানো সম্ভবপর হবে না। গাছপালা বেশি হলে যেমন স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর তেমনি গাছপালা না থাকলে মানুষ বাঁচতে পারবে না। বর্তমান সভ্য জগত গাছপালা কেটে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শহর ও গ্রাম তৈরি করতে চেষ্টা করছে এবং স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য কত বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কারে প্রতিনিয়ত ব্যস্ত রয়েছে, তবুও মানুষের স্বাভাবিক শক্তি, মনের বল

www.pathagar.com

ও স্বাস্থ্যের কত অবনতি ঘটছে ; মানুষের জীবনে কতরূপ ব্যারাম, পীড়া, জরা-ব্যাধি দেখা দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই । আয়ুও কমে গিয়েছে তার । গাছ হতে ওষুধ তৈরি করে আমরা স্বাস্থ্যবান হবার এবং বাঁচার জন্য প্রতিনিয়ত লড়াই করছি । কতটুকু কামিয়াবী হয়েছি তা একটু চিন্তা করলে যেকোন সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে ধরা পড়ে । জঙ্গলে ঘেরা গ্রাম বা পাহাড় পর্বতে বাস করা আগেকার দিনের লোকের সবল, বলিষ্ঠ ও স্বাস্থ্যবান দেহ ও প্রফুল্ল মনের কথা এখন আমরা কল্পনাও করতে পারি না । সবল, বলিষ্ঠ ও স্বাস্থ্যবান দেহ, প্রফুল্ল মন এবং উর্বর ও তেজস্বী মেধা ও প্রতিভাসম্পন্ন মানবগোষ্ঠী গড়ে তুলতে হলে চাই প্রয়োজনমতো সব গাছপালার সব চাহিদা মেটানো । দেশ, কাল, আবহাওয়া এবং অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে । আর পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, জীব-জন্তু ও জানোয়ার সম্পর্কেও একই কথা । আমাদের এখনও অনেক কিছু চেনার, জানার ও শেখার বাকি আছে । আমরা জানি না কোন্ গাছ, কোন্ পশু, কোন্ পক্ষী, কোন্ কীট-পতঙ্গ আমাদের কি কি প্রয়োজনে লাগতে পারে । এদের দ্বারা মানব ও সৃষ্টির কল্যাণ কিভাবে সাধিত হতে পারে ? যা জানি তা পূর্ণ ও চূড়ান্ত নয় । আরও অনেক জানার, চেনার ও শেখার বাকি আছে । পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, মাছ, গাছ এখন কত কম হয়েছে এবং দিন দিন কত কম হচ্ছে তার খতিয়ান কে রাখে—কেইবা তলিয়ে দেখেছে এর ফলে মানবের সুখ, শান্তি, কল্যাণ, উন্নতি, প্রগতি ও বিকাশ কতখানি ব্যাহত হয়েছে, হচ্ছে এবং আরও ভবিষ্যতে হবে ?

মানুষ তার ভিতরের সুপ্ত প্রতিভা ও অফুরন্ত শক্তির কথা ভুলে গিয়েছে । তাই মানুষ এত ধীর মন্থর গতিতে চলছে । একবার মানুষ যদি তার সুপ্ত ও লুক্কায়িত শক্তি ও প্রতিভার সন্ধান পায়, একবার যদি সে নিজেকে চিনতে পারে, একবার যদি তার সর্বাঙ্গীন চেতনা উদ্বুদ্ধ হয়, তবে সে সিংহনিনাদে দিক-বিদিক কাঁপিয়ে চলবে উন্নতি, প্রগতি, বিকাশ, সুখ, শান্তি ও পূর্ণতা-প্রাপ্তির দিকে আরও দ্রুত গতিতে । মানুষ তার স্বীয় প্রতিভা বলে যদি সবাই সবার ন্যায্য পাওনা, অধিকার ও স্থান নিয়ে এবং প্রয়োজনমতো পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, গাছপালা, মাছ ও অন্যান্য জীব-জন্তু ও জানোয়ারকে সঠিক স্থানে নিয়োজিত রেখে সমগ্র সৃষ্ট জীবের সামগ্রিক চরমতম উন্নতি ও বিকাশের পথে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলে, ঠিক যেখানে যে মানুষের যেভাবে থাকা দরকার, যে গাছ যেখানে রোপিত হওয়া দরকার, যে মাছ যেখানে যেভাবে সাঁতার কাটা

www.pathagar.com

দরকার, সেখানে থাকার এবং বিকশিত হওয়ার পূর্ণ সুযোগ ও সুবিধা যদি তারা পায়, তাহলে সুনিপুণ শিল্পীর আঁকা ছবির মতোই এ বিশ্বও সৃষ্টি হবে জান্নাততুল্য সুন্দর । সবাই আপনা হতে আপন কাজ, আপন কর্তব্য করবে । অপরের কাজ বা কর্তব্যে এতটুকু বাধার সৃষ্টি না করে যতটুকু সহায়তা করা দরকার ঠিক ততটাই করবে । এর একটুও নড়চড় হবে না, এদিক-সেদিক হবে না, কমবেশি হবে না । সেদিন অন্যায়, অধর্ম, অবিচার, অত্যাচার, উৎপীড়ন, মিথ্যা, শঠতা, প্রবঞ্চনা, বিবাদ-বিসম্বাদ, অনধিকার প্রবেশ বা চর্চার বিচারের জন্য কোন হাকিম, আদালত বা ফৌজদারী কাছারির দরকার হবে না । এমন সুখ ও শান্তি বিরাজ করবে যে, শান্তি বজায় রাখার জন্য কোন পুলিশ, সামরিক বাহিনী, অস্ত্রশস্ত্র, সাজ-সরঞ্জাম, যুদ্ধ-বিগ্রহ, সরকার, রাষ্ট্র, কিছুরই প্রয়োজন থাকবে না । সর্বত্র সুখ ও শান্তি বিরাজ করবে । দুনিয়ার উপর জান্নাত প্রতিষ্ঠা হবে—ইসলাম বা চিরস্থায়ী শান্তি কায়েম হবে । বস্তুত চিরন্তন সংঘাত ও সংঘর্ষের ভেতর শান্তি ও সমন্বয় সাধন করাই ইসলামের মূল উদ্দেশ্য ।

বস্তুত রব হিসাবে আল্লাহ্ বিশ্ব বা সৃষ্টিকে ধীরে ধীরে পূর্ণতা-প্রাপ্তির দিকে এগিয়ে দিচ্ছেন এ বিশ্বাসও মানুষকে দুঃখ-কষ্টে, বিপদ-আপদে, শোক-তাপে আনন্দিত, উৎফুল্ল ও নির্বিকার থাকতে শিক্ষা দেয় । কারণ উপস্থিত পরিবেশ এবং যা চোখে দেখা যায় তাই সে দেখে এবং তার সম্পর্কেই সে জ্ঞান রাখে। বাইরের প্রকাশ ছাড়া প্রতি বস্তু ও ঘটনার ভেতরের রূপ এবং ভবিষ্যতে তার চরম পরিণতি মানুষের জানা নেই । কিন্তু সর্বজ্ঞ, সব জ্ঞান ও গুণসম্পন্ন আল্লাহ্র সব কিছু জানা আছে । তাই সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞানী স্রষ্টা মানুষকে দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, সংঘাত-সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতির সাধারণ নিয়ম ও নীতি অনুসারে সমগ্র সৃষ্টিকে উন্নতি, প্রগতি ও পূর্ণতা-প্রাপ্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছেন । এ বিশ্বাস জীবনে এই অনুভূতি এনে দেয় যে, এই চিরন্তন সংঘাত ও সংঘর্ষের বিভিন্ন স্তর ও রূপের ভেতর দিয়েই মানুষ ধীরে ধীরে কিন্তু সুনিশ্চিতরূপে চিরন্তন সুখ, শান্তি, উন্নতি, প্রগতি, ক্রমবিকাশ ও পূর্ণতা-প্রাপ্তির দিকে এদিয়ে চলেছে । আলামিন বা বিশ্ব বা সৃষ্টির রব হিসাবে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণী নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতি এবং সৃষ্টির অন্য সমস্ত জীবের প্রতি মানুষের কর্তব্যবোধ জাগরুক করার কথা আগেই বলা হয়েছে । সুতরাং সূরা ফাতিহার দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শিক্ষা হলো সৃষ্টির ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতিতে বিশ্বাস এবং এর ভেতর মানুষের সঠিক ও

www.pathagar.com

সুনির্দিষ্ট কর্তব্য নির্ধারণ।

সূরা ফাতিহার চতুর্থ শিক্ষা হলো 'রহমান' এবং 'রহীম' রূপে আল্লাহ্‌র পরিচয় এবং তাকে ভিত্তি করে মানুষের মনোভাব এবং কর্তব্য নির্ধারণ করা। 'রহমান' ও 'রহীম' সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে তার পুনরুল্লেখ করতে চাই না। সেই অর্থ ও তাৎপর্য সামনে রেখে শুধু এটুকু উল্লেখ করলেই এখানে যথেষ্ট হবে যে, আল্লাহ্ 'রহমান' হিসাবে দেহ, মন, আত্মা ও মস্তিষ্কের চরম বিকাশ ও উন্নতির জন্য আমাদের যা-কিছুর প্রয়োজন সব কিছুই দান করেছেন। 'রহীম' হিসাবে তাই তিনি একদিকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন এসব দেয়া সম্পদ এবং কর্মক্ষমতা হতে মানুষ চেষ্টা ও সাধনা করলে আকাংক্ষিত ফল ও উদ্দেশ্য লাভ করতে সক্ষম হবে এবং অপরদিকে সাবধান করে দিচ্ছেন যে, আল্লাহ্‌র দেয়া দেহ, মন, মস্তিষ্কের, প্রাকৃতিক সম্পদ ও অন্যান্য দানের সদ্ব্যবহার না করলে তারা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সফলকাম হতে পারবে না। মানুষের চরমতম উন্নতি ও বিকাশ নির্ভর করে তার ভেতরের সুপ্ত ও লুক্কায়িত জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, বিচার-শক্তি, ধীশক্তি ও প্রতিভা এবং বাইরের ধনসম্পদ ও অন্যান্য বস্তুর সময়োচিত সদ্ব্যবহারের উপর। মানুষ এসবের সদ্ব্যবহার করলেই সুখ, শান্তি, উন্নতি, প্রগতি ও পূর্ণতা-প্রাপ্তির দিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে, আর এসবের অসদ্ব্যবহার করে এবং সুযোগ-সুবিধা হেলায় হারিয়েই মানুষ ডেকে আনে ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে দুঃখ-কষ্ট, দুর্গতি ও চরম বিপর্যয়।

সূরা ফাতিহার পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শিক্ষা নিহিত রয়েছে 'মালিকি-য়াওমুদ্দিন' অর্থাৎ চরম বিচারের দিনের প্রভুর উপর। আল্লাহ্‌কে এখানে মালিক বা প্রভু বলা হয়েছে, মালিক বা রাজা নয়। মালিক মানুষের ভাল-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করে সঠিক পুরস্কার ও শাস্তি দিতে পারেন এবং প্রয়োজনবোধে ও ইচ্ছা করলে তিনি মানুষকে কৃতকাজের জন্য ক্ষমাও করতে পারেন। বিচারের দিনের কথা উল্লেখ করে এই চরম শিক্ষাই আমাদেরকে দেয়া হচ্ছে যে, আমাদের কাজের ফল আমাদেরকে ভোগ করতেই হবে। ভাল-মন্দ কোন কাজই ফলহীন হবে না। মানুষ ইহজীবনে তার উপলব্ধি না করলেও পর-জীবনে তা সুস্পষ্টরূপে অনুভব করবে। বস্তুত বর্তমান ভবিষ্যতকে নিয়ন্ত্রিত করে এ বিশ্বাস মানুষের জীবনে প্রতি ক্ষেত্রে এবং প্রতি কাজে সঠিক পথে চলার নির্দেশ দেয়। একদিকে যেমন এ বিশ্বাস তাকে ভালো

www.pathagar.com

কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে, অপরদিকে ঠিক তেমনি অন্যায় বা খারাপ কাজ করলেও হতাশ ও বিচলিত না হয়ে কর্তব্য পথে অগ্রসর হবার নির্দেশ দেয় । কারণ তিনি ইচ্ছা করলে মানুষকে ক্ষমাও করতে পারেন । অর্থাৎ মানুষ চেষ্টা করলে অতীত কাজের ফল হতে নিজেকে মুক্ত করতে পারে ।

সপ্তম শিক্ষা 'ইয়াকানাবদু' অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগী, পূজা-অর্চনা ও ধ্যান-ধারণা করি । এটা আল্লাহ্‌র কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও আত্মনিবেদনের মনোভাব গড়ে তুলতে এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টি সেই মৌলিক ও সাধারণ নীতি ও বিধি-নিষেধ মোতাবেক স্বকীয় জীবন নিয়ন্ত্রিত করতে শিক্ষা দেয় । এটা করতে গিয়ে যদি বংশ, পরিবার, সমাজ, পরিবেশ এবং কর্তৃপক্ষের বিরোধিতা করতে হয় এবং স্বকীয় কামনা-বাসনা ও ইচ্ছা- আকাংক্ষার বিরুদ্ধে চলতে হয় তাতেও দ্বিরুক্তি করলে চলবে না । শুধু আল্লাহ্‌র ইবাদত করি, আল্লাহ্‌র সামনেই মাথা নত করি, এটা শুধু আত্মসমর্পণ ও আত্মনিবেদনের মনোভাবই গড়ে তুলবে না ; বস্তুত আল্লাহ্‌র নিয়ম-নীতি ও বিধি-নিষেধ মেনে চলার মতো মনের বল ও চিত্তের নির্বিকারতা, দৃঢ়তা ও সাহস এনে দেবে । মানুষ কোনরূপ বাধা-বিঘ্ন, বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট এবং যুদ্ধ-বিগ্রহেই বিচলিত হবে না । সমস্ত বিপর্যয় ও বাধা-বিঘ্নের সামনেই সে থাকবে নির্বিকার । চরম বিপদ ও বিপর্যয়ের দিনেও তার বিশ্বাস ও সাহস এতটুকু কমবে না । সব অবস্থায় এবং সব ক্ষেত্রেই তার চিত্ত থাকবে প্রশান্ত মহাসাগরের মতো শান্ত । কোন অবস্থায়ই সে জীবন যুদ্ধে পরাজয়কে বরণ করে নেবে না । সে হবে সব ক্ষেত্রে, সব কাজে জয়ী । বস্তুত বিচারের দিনের প্রভুর কথা উল্লেখের পরেই শুধু আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগী এবং ধ্যান-ধারণা করার নির্দেশ দিয়ে একথাও সুস্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, 'রহমান' হিসাবে আল্লাহ্‌তা'আলা আমাদের যা দান করেছেন তার সময়োচিত সদ্ব্যবহার না করলে জীবনে বিপর্যয় দেখা দিতে পারে । তা থেকে রেহাই পাবার সবচেয়ে শক্তিশালী উপায় ও হাতিয়ার হলো একমাত্র আল্লাহ্‌র উপাসনা এবং ধ্যান-ধারণায় চিত্তকে মগ্ন রাখা ।

সূরা ফাতিহার অষ্টম শিক্ষা হলো—'ইয়াকানাস্তাইন' একমাত্র তোমারই (আল্লাহ্‌র) কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি । এটা দ্বারা একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করতে বলা হয়েছে এবং সব অবস্থায়ই স্বকীয় উদ্দেশ্য, আকাংক্ষিত লক্ষ্যস্থল ও বস্তু হতে হতাশ ও বিচলিত হতে নিষেধ করা হয়েছে । বাইরের

www.pathagar.com

সমস্ত চেষ্টা, সাধনা এবং উপায় ব্যর্থ হলেও সর্বশক্তিমান এবং পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহ্‌তা'আলা রয়েছেন যাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করলে কোন অবস্থায়ই মানুষকে ব্যর্থ মনোরথ হতে হবে না । কিন্তু চরম পরিতাপের বিষয়, মানুষ আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর না করে, অপরের সাহায্য চায় এবং সেই সাহায্য পাওয়ার আশায় সে তাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের প্রশংসায় আত্মনিয়োগ করে । মানুষ এভাবে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর না করে, আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা না করে, অপরের সাহায্য নেবার এবং পাবার আশায় আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অপরাপর মানুষের পূজা-অর্চনা শুরু করেছে । তাই এসেছে মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে চরম বিপর্যয়, দুঃখ-কষ্ট ও দুর্গতি । সে নিজেকে করে ফেলেছে অতি ছোট, নীচ ও হীন । তার বিশ্বাস, সে অপরের মতো জ্ঞানী, গুণী, ধীশক্তিসম্পন্ন এবং প্রতিভা ও প্রভাবশালী হতে পারে না । নিজেকে নিজের সুপ্ত ও লুক্কায়িত প্রতিভাকে ভুলে গিয়ে মানুষ সমাজ ও পরিবেশের কাছে আত্মসমর্পণ করছে আর ভাবছে তার অবস্থার পরিবর্তন হবে না । দুখ-কষ্ট, দুর্গতি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, কলহ-কোন্দল, বিবাদ-বিসম্বাদ, রেষা-রেষি, হিংসা-দ্বেষ, ছলচাতুরি, মিথ্যা, ফাঁকিবাজি, ধাপ্পাবাজির ভেতর দুস্থ মানবতা, হতাশ এবং বিচলিত হয়ে পড়েছে । সে দিশেহারা হয়ে পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে—মুক্তির পথ—শান্তির পথ—কল্যাণের পথ—উন্নতির পথ—প্রগতির পথ—ক্রম-বিকাশের পথ—পূর্ণতা-প্রাপ্তির পথ। কিন্তু পথ খুঁজে পাচ্ছে না, শান্তির সন্ধান পাচ্ছে না । তাই আজ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে মানুষকে সূরা ফাতিহার এসব আয়াতের সত্যিকার অর্থ ও তাৎপর্য উপলব্ধি এবং হৃদয়ঙ্গম করে একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর আত্মসমর্পণ এবং একমাত্র তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে স্বকীয় সুপ্ত, লুক্কায়িত শক্তি ও প্রতিভাব পূর্ণ বিকাশ করে ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে চলা । এ বিশ্বাস নিয়ে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলে কোন বাধা-বিঘ্নই তাকে দাবিয়ে এবং দমিয়ে রাখতে সক্ষম হবে না ।

সূরা ফাতিহার নবম শিক্ষা—আমাদের সরল, সহজ, ন্যায় ও সত্য-পথে পরিচালিত কর । বস্তুত সরল, সহজ, ন্যায় ও সত্যপথে পরিচালিত হয়ে সুখ, শান্তি, উন্নতি, প্রগতি ও পূর্ণতা-প্রাপ্তির দিকে এগিয়ে চলার জন্য অন্তরের তীব্র বাসনাই প্রার্থনার ভেতর ব্যক্ত হয় । সুতরাং উপস্থিত পরিবেশ ও অবস্থাতে সুখী ও আনন্দিত থাকার অর্থ কাজ হতে বিরত থাকা নয় । ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব দুনিয়া ও বাস্তব জীবন সম্পর্কে নিষ্ক্রিয়তা বা চঞ্চলতা

www.pathagar.com

এর কোনটাই সমর্থন করে না ; বরং এটা উপস্থিত পরিবেশ ও অবস্থায় আনন্দিত থেকে ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতির সাধারণ এবং স্বাভাবিক নিয়মানুসারে মানুষকে ধীরে ধীরে চিরন্তন সুখ-শান্তি ও পূর্ণতা-প্রাপ্তির দিকে এগিয়ে চলার নির্দেশ দেয় । সদা সর্বদা আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলে এবং সব ক্ষেত্রে ও সব অবস্থায় উৎফুল্ল থাকলে এটা তার জীবনে চলার পথে গতি বন্ধ না করে গতি বৃদ্ধি করে । সে কোনমতেই স্বকীয় সমাজ, পরিবেশ ও অবস্থার সামনে মাথা নত করবে না, শুধু অহরহ চেষ্টা, সাধনা ও সংগ্রাম করবে তার পরিবেশ ও অবস্থাকে আয়ত্তাধীনে আনার জন্য । উন্নতি, প্রগতি, কল্যাণ ও ক্রমবিকাশহীন তৃপ্তি, আনন্দ ও শান্তি তার কাম্য নয় । চিরন্তন সুখ, শান্তি, উন্নতি ও প্রগতিই হলো তার জীবন এবং জীবন সংগ্রামের মুখ্য উদ্দেশ্য । নিছক আল্লাহ্‌র উপর আত্মসমর্পণ বা আত্ম-নিবেদন করে বসে থাকলেই জীবনে জয়যুক্ত হওয়া চলবে না । তাই বলা হয়েছে সদা-সর্বদা, সব ক্ষেত্রে, সব কাজে, সব অবস্থায় ভালমন্দ, ন্যায়-অন্যায় বিচার করে সরল,সহজ, ন্যায় ও সত্য পথে জীবনকে পরিচালিত করতে হবে । যে পথ, উপায় ও পদ্ধতিতে কোন কাজ সহজ ও সরলভাবে সম্পন্ন হতে পারে সেই পথে, সেই উপায়ে বা পদ্ধতিতে স্বকীয় জ্ঞান, বিবেক, বিচারবুদ্ধি ধীশক্তি, যুক্তিতর্ক ও প্রতিভার প্রয়োগ ও ব্যবহার করে সদা ভাল কাজ করতে হবে, ন্যায় ও সত্য পথে চলতে হবে—তবেই জীবন সংগ্রামে জয়যুক্ত হওয়া সম্ভবপর হবে, অন্যথায় নয় ।

সূরা ফাতিহার দশম নির্দেশে উপরোল্লিখিত সরল, সহজ, ন্যায় ও সত্য পথ কোন্‌টা, তারই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে অতীতকালে আধ্যাত্মিক, নৈতিক, বৈজ্ঞানিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে যাঁরা সরল, সহজ, ন্যায় ও সত্য পথে চলে আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ লাভ করেছেন—ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে জয়যুক্ত হয়ে দুনিয়ার ইতিহাসে বিপ্লব সাধন করেছেন তাঁদের পথ, মত ও উপায় অনুসরণ করতে বলা হয়েছে এবং যারা স্বকীয় কর্মফলে আল্লাহ্‌র অভিশপ্ত এবং যারা বিপথগামী বা পথভ্রষ্ট হয়েছে তাদের দোষত্রুটি ও ভুল হতে শিক্ষা গ্রহণ করে জীবন সংগ্রামে পথভ্রষ্ট বা বিপথগামী অথবা চরম অভিশপ্ত বা ব্যর্থ মনোরথ না হবার কড়া সাবধানবাণী ঘোষণা করা হয়েছে । আমাদের অভিশপ্ত এবং পথভ্রষ্টদের পথে পরিচালিত করো না—এখানে ইহুদীদের অভিশপ্ত এবং খৃষ্টানদের পথভ্রষ্ট বলে অভিহিত করা হয়েছে । এ দু'টি ধর্মমত এবং জাতিই তখন প্রবল ছিলো । তাই উপমাস্বরূপ

www.pathagar.com

এদের লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে । ইহুদিগণ অন্ধভাবে খৃস্ট ও ইসলাম ধর্মকে অস্বীকার ও বিরোধিতা করে স্বকীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য সদা ব্যস্ত থাকত বলেই তাদের অভিশপ্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে । সত্যই আজ পর্যন্ত তারা দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি । দিনে অন্তত বত্রিশ বার এই আয়াত আবৃত্তি দ্বারা ইসলাম এই মহান শিক্ষাই আমাদের দেয় যে, অতীতে যারা স্বকীয় কর্মফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে তাদের পথ অনুসরণ করো না এবং বর্তমানেও কোন মত বা পথকে ইহুদীদের ন্যায় অন্ধভাবে স্বীকার অথবা বিরোধিতা করো না । তা করলে ইহুদীদের ন্যায় ধ্বংস অনিবার্য । অপরদিকে খৃষ্টানগণ যীশুখৃষ্টকে অন্ধভাবে বিশ্বাস ও ভক্তি করে তাঁকে স্রষ্টার পুত্রের স্থানে তুলে ধরে খৃস্ট ধর্মের মূল শিক্ষা ও আদর্শচ্যুত হলো । খৃস্ট ধর্মের প্রতি অন্ধবিশ্বাস থাকার ফলে ইসলামের মহান শিক্ষা তারা গ্রহণ করতে পারলো না— তাই তারা পথভ্রষ্ট, আদর্শচ্যুত । এত দ্বারা ইসলাম এই মহান শিক্ষাই দেয় যে, কোন মতকেই অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে নেই— এমনকি ইসলাম এবং আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকেও না । স্বকীয় জ্ঞান, বিবেক ও বিচারবুদ্ধি দ্বারা বিচার করে যদি মনে হয় ইসলাম সত্য ও খাঁটি পথের নির্দেশ দেয়—মানুষকে চিরন্তন সুখ ও শান্তির সন্ধান দেয় তবেই তিনি খাঁটি মুসলিম হতে পারেন । অন্যথায়, না বুঝে ইসলামে বিশ্বাস করার নির্দেশ কোথাও নেই । এ দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা বিচার করে কোন মত, পথ, উপায়, পদ্ধতি ও সন্ধানকে অন্ধভাবে অস্বীকার ও বিরোধিতা এবং ধর্মে অন্ধ বিশ্বাস করা যেমন অন্যায়, কোন বিশেষ আধুনিক মর্তবাদে অন্ধ বিশ্বাস এবং ধর্মে ও আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে অন্ধ অবিশ্বাসও ঠিক তেমনি দূষণীয় । এর কোনটাই মানব-কল্যাণকর নয় । সূরা ফাতিহার এ আয়াত আমাদের এই চরম শিক্ষা দেয় যে, জীবনে কিছুই অন্ধভাবে মেনে নেয়া অথবা অন্ধভাবে বিরোধিতা করা উচিত নয় । আবার এটা করতে গিয়ে যাতে খৃষ্টানদের ন্যায় ইসলামের মূল শিক্ষা ও আদর্শ হতে বিচ্যুত না হই সেদিকেও সবিশেষ নজর রাখতে হবে । তাই ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে সব ক্ষেত্রে, সব কাজে ও সব অবস্থায় স্বকীয় জ্ঞান, বিবেক ও বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ ও ব্যবহার করে সম্যক ও সত্যজ্ঞান লাভ করত ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে সরল, সহজ, ন্যায় ও সত্য পথে পরিচালিত করতে হবে । তবেই আমরা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের সব সমস্যার সুন্দর ও সুষ্ঠু সমাধান করতে সক্ষম হবো ।

সূরা ফাতিহার এই দশম শিক্ষা মানুষের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গিতে

www.pathagar.com

চরমতম বিপ্লব সাধন করে তাকে সুখ, শান্তি, উন্নতি, প্রগতি, সমৃদ্ধি, সাফল্য ও পূর্ণতাপ্রাপ্তির দিকে এগিয়ে নেয় । আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগী মানুষকে কাজ না করে ফলের প্রত্যাশা করায়, এই বলে যারা ধর্মকে দোষারোপ করেন তাদের ইসলামী সালাত সম্পর্কে কোন সঠিক ধারণা নেই । ইসলামিক ইবাদত কখনও মানুষকে কাজ না করে পুরস্কার পাওয়া যাবে বলে আশ্বাস দেয় না । আল্লাহ্‌র ইবাদতের মারফত বিশ্ব ও সৃষ্টির প্রতি মানুষের কর্তব্য পালনের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে । উবদিয়াত-এ-ইলাহী হলো খিদমত-এ-খালকের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব গড়ে তোলার উপায় মাত্র, একথা আগেই বলা হয়েছে । সুতরাং ইবাদতই শেষ নয়—এটা মানুষকে সৃষ্টির সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য কাজ করতে উৎসাহ ও প্রেরণা দেয় । ফাতিহাই ইসলামের ইবাদতের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এবং মূল অংশ। এর মূল এবং মুখ্য উদ্দেশ্য মানুষকে সরল, সহজ, ন্যায় ও কর্তব্য পথে পরিচালিত করা এবং ধীরে ধীরে সমগ্র মানবজাতি ও সৃষ্টিকে ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতির ভেতর দিয়ে চিরন্তন সুখ-শান্তি, উন্নতি, প্রগতি ও পূর্ণতা-প্রাপ্তির দিকে এগিয়ে নেয়া । সালাত সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যস্থলে পৌঁছার উপায় ও পথ নির্দেশ করে মাত্র । কোন বিশিষ্ট মত বা পথে ব্যক্তি ও সমাজ-জীবন পরিচালিত করার উগ্র ও তীব্র কামনাই আল্লাহ্‌র উপাসনার ভেতর প্রকাশ বা ব্যক্ত করা হয় । পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ্‌র ইবাদতকে মানুষের কঠোর চেষ্টা, সাধনা ও সংযম দ্বারা লব্ধ কাজের পুরস্কাররূপে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ 'সুতরাং রব তাদের ইবাদত কবুল করলেন এবং বললেন ঃ মেয়ে হোক বা পুরুষই হোক তোমাদের ভেতর আমি কারো কাজের অপব্যবহার করবো না' (৩ ঃ ১৯৪১) ।

নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা এবং কঠোর সাধনা ও সংগ্রাম ব্যতীত কোন উদ্দেশ্য হাসিল হবে না ঃ নিশ্চয় মানুষকে বিপদ-আপদ ও বাধা-বিঘ্নের সামনে টিকে থাকার জন্যই সৃজন করেছি (৯০ ঃ ৪)। এবং মানুষ যার জন্য কঠোর সাধনা ও সংগ্রাম করে তা-ছাড়া আর কিছুই পাবে না এবং তার চেষ্টা, সাধনা সংগ্রাম শীঘ্রই পরিলক্ষিত হবে; তখন সে পূর্ণতম পুরস্কৃত হবে' (৫৩ ঃ ৩৯-৪১)। 'আমার মানবগণ, তোমরা কর্মক্ষেত্রে কাজ করো, আমি একজন কর্মী' (৩৯ ঃ ৩৯)। যদি মানুষকে কাজ এবং তার জন্য নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা সাধনা ও সংগ্রাম করতেই হয়, তবে ইবাদতের প্রয়োজন কি ? এখানেও মানুষের কর্মক্ষমতা সম্পর্কে সম্যক ও সঠিক জ্ঞান না থাকার জন্য এ ধরনের

www.pathagar.com

প্রশ্ন মনে জাগে। নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা এবং কঠোর সাধনা ও সংগ্রাম সত্ত্বেও মানুষ ব্যর্থ মনোরথ হয় এবং নিজেকে সম্পূর্ণ নিঃসহায় মনে করে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র উপাসনা কর্মীকে নব উৎসাহ ও প্রেরণা দ্বারা উদ্বুদ্ধ করে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার মত শক্তি ও সাহস দান করে। যদিও তার জানা উপায় ও পদ্ধতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, যদিও চারদিকে বাধাবিঘ্ন এবং ঘোর অন্ধকার, যদিও তার স্বকীয় শক্তি নিঃশেষ হয়েছে, তবুও সে হতাশ হবে না, নিরাশ হবে না। কারণ সে বিশ্বাস করে যে, একজন আছেন যিনি সর্বশক্তিমান, যাঁর কাছে অসম্ভব কিছু নেই। তিনি চরম বিপদ এবং ঘোর অন্ধকারের ভেতরও আলোর রেশ আনতে পারেন এবং যিনি তার নিঃসহায় অবস্থায় উৎসাহ, শক্তি ও প্রেরণার চিরন্তন উৎস এবং তার সাহায্য দ্বারা এখনও যা আপাতঃদৃষ্টিতে অসম্ভব এবং অসাধ্য বলে মনে হচ্ছে তাও সে সাধন করতে সক্ষম হবে। এটাই ইবাদতের প্রধান কাজ এবং যখন সব উপায়, চেষ্টা ও সাধনা ব্যর্থ হয় তখন এটাই একমাত্র উপায় যার মারফত সে চরম হতাশা ও দুর্বলতার ভেতরও শক্তি, সাহস, প্রেরণা ও উৎসাহ লাভ করে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে সক্ষম হবে।

এটাই সালাতের প্রাথমিক কর্তব্য এবং এটাই যে মানুষকে বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট, শোক-তাপ ও বাধা-বিঘ্নে টিকে থাকার জন্য এবং লক্ষ্যস্থলে পৌঁছার জন্য অধিকতর শক্তি, সাহস ও মনের বলের উৎস, ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসেই তার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত রয়েছে। রসূলে করীম (সা) এবং তাঁর সাহাবাগণ সালাতে অটুট ও অটল বিশ্বাস স্থাপন করতেন এবং তাঁরা রাতের অর্ধেক, দুই-তৃতীয়াংশ বা এক-তৃতীয়াংশ সময় আল্লাহ্‌র ইবাদতে অতিবাহিত করতেন তবুও কাজের প্রতি তাঁদের আগ্রহের তুলনা হয় না, তাঁদের উৎসাহ এবং উদ্দীপনা ছিলো অফুরন্ত এবং তাঁরা লৌহের মতো কঠোর পণ ও প্রতিজ্ঞা নিয়ে চরমতম বিপদ-আপদ ও বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হয়েছেন। যাঁরা মাত্র দশ বছরের ভেতর পৃথিবীর অন্যতম দু'টি বৃহত্তম সাম্রাজ্য জয় করেছিলেন, যাঁরা সামান্যতম সৈন্য সম্পদ নিয়ে দ্বিগুণ, তিনগুণ এবং কখনও বা দশগুণ সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে যা-ই বলুন না কেন, তাঁদের অলস ও অযোগ্য বলা চলে না। এটা ঐতিহাসিক সত্য। যখনই মুসলমানগণ চরম বিপদ ও বাধা-বিঘ্নের সামনে উপস্থিত হয়েছেন, তখনই তাঁরা আল্লাহ্‌র সিজদায় রত হয়ে সর্বশক্তির উৎস সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কাছ

www.pathagar.com

থেকে শক্তি, সাহস, বল, ভরসা, উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। বস্তুত আল্লাহ্‌র ইবাদত অশিক্ষিত এবং অনুন্নত আরব জাতিকে এক সময় দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম জাতিতে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলো। সত্যি ইবাদত মানুষের ভেতরের সুপ্ত ও লুক্কায়িত জ্ঞান, ধীশক্তি ও প্রতিভাকে এমন বিকশিত ও উন্নত করে, যার তুলনা হয় না।

সালাত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আরও একটি কথা মনে পড়ে। কুরআনে কমপক্ষে বিরাশি বার সালাতের কথা উল্লেখ আছে এবং এর প্রত্যেক বার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সালাতের সাথে সাথে যাকাত আদায় করতে অথবা গরীবদের মাল বা সাহায্য দান করতে বলা হয়েছে। সালাতকে আদায় করতে বা পড়তে না বলে প্রত্যেক বার কায়েম করতে বলা হয়েছে। এদুটি বৈশিষ্ট্যের কথা আমাদের খুব গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার। প্রথম কায়েম শব্দটির অর্থ কি তা নিয়েই আলোচনা করা যাক। কোন প্রতিষ্ঠান বা মসজিদ কায়েম হতে পারে। কারণ কায়েম শব্দটির অর্থ কোন জিনিস বা বস্তুর স্থাপন হতে শুরু করে শেষ পর্যন্ত তা সদা স্থায়ী থাকবে। এর ভেতর ক্ষণিকের জন্য তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হলে তাকে কায়েম বলা চলে না। সুতরাং সালাতকে কায়েম বলা চলে কি করে ? সালাত ফজরে পাঠ করার পর জোহর পর্যন্ত অনেক সময় মাঝে থাকে। এমনি প্রতি ওয়াক্তের মাঝেই অনেক সময় আমরা সালাত পড়ি না। তবুও বার বার সালাতকে কায়েম করতে বলা হয়েছে। কেন ? এর তাৎপর্য কি ? সালাতের অপর একটি বৈশিষ্ট্য জামাত। জামাতে সালাত পড়ার বিশেষ তাগিদ রয়েছে। সালাতকে আমরা বর্তমানে নামায বলে অভিহিত করি। শুনলে হয়ত আশ্চর্যান্বিত হবেন যে, 'নামায' আরবী শব্দই নয় এবং কুরআনে এক বারও 'নামায' শব্দের উল্লেখ নেই। বস্তুত যেদিন হতে সালাতকে আমরা শুধু নামায অর্থাৎ ইবাদত করে ফেলেছি, সেদিন হতেই সালাতের সত্যিকার অর্থ ও তাৎপর্য হতে আমরা অনেক দূরে সরে পড়েছি। সেদিন হতে সালাতের প্রাণবন্তকে বাদ দেওয়া হয়েছে। সালাত সম্পর্কে আমাদের ধারণা পরিবর্তনের ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। নামায হলো একটি ফার্সী শব্দ একথা আগেই বলেছি। খোলাফায়ে রাশেদার পর হতেই মুসলিম শাসনকর্তাগণ ধীরে ধীরে ইসলামের আদর্শ হতে দূরে সরে যেতে থাকেন। উমাইয়াগণই প্রথম খিলাফত বা আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বমূলক সমাজ ও শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে ধীরে

সালাত কায়েম ও যাকাত দান

www.pathagar.com

ধীরে সুলতানাত বা রাজত্ব কায়েম করতে চেষ্টা করেন । আব্বাসিয়া বংশের সময় এটা আরও চরমরূপ ধারণ করে । আব্বাসিয়া খলীফাগণ—পারস্য সভ্যতা এবং কৃষ্টি দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত ছিলেন । তাই তাঁরা রাষ্ট্রের প্রতি কাজে সাধারণ আলেম বা মুসলমানদের হস্তক্ষেপ বরদাশত করতে পারতেন না । বস্তুত পারস্য সভ্যতা ও কৃষ্টি প্রভাবান্বিত আব্বাসিয়া খলীফাগণের আমলেই কলেমার ব্যাখ্যা করা হলো—এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মাবুদ বা উপাস্য নেই । এভাবে তাঁরা কলেমা এবং আল্লাহ্কে শুধু ইবাদত বা উপাসনার ভেতর সীমাবদ্ধ করলেন । আল্লাহ্র নিরানব্বইটি অতুলনীয় নামের ভেতর মাবুদ একটি হতে পারে । কিন্তু আল্লাহ্কে শুধু মাবুদ বা উপাস্য বললে আল্লাহ্র পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হলো না । দেহকে শুধু পা বললে যেমন ভুল হবে তেমনি আল্লাহ্কে শুধু তাঁর একটি বিশেষ গুণবাচক নামে সীমাবদ্ধ করলে ভুল করা হবে । আল্লাহ্ এমনিভাবে যখন শুধু ইবাদত বা আধ্যাত্মিক ব্যাপারে আটক হলেন, ঠিক তখন হতেই আস্তে আস্তে সালাতের পরিবর্তে নামায বা উপাসনা শব্দের প্রবর্তন হলো । নামায অর্থ আল্লাহ্র ইবাদত, প্রার্থনা বা উপাসনা । কিন্তু ইসলামের সালাত অর্থ শুধু উপাসনা বা প্রার্থনা নয়, আরও কিছু।

সালাতের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলেই এর সত্যিকার অর্থ ও তাৎপর্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে । সালাতে সমবেত হবার জন্য প্রতি ওয়াক্তে আযান দেয়া হয়, আহ্বান জানানো হয়—সবাইকে জামাতে শামিল হবার জন্য । সবাই একে একে এসে মসজিদে মিলিত হন । তারপর ব্যক্তিগত ইবাদত আদায় করার পর আবার ছোট আকামত বা আহ্বান জানানোর পর ফরয বা অবশ্য পালনীয় আল্লাহ্র প্রতি কর্তব্য ইবাদত সমবেতভাবে আদায় করা হয় । কেন এই জামাতে শামিল হওয়া ও মসজিদে সমবেত হওয়া ? আল্লাহ্র উপাসনা তো একা ঘরে বসেও করা চলে—তা সত্ত্বেও জামাতে সমবেত হওয়ার জন্য এত তাগিদ কেন ? কেন ? এমন কি তাৎপর্য এর পেছনে লুক্কায়িত রয়েছে ?

হযরত মুহম্মদ (সা)-এর সময় মদীনার মসজিদে কিভাবে জামাতে সালাত কায়েম করা হতো তা একটু গভীর মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করলেই আমরা সুস্পষ্ট বুঝতে পারবো সালাত—বিশেষ করে জামাতে সালাত কায়েম করার তাৎপর্য কি ? তখন দিনে পাঁচবার হযরত বেলাল (রা) মসজিদ থেকে

www.pathagar.com

আযান দিতেন এবং সবাই প্রতি ওয়াক্তে জামাতে সমবেত হতেন। কোন বিশেষ প্রয়োজন বা কারণ ব্যতীত কেউ অনুপস্থিত থাকতেন না। হঠাৎ কেউ অনুপস্থিত হলে তাঁর খোঁজ-খবর নেয়া হতো এবং তাঁর পাশের বাড়ির লোকের কাছে খোঁজ নিয়ে যদি জানা যেতো যে, ঝগড়ার জন্য আসতে পারেননি, তা হলে নামাযান্তে কাউকে গিয়ে ঝগড়া মেটাবার নির্দেশ দেওয়া হতো। যদি জানা যেতো কারো বাসায় খাবার নেই, তাহলে বায়তুলমাল হতে খাবার পাঠাবার ব্যবস্থা করা হতো। কারো কাপড় নেই জানা গেলে তাকে বায়তুলমাল হতে কাপড় দেওয়ার এন্তেজাম করা হতো। কারো অসুখের খবর পাওয়া গেলে—হেকিম ডেকে এবং ওষুধ-পথ্য দিয়ে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হতো। এরূপে মসজিদে উপস্থিত এবং অনুপস্থিত সবার খোঁজ-খবর নিয়ে তাদের সমস্ত অভাব-অনটন এবং বালা-মুসিবৎ দূর করার সুবন্দোবস্ত করে তারপর আবার ছোট আকামতে সবাইকে জামাতে সমবেত হবার জন্য আহ্বান জানানো হতো। এটাই আল্লাহ্‌র প্রতি অবশ্য পালনীয় ইবাদত বা ফরজ নামায। সুতরাং এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, সালাতের কয়েকটি অংশ আছে ঃ (১) জামাত (২) জামাতের সবার খোঁজ-খবর নেয়া এবং (৩) সকলের অভাব-অনটন ও বালা-মুসিবৎ দূর করার এন্তেজাম করে সবার সমষ্টিগত উন্নতি ও কল্যাণ সাধনে ব্রতী হওয়া এবং নামায বা আল্লাহ্‌র ইবাদত আদায় করা। প্রথম তিনটি অংশ হলো হক্কুল এবাদ—মানুষের প্রতি কর্তব্য এবং শেষটি হলো হক্কুল্লাহ্—আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্য। ইসলামের নির্দেশ মোতাবেক প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য দু'রকমের—হক্কুল্লাহ্ ও হক্কুল-এবাদ, একথা আগেই আলোচনা করেছি। ইসলামের প্রতি নির্দেশে, প্রতিটি কাজের ভেতর এই মর্মবাণীই ফুটে উঠেছে।

এখানে আরও একটি বিষয় সবিশেষ লক্ষ্য করা দরকার। প্রত্যেক মানুষের অভাব-অনটন, দুঃখ-কষ্ট, বালা-মুসিবত সম্পর্কে দিনে পাঁচবার খোঁজ-খবর নিয়ে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হলে—চাই তহবিল। তা-না হলে সালাতের প্রথম অংশ অর্থাৎ মানুষ বা জীবের প্রতি কর্তব্য পালন করা সম্ভবপর হবে না। এ কারণে কুরআনে প্রত্যেক ক্ষেত্রে সালাতের সাথে সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যাকাত দান করার কথা উল্লেখ আছে। যাকাত আদায় করে যে বায়তুলমাল বা জাতীয় তহবিল হবে তারই এক অংশ প্রত্যেক মসজিদের সাথে যুক্ত থাকবে। প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা যাকাত আদায়

www.pathagar.com

হতে পারে । একবার চিন্তা করে দেখুন বছর বছর যদি যাকাত আদায় করে প্রত্যেক মসজিদের তহবিলে জমা থাকত এবং প্রতি দিনে পাঁচবার উপস্থিত এবং অনুপস্থিত সবার খোঁজ-খবর নিয়ে তাদের অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্ট অবসানের এন্তেজাম করা হতো তাহলে কারো কোন অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্ট থাকতো না ।

আজকাল মানুষকে যতই নামায পড়তে বলা হয়, ততই দিন দিন বেনামাযীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। দিনে পাঁচবার তো দূরের কথা সপ্তাহে একবারও মসজিদে সবাই সমবেত হয় না । মানুষ পেটের চিন্তায় এতই ব্যস্ত যেন এসব কথা তাদের কানেই ঢুকতে চায় না । আমরা মুখে বলি মুসলিম ভাই-ভাই—ইসলামের প্রেম, সাম্য, বিশ্বভ্রাতৃত্ব এবং সমাজতন্ত্রের কথা । কিন্তু চোখের সামনে কুকুর-বিড়ালের মতো এক মুঠো খাওয়ার অভাবে, এক ফোঁটা ওষুধের অভাবে, সামান্য একটু পথ্যের অভাবে কতলোক মারা যাচ্ছে, সেদিকে কেউ ভ্রূক্ষেপও করে না, সেদিকে কেউ ফিরেও তাকায় না । একই জামাতে নামায পড়ি এবং সূরা ফাতিহার যে ধরনের ব্যাখ্যা আমরা আগে করেছি তা প্রতি রাকাতে আবৃত্তি করি ; আর সেখান হতে বের হয়েই কার সর্বনাশ করে, কাকে ফাঁকি দিয়ে এবং ঠকিয়ে নিজে বড় হতে পারবো সদা সর্বদা তারই প্রচেষ্টা । এমনি করে নামায পড়ার অর্থ শুধু আল্লাহ্‌কে ফাঁকি দেবার প্রচেষ্টা । মানুষ কি আল্লাহ্‌কে ফাঁকি দিতে পারে ? আল্লাহ্‌কে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করে সে নিজেই প্রবঞ্চিত হয় । তাই সালাত কায়েম করার অর্থ—এর প্রথম ও দ্বিতীয় দুটি অংশই পুরোপুরি পালন করতে হবে । এ জন্য যাকাত দেবার উপযুক্ত সবাইকে যাকাত দিতে হবে এবং যাকাত দ্বারা গঠিত তহবিল হতে প্রতি দিন পাঁচবার—প্রত্যেক অঞ্চলের মসজিদে উপস্থিত অনুপস্থিত সবার খোঁজ-খবর নিয়ে তাদের দুঃখ-কষ্ট এবং অভাব-অনটন মোচনের এন্তেজাম করতে হবে । অতপর নামায বা আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্য আদায়ের পর মসজিদের এন্তেজাম অনুযায়ী ঘরে ঘরে সবার সব অভাব, সব অনটন, সব দুঃখ, সব কষ্টের মোচন করার প্রয়াস পেতে হবে । অপর দিকে সবাই আল্লাহ্‌র কাছে সরল, সহজ, ন্যায় ও সত্য পথে চলার প্রতিজ্ঞা করে পরের ওয়াক্ত পর্যন্ত প্রতিনিয়ত এ কথা স্মরণ করে নিজেকে অন্যায় হতে, অধর্ম হতে, অসত্য, মন্দ কাজ এবং অপরের অকল্যাণকর কোন কাজ হতে দূরে রাখতে হবে । স্রষ্টার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাঁর প্রতিভূ হিসাবে সে প্রতি কাজ, প্রতি কথা, প্রতি চিন্তা সমগ্র মানব-জাতি এবং সৃষ্টির সমষ্টিগত কল্যাণ, উন্নতি, প্রগতি এবং

www.pathagar.com

চিরন্তন সুখ ও শান্তির জন্য নিয়োজিত করবে।

মানুষ সহজে কর্তব্য বিচ্যুত হয় বলেই দিনে পাঁচবার নামাযের মারফত তাকে কর্তব্য কাজে উদ্বুদ্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমগ্র সমাজ ও মানব-জাতির প্রতি কর্তব্য হতে যাতে মানুষ দূরে সরে না পড়ে, তার জন্য জামাতে সালাত কায়েম করতে তাগিদ রয়েছে। একবার ক্ষণিকের জন্য চিন্তা করুন যে, সমগ্র মানব-জাতির পূর্ণ বিকাশ এবং সৃষ্টির সমষ্টিগত কল্যাণের ব্রত নিয়ে যদি এমনিভাবে দিনে পাঁচবার বিভিন্ন মসজিদে সমবেত হয়ে সবাই সবার খোঁজ-খবর নেয়, দুস্থ ও অভাবগ্রস্তদের সাহায্য দানের আয়োজন করে এবং স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সবাই অন্যায় ও খারাপ কাজ হতে বিরত থেকে আল্লাহ্‌র প্রতিভূ হিসাবে দুনিয়ার উপর তার মহান কর্তব্য বিশ্ব বা সৃষ্টির সমষ্টিগত কল্যাণে ব্যস্ত থাকে তা হলে দুনিয়া হতে সমস্ত বিবাদ-বিসম্বাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, সংঘাত-সংঘর্ষ, অভাব-অনটন, দুঃখ-কষ্ট চিরতরে অবসান হবে এবং দুনিয়ায় চরম সুখ, চিরন্তন ও চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এ জামাতকে গ্রামের জনসভায় পরিণত করা চলে এবং সমস্ত বিষয়ে দিনে পাঁচবার আলাপ-আলোচনা করে সব সমস্যার সমাধান করা অতি সহজ। এরূপ মহল্লা বা গ্রাম্য পার্লামেন্ট দিনে পাঁচবার বসে সব সমস্যা ও সংঘাতের সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাধান করে মহল্লা বা গ্রামে সত্যিকার এবং স্থায়ী সুখ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে। বস্তুত মসজিদগুলি আগেকার দিনে মুসলমানদের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, প্রত্যেক ব্যাপারের কেন্দ্র ছিল। এমনকি ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক বিষয়েও মসজিদে আলাপ-আলোচনা হতো। প্রতি সপ্তাহে শুক্রবার মসজিদে খুৎবার ভেতর দিয়ে ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে জনসাধারণকে উপদেশ ও নির্দেশ দেওয়ার প্রথা ছিল এবং এখনও সে প্রথা প্রচলিত আছে, কিন্তু তার সত্যিকার অর্থ ও তাৎপর্য আমাদের জানা নেই। এখন আর এটা মুসলমানদের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক—এক কথায় জীবনের প্রতি দিকে জনসাধারণকে শিক্ষা, উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়ে উন্নতি ও প্রগতির পথে এগিয়ে চলার নির্দেশ দান করে না। এখন এটা নেহায়েত আনুষ্ঠানিকভাবেই পাঠ করা হয়। আজকাল অধিকাংশ মসজিদের ইমাম সমাজ ও শরীয়তের সত্যিকার ইমাম বা নেতা নন। তাঁদের সে যোগ্যতাও নেই। তাই মসজিদগুলি পুনর্গঠনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক

www.pathagar.com

মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট বায়তুলমাল হতে উপযুক্ত বেতন দিয়ে উপযুক্ত ও যোগ্য ব্যক্তিদের ইমাম নিযুক্ত করতে হবে। তাঁরা দিনে পাঁচবার জামাতে সমবেত প্রত্যেক মুসলমানকে আধ্যাত্মিক, নৈতিক, বৈজ্ঞানিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ব্যাপারে শিক্ষা দান করবেন। এমনি করে মসজিদগুলিকে মুসলমানদের শিক্ষা ও সাফল্যের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। বস্তুত মসজিদই হবে ইসলামের প্রাণকেন্দ্র। এখান হতে তাঁরা দিনে পাঁচবার উৎসাহ, প্রেরণা ও শিক্ষা গ্রহণ করে তাদের ব্যক্তি ও সমাজ-জীবন এমনভাবে গড়ে তুলবে যার তুলনা হয় না।

যথাসময়ে ভাল করে ওযু করে দিনে পাঁচবার সালাত কায়েম করলে এবং সদা সর্বদা সৎচিন্তা ও সৎ কাজে মগ্ন থাকলে মন প্রফুল্ল থাকে, স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, স্মরণশক্তি ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়—এক কথায় মানুষের দেহ, মন, আত্মা ও মস্তিষ্কের চরম উন্নতি ও পূর্ণ বিকাশের পক্ষে সালাত সব চেয়ে শক্তিশালী উপায়। মানুষের কর্মব্যস্ত জীবনের ভেতর নামায স্বাস্থ্যকর বিশ্রাম এবং এটা অবিরাম পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে। এটা খুব সহজ এবং স্বাভাবিক ব্যায়ামের কাজ করে এবং মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির সাথে স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করে। অটল বিশ্বাস এবং গভীর মনোনিবেশসহ কিছুদিন শুধু নামায পড়লেই এসব উন্নতির লক্ষণ ব্যক্তিগত জীবনেও সুস্পষ্ট বোঝা যাবে। এর অন্যথা হবে না, হতে পারে না—এ আমি জোর করে বলতে পারি। আর সত্যিকার সালাত কায়েম করতে পারলে মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে যে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আসবে সে কথা বলাই বাহুল্য।

সালাতের আলোচনা শেষ করার আগে আযান সম্পর্কে কিছু না বললে চলে না। ভোর বেলায় ঘুম থেকে উঠে সবাই শুনতে পায় মধুর কণ্ঠে সালাতে সমবেত হবার আহ্বান ঃ "শান্তি এবং নিরাপত্তার দিকে এসো, শান্তি এবং নিরাপত্তার দিকে এসো, সাফল্যের দিকে এসো, সাফল্যের দিকে এসো।" দিনে পাঁচবার এমনি পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহ্‌র ডাক আমাদের কানে ভেসে আসে—শান্তি, নিরাপত্তা এবং সাফল্যের পথে এগিয়ে চলার জন্য। সত্যিকার মানবদরদী ও শান্তিকামী কেউ এ ডাকে সাড়া না দিয়ে পারে ? উপরোল্লিখিত সালাতের সংক্ষিপ্ত আলোচনা হতে একথা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সালাতের ভেতরই মানবের সত্যিকার সুখ, শান্তি, নিরাপত্তা, কল্যাণ, উন্নতি, প্রগতি, সমৃদ্ধি, সাফল্য ও পূর্ণতা-প্রাপ্তির সন্ধান রয়েছে।

www.pathagar.com

যাকাত দান

যাকাত দান সম্পর্কে আগে যে আলোচনা করা হয়েছে তাতেই একথা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামে সালাত কায়েমের পরই যাকাত দান করার নির্দেশ রয়েছে । বস্তুত যাকাত দান ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ । কুরআনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথমেই যে একবার উল্লেখ আছে তাও আমরা দেখেছি—এখানে ইসলামের মূলনীতিগুলি অতি সংক্ষেপে দেওয়া আছে । আল্লাহ্‌র উপর, প্রত্যাদেশে এবং পরকালে বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশই প্রথম দেওয়া হয়েছে এবং বাস্তব জীবনে আমল করার জন্য সালাত কায়েম এবং আল্লাহ্‌র দেওয়া সম্পদ বিশ্ব ও সৃষ্টির সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য ব্যয় করতে বলা হয়েছে । সালাত যে স্বকীয় অন্তরে আল্লাহ্‌র অনুভূতি লাভ করার এবং মানুষের প্রতি কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ হবার উপায়, একথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে । আল্লাহ্‌ প্রদত্ত সম্পদ বিশ্ব বা সৃষ্টির সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য ব্যয় করা এবং যে কোন ভাল কাজ করার কথাই শেষে বলা হয়েছে । কারণ আল্লাহ্‌ মানুষকে শুধু প্রাকৃতিক সম্পদই দান করেননি । এই প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার দ্বারা সৃষ্টির সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য তাকে জ্ঞান, বিবেক, বিচারবুদ্ধি, ধীশক্তি, প্রতিভা এবং কর্মক্ষমতাও দান করেছেন ।

মানুষের ও সৃষ্টির কল্যাণকর কাজ করার নির্দেশ পবিত্র কুরআনে বার বার দেওয়া হয়েছে । ইহুদী ও খৃষ্টানদের কতকগুলি গোঁড়ামি ও অন্ধবিশ্বাসের উপর মানবের মুক্তি ও পূর্ণতা-প্রাপ্তির দাবি করার জবাবে পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ 'এবং তারা বলে, ইহুদী অথবা খৃষ্টান ছাড়া আর কেউ বেহশ্‌তবাসী হবে না । এটা তাদের বৃথা আস্ফালন, বল, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তা হলে এর প্রমাণ দাও ! যে আল্লাহ্‌র উপর সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে এবং অপরের কল্যাণকর কাজ করে, সেই আল্লাহ্‌ দ্বারা পুরস্কৃত হবে, তাদের জন্য কোন ভয় বা ক্ষোভ নেই (২,১১১,১১২)। আল্লাহ্‌র উপর আত্মসমর্পণের নির্দেশ বস্তুত সালাত কায়েম করারই নির্দেশ এবং মানব-কল্যাণকর কাজ করার নির্দেশই হলো আল্লাহ্‌ প্রদত্ত ধনসম্পদ সবার

www.pathagar.com

সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য ব্যয় করার নির্দেশ। সুতরাং সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আল্লাহ্‌র উপর, প্রত্যাদেশের উপর এবং পরকালের উপর বিশ্বাস এবং সালাতের মারফত আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব স্বকীয় হৃদয়ে উপলব্ধি করা এবং আল্লাহ্‌র কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা এবং ধনসম্পদ দান করে মানব-সেবা করাই ইসলামের মূল শিক্ষা। পবিত্র কুরআনে ও হাদীসে ইসলাম সম্পর্কে যা-কিছু বিধিনিষেধ রয়েছে, সব কিছুর ভিত্তি এর উপর। বস্তুত সালাত মানব-সেবার মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার উপায় মাত্র। সালাতের ভেতর দিয়ে জীবনে বিশ্ব পালনের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে না উঠলে সালাতের মুখ্য উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতিলাভের প্রথম পিঁড়িই হলো সালাত, কিন্তু সালাতের কোন অর্থই হয় না যদি এর ভেতর দিয়ে আল্লাহ্‌র অনুভূতি হৃদয়ে না হয় এবং আল্লাহ্‌র অনুভূতি যদি মানুষকে আল্লাহ্‌র খলীফা হিসাবে দুনিয়ার উপর তার প্রথম এবং প্রধান কাজ রবুবিয়াৎ বা বিশ্বপালন ও মানব-কল্যাণের জন্য উদ্বুদ্ধ না করে। সুতরাং সালাত কায়েম হলো প্রথম স্তর এবং এটা দ্বিতীয় স্তর অর্থাৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সবার সমষ্টিগত কল্যাণের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। অন্যত্র স্পষ্ট বলা হয়েছে ঃ 'যারা সালাতের প্রতি অমনোযোগী, সালাতকে লোক দেখানো বাহ্যিক আড়ম্বররূপে মনে করে এবং যাকাত দান হতে বিরত থাকে, তারাই অভিশপ্ত' (১০৭ ঃ ৪-৭)।

সাহায্য দানের আরবী শব্দ 'সাদাকা'। 'সাদাকা' শব্দটি 'সিদক' হতে উৎপত্তি। 'সিদক' শব্দের অর্থ সত্য। কিন্তু সাদাকা সাধারণত সাহায্য দানকেই বোঝায়। কুরআনে সাহায্য দানকে 'ইনফাক' অর্থাৎ দয়া পরবশ হয়ে ব্যয় করা, 'ইহসান' অর্থাৎ ভাল কাজ করা এবং যাকাত অর্থাৎ বৃদ্ধি এবং পবিত্রকরণ বা বিশুদ্ধকরণ বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনে ব্যবহৃত এসব শব্দ হতেই সাদাকার অর্থ ও তাৎপর্যের ব্যাপকতা সুস্পষ্ট বোঝা যায়। ক্রীতদাসের মুক্তি (৯০ ঃ ১৩, ২ ঃ ১৭৭); অক্ষমদের খাবার দান (৬৯ঃ৩৪; ৯০ঃ১১-১৬; ১০৭; ১-৩), অনাথদের রক্ষণাবেক্ষণ করা (১৭ঃ৩৪; ৭৬ঃ৮; ৮৯ঃ১৭; ৯০ঃ১৫; ৯৩ঃ৯ ; ১০৭ঃ২) এবং সাধারণভাবে মানব-কল্যাণকর কাজ করার উপর জোর দিয়েই ক্ষান্ত না হয়ে ইসলাম খুঁটিনাটি সমাজ-হিতৈষণার কাজের উপরও সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। বস্তুত খুঁটিনাটি সমাজ ও মানব কল্যাণকর কাজ না করা আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্যে অবহেলা করারই নামান্তর। মা-বাপের প্রতি ভাল ব্যবহার করা এবং ভাল

www.pathagar.com

কথা বলাকে 'ইহসান' (১৭ঃ২৩), এবং যে কোন ভাল কথা বলাকেই সাধারণত সাদাকা বলে উল্লেখ করা হয়েছে (২ঃ৮৩; ৪ঃ৮), হাদীসে এ সম্পর্কে আরও সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে ; পথে যা-কিছু কাউকে আহত করতে পারে তা সরানোই সাদাকা (বুখারী ৪৬,২৪)। প্রত্যেক অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে সাদাকা নিহিত রয়েছে ; একজন মানুষ অপরকে ঘোড়দৌড় শিখতে সাহায্য করাও সাদাকা, অথবা কাউকে জন্তুর উপর মাল বোঝাই করতে সাহায্য করাও সাদাকা এবং তেমনি ভাল কথাও এবং সালাত কায়েম করার পথে মানুষ যে পদক্ষেপ ফেলে তার প্রতি পদক্ষেপেই সাদাকা এবং কাউকে পথ দেখানো সাদাকা (বুখারী ৫৬ঃ৭২, ১২৮)। এমনকি কাউকে অভিবাদন জানানো এবং ন্যায় কাজ করা এবং অন্যায় হতে বিরত করাও সাদাকা। নিজের স্ত্রী, চাকর-চাকরানী ও সন্তান-সন্ততিকে খাবার দেওয়াও সাদাকা। নিজের ভরণ-পোষণ করাও সাদাকার অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র কুরআনে শুধু মুসলিম অমুসলিম সমগ্র মানবের জন্য নয় (২ঃ২৭২), সমগ্র সৃষ্টির প্রতি সাদাকা দান বা পালন করতে বলা হয়েছে।

সাদাকা দু'রকমের ঃ স্বেচ্ছাকৃত এবং বাধ্যতামূলক। পবিত্র কুরআনে স্বেচ্ছাকৃত সাদাকা বা সাহায্যদানকে 'ইনফাক' অথবা 'ইহসান' অথবা 'সাদকা' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে সাহায্যদানকে বীজ রোপণের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে ঃ 'আল্লাহ্‌র পথে যারা মালদান করে তাদেরকে উপমাস্বরূপ কোন বীজ সাতটি শীষ এবং প্রত্যেক শীষে আবার একশো বীজ উৎপন্ন হওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে (২ঃ২৬১)। বাধ্যতামূলক দানকে যাকাত বলা হয়। অনেক ক্ষেত্রে এটাকে সাদাকা বলেও বর্ণনা করা হয়েছে। 'যাকা' (বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়েছিলো) শব্দ হতেই যাকাত শব্দের উৎপত্তি। এটা কুরআনে বিশুদ্ধিকরণ অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। রসূলে করীম (সা) তাঁর উম্মতদের পবিত্রকরণ (২ঃ১২৯, ১৫১, ৩ঃ১৬৩, ৯ঃ১০৩, ৪২ঃ২) এবং আত্মার বিশুদ্ধিকরণই জীবন সংগ্রামে প্রকৃত জয় বলে বর্ণনা করেছেন (৯১ঃ৯, ৯২ঃ১৮)। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ 'এবং আমরা তাঁকে শৈশবাবস্থায়ই জ্ঞান, কোমলতা এবং যাকাত বা পবিত্রতা দান করেছিলাম' (১৯ ঃ ১২, ১৩)। অন্যত্র একজন শিশুকে 'পবিত্রতায় অধিকতর ভালো' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আত্মার পবিত্রতা জীবন সংগ্রামের সাফল্য এবং মানুষের শক্তি ও ক্ষমতার বিকাশ পরস্পর পরস্পরের সাথে জড়িত। রাঘিবের মতে,

www.pathagar.com

যাকাত সক্ষমদের কাছ থেকে আদায় এবং অক্ষমদের ভেতর বিতরণ করা হয়। এটা ধনসম্পদ বৃদ্ধি করে ও ধনসম্পদ বিতরণ আবার আত্মার চরম বিকাশে সহায়তা করে বলেই এটাকে যাকাত বলা হয়। ব্যক্তিগতভাবে এটা অক্ষম বা সম্পদহীনদের উপকার করে এবং সমষ্টিগতভাবে গোটা সমাজের ধনসম্পদ বৃদ্ধি করে। আর সাথে সাথে দাতার আত্মাকে বিশুদ্ধ ও বিকাশ সাধনে সহায়তা করে। বস্তুত ধন-সম্পদ মানুষের জীবনে নিয়ে আসে চরম স্বার্থপরতা। এটাই জীবনকে পাপ ও খারাপ কাজে উদ্বুদ্ধ করে। স্বার্থপরতা ও লোভ সংবরণ করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিছক কর্তব্য হিসাবে স্বকীয় ধন-সম্পদ হতে সাহায্য দান করাতে আত্মা উন্নত ও বিকশিত হয়।

যাকাত দান ধন-সম্পদের প্রতি লোভ এবং ধন-সম্পদ জমা ও কেন্দ্রীভূত করার প্রবৃত্তিকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত এবং অক্ষম বা সম্পদহীনদের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে মানুষকে সজাগ ও সচেতন করে। ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগতভাবে বাঁচার ও বিকাশ লাভ করার জন্য সমাজের প্রত্যেকের সবচেয়ে কম প্রয়োজন মেটানোর জন্য সক্ষম ও সম্পদশালীদের উদ্বুদ্ধ করে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ "যা তোমার প্রিয় তা অকাতরে দান করতে না পারলে তুমি কোন মতেই মুত্তাকিন হতে পারবে না এবং সত্যের খাতিরে তুমি যা-কিছু দান কর আল্লাহ্ তা জানেন।"

ধন-সম্পদ মানুষের খুবই প্রিয়। তা অকাতরে সমাজের সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য ব্যয় ও বিতরণ করতে না পারলে সমগ্র মানবজাতি, প্রগতি, কল্যাণ ও ক্রমবিকাশের পথে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে না। আইন প্রণয়ন, পুলিশ, সরকার বা সামরিক বাহিনীর ভয় মানুষকে এমন সহজ ও স্বাভাবিকভাবে সবার কল্যাণের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হবে না। যাকাত দানকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সালাত কায়েমের সাথে সাথে কুরআনে উল্লেখ করার সত্যিকার অর্থ ও তাৎপর্য—আমরা আগেই আলোচনা করেছি। বস্তুত স্রষ্টার নির্দেশ ও সৃষ্টির উদ্দেশ্য সামনে রেখে ধনসম্পদ মানব কল্যাণকর কাজে ব্যয় ও বিতরণ নৈতিক চরিত্র গঠনে সহায়তা করে।

মানুষের গড়া পরিবেশ ও সমাজ-বিধানে মানুষ সমান সুযোগ-সুবিধা না পাওয়ার দরুন ধনসম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কুক্ষিগত হয়ে থাকে। ধনসম্পদ কুক্ষিগত ও কেন্দ্রীভূত করার এই আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর প্রবৃত্তি যাকাত দানের মারফত পবিত্র ও বিশুদ্ধ হয় এবং মানুষকে সমাজের সমষ্টিগত

www.pathagar.com

কল্যাণের জন্য ধন-সম্পদ ব্যয় ও বিতরণ করতে উদ্বুদ্ধ করে । যাকাত সক্ষম ও সম্পদশালীর কাছ থেকে তাদের দেহ, মন, আত্মা ও মস্তিষ্কের উন্নতি, প্রগতি, ক্রমবিকাশ ও পূর্ণতা-প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ নিয়ে অক্ষম ও সম্পদহীনদের ভেতর বিতরণ করে এবং এমনি করে সমাজের প্রতিটি লোককে বাঁচার ও বিকাশ লাভ করার জন্য তার ন্যূনতম প্রয়োজন সরবরাহ করে । ধন-সম্পদ উপার্জন ও গচ্ছিত রাখাই জীবনের চরম উদ্দেশ্য নয় । জীবনের মূল ও মুখ্য উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে সমগ্র মানব-জাতির কল্যাণ, উন্নতি, প্রগতি, ক্রমবিকাশ ও পূর্ণতা-প্রাপ্তি । ইসলাম উৎপাদনমূলক উপার্জন সমর্থন করে এবং বিশ্বাস করে এটা সমগ্র সমাজ ও মানবগোষ্ঠীর ধনসম্পদ বৃদ্ধি করে । আরো উপার্জন করতে উৎসাহ দিয়ে পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেছে ঃ 'এবং ইবাদত (আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্য) শেষ হবার সাথে সাথেই দুনিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহ্‌র অফুরন্ত দান অন্বেষণ করো এবং যাতে তোমরা সমৃদ্ধিশালী হতে পারো তার জন্য সদাসর্বদা আল্লাহ্‌র প্রশংসা করো' (৬২ঃ১০)। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌র দেয়া অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ সংগ্রহ ও সদ্ব্যবহার করার এত অধিকবার তাগিদ রয়েছে যে, রসূলে করীম (সা) মুসলমানদের প্রতি এটাকে সালাত কায়েমের পরেই গুরুত্ব দান করেছেন । আল্লাহ্‌র রসূল বলেছেন ঃ 'সালাত কায়েমের পরেই সৎ উপায়ে অর্থ উপার্জনের গুরুত্ব ।'

প্রত্যেককেই কাজ করতে হবে, প্রত্যেককেই অর্থ উপার্জন করতে হবে, প্রত্যেককেই ধনসম্পদ বৃদ্ধি করতে হবে । এভাবে সমাজের প্রত্যেককেই যথাসাধ্য ধনসম্পদ বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করার পরের কর্তব্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ 'এবং তাদের ধন-সম্পদের ভেতর যে প্রার্থনা করে এবং যার প্রয়োজন আছে তারই অংশ রয়েছে' (৫১ঃ১৯)। সমাজে সবার পরিশ্রমলব্ধ ধন-সম্পদের উপর সবারই অংশ রয়েছে । সবাই সৎ উপায়ে উপার্জিত ধন-সম্পদ প্রয়োজন মতো দাবি করতে পারে এবং দাবি করলেই সেও অংশীদার হয়ে গেলো । কিন্তু পরক্ষণেই সাবধান করা হয়েছে যার প্রয়োজন আছে কেবল সেই দাবি করতে পারে অপর কেউ নয় । এ দ্বারা একথা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত কেউ দাবি করতে না পারে তা হলে কেউ উপার্জন করেছে বলেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করতেও পারে না । বস্তুত সৎ উপায়ে উপার্জন করতে বলা হয়েছে সমগ্র সমাজ ও মানবগোষ্ঠীর ধনসম্পদ বৃদ্ধি করে সবার সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য ।

www.pathagar.com

সুতরাং আল্লাহ্‌র দেয়া প্রাকৃতিক সম্পদ এবং তা হতে মানুষের পরিশ্রমলব্ধ আয়-উপার্জন সমষ্টিগত কল্যাণের জন্যই ব্যয় ও বিতরণ করতে হবে । যাদের নেহায়েত না হলেই নয়, তাদের প্রয়োজনই মেটাতে হবে । নেহায়েত প্রয়োজন না হলে কাউকে জাতীয় তহবিল হতে সাহায্য দান করা হবে না । কেউ সাহায্য দাবি করলেই রসূলে করীম (সা) তার পা হতে মাথা পর্যন্ত ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে তাকে সাহায্য গ্রহণ করতে নিষেধ করতেন এবং নিজের চেষ্টা দ্বারা ও সৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করতে বলতেন । হযরত সাঈদ খুদরী সাহায্য দাবি করলে রসূলে করীম (সা) বলেন ঃ 'যদি সে আত্মনির্ভরশীল হয়, তাহলে আল্লাহ্‌তা'আলা তাকে প্রাচুর্য দান করবেন ।' যদি কোন ব্যক্তি অপরের সাহায্য দাবি হতে বিরত থাকে তাহলে আল্লাহ্‌ তাকে বিপদগ্রস্ত না করে তার ইজ্জত ও মর্যাদা রক্ষা করবেন । রসূলে করীম (সা) নিষ্ক্রিয়তা, শ্রমবিমুখতা ও অলসতাকে ঘৃণা করতেন । তিনি পরের কাছে সাহায্য দাবি করা মর্যাদাহানিকর মনে করতেন এবং সদাসর্বদা আত্মনির্ভরশীল হবার শিক্ষা দিতেন ঃ 'উপরের হাত অথবা দাতার হাত, নীচের হাত অথবা দান গৃহীতার হাত হতে শ্রেয় ।' অন্যত্র তিনি বলেছেন ঃ "তিন প্রকার হাত আছে, সবার উপরের হাত আল্লাহ্‌র । তারপরই দাতার হাত । সব চেয়ে নীচের হাত হলো ভিক্ষুকের । শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত এরূপই চলবে । সুতরাং সাধ্যমত অপরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা হতে বিরত থাকো । নিজের জীবিকা অর্জন করতে কখনও এবং কোন অবস্থাতেই ক্লান্ত এবং হতাশ হইও না ।" যাকাত দান করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার সাথে সাথেই যাতে যাদের বিশেষ প্রয়োজন, শুধু তারাই এটা চায় এবং পায় তার উপরও সবিশেষ জোর দেয়া হয়েছে ।

এটা হতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম ব্যষ্টি ও সমষ্টির কল্যাণের ভেতর কোনরূপ বিরোধ সৃষ্টি করে না । কুরআনে বার বার আল্লাহ্‌তা'আলা প্রদত্ত প্রাকৃতিক সম্পদ সংগ্রহ ও সদ্ব্যবহার করতে বলা হয়েছে সমগ্র মানব-জাতির কল্যাণের জন্য—এমনকি শুধু মুসলমান জাতির সম্পদ বৃদ্ধির কথাও কোথাও উল্লেখ নেই । যাকাত দান হবে সবার সমষ্টিগত কল্যাণের এবং সমগ্র মানব-জাতির সম্পদ বৃদ্ধি ও আত্মার বিশুদ্ধিকরণের জন্য । সমগ্র মানব-জাতির আত্মার বিশুদ্ধিকরণ অর্থ প্রত্যেক মানুষই এমনভাবে গড়ে উঠবে যাতে তারা সদা সর্বদা আল্লাহ্‌তা'আলার প্রশংসা করে এবং তার কথা স্মরণ করে

www.pathagar.com

দুনিয়ার উপর তাঁর উদ্দেশ্য বিশ্বপালনের কাজে সদা আত্মনিয়োগ করে । তার মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি এমন হবে যেন সে আপনা হতেই তার দেহ, মন, আত্মা ও মস্তিষ্কের পূর্ণতম বিকাশের জন্য যতটা প্রয়োজন ততটাই ব্যয় করে বাকি সবটা প্রয়োজনবোধে স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে সবার সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য খরচ করে । আর সবটা সবার সব প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রয়োজন না হলে প্রয়োজন মতো যাকাত দান করার পর বাকিটা ধন-সম্পদ বৃদ্ধির জন্য নিয়োজিত করবে । কোন মতেই তার ধন-সম্পদ সে গচ্ছিত রাখবে না । যারা ধন-সম্পদ গচ্ছিত রাখে ও গণনা করে এবং মনে করে যে, তাদের গচ্ছিত ধন-সম্পদই তাদেরকে স্থায়ী সুখ ও শান্তি দান করবে, তাদের সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে যে, ধন-সম্পদ তাদের স্থায়ী সুখ ও শান্তি দান করবে না; বরং এটা তাদের চরম বিপর্যয়ের ভেতর ফেলবে ।

মুষ্টিমেয় লোকের হাতে ধন-সম্পদ কেন্দ্রীভূত ও গচ্ছিত থাকলে সমাজের সবার ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হবে না । সবার দেহ, মন, আত্মা ও মস্তিষ্কের চরম উন্নতি ও বিকাশও সম্ভব হবে না । স্রষ্টা প্রদত্ত প্রাকৃতিক সম্পদ সবাই সংগ্রহ ও সদ্ব্যবহার করার জন্য আত্মনিয়োগ করতে সক্ষম হবে না । ফলে মানুষের সমষ্টিগত কল্যাণ, প্রগতি ও ক্রমবিকাশ ব্যাহত হবে । সুতরাং সক্ষম ও সম্পদশালীদের প্রয়োজনমত জীবিকা নির্বাহের পর অক্ষম ও সম্পদহীনদের—ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে হবে । এভাবে গোটা মানব-জাতির চরম উন্নতি, প্রগতি ও ক্রমবিকাশের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর পর বাকি সবটা আবার ধন-সম্পদ বৃদ্ধির জন্য নিয়োজিত করতে হবে ।

সক্ষম ও সম্পদশালীদের কাছ থেকেই যাকাত আদায় করতে হবে । তাদের খরচ ব্যতীত আয়ের শতকরা আড়াই টাকা যাকাত দিতে হবে । এ সম্পর্কে 'ইকনমিকস্ অব্ ইসলাম' নামক গ্রন্থের লেখক জনাব শেখ মাহমুদ আহমদ সাহেবের এক পত্রের যবাবে জনাব মওলানা আবুল কালাম আজাদ লেখেন ঃ '(পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত) যাকাত সম্পর্কে আয়াতগুলিই এ সম্পর্কে সঠিক নির্দেশ দান করে । কোন সঠিক আকার অথবা পরিমাণই সেখানে বর্ণনা করা হয়নি । অক্ষমদের প্রয়োজন মেটানোর উপরই কেবলমাত্র সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে । রসূলে করীম (সা) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন । প্রথম খলীফার সময় (রসূলে করীমের)

www.pathagar.com

সাহাবাগণ এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে বর্তমান পরিমাণ নির্ধারণ করেন । এ পরিমাণ বাধ্যতামূলক নয় । এটা ইসতিহাদ দ্বারা পরিবর্তন করা চলে । প্রত্যেক যুগে সমাজের প্রয়োজন এবং অর্থনৈতিক অবস্থা অনুসারে কর্তৃপক্ষকে যুগোপযোগী পরিমাণ নির্ধারণ করা উচিত ।' হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর বলেছেন ; 'তোমাদের ধন-সম্পদের উপর যাকাত দান ছাড়া আরো দাবি রয়েছে । মুসলিম সমাজের প্রত্যেক সদস্যের সব রকম প্রয়োজন মেটানোর মতো যথেষ্ট অর্থ বায়তুলমালে না থাকলে খলীফা প্রয়োজনবোধে সক্ষম ও সম্পদশালীদের কাছ থেকে যাকাত দান করার পরও যতটা প্রয়োজন ততটাই নিতে পারেন ।' ফাতিমা বিন্‌তে কায়েস বলেন ঃ রসূলুল্লাহ বলেছেন, 'যাকাত দান ছাড়াও ধন-সম্পদের উপর অংশ রয়েছে ।' হযরত আলীও এই মত পোষণ করতেন ঃ 'অক্ষম ও সম্পদহীনদের সব প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ব আল্লাহ্‌তা'আলা সক্ষম ও সম্পদশালীদের উপর ন্যস্ত করেছেন । সুতরাং তারা যদি খাদ্য, বস্ত্র না পায় অথবা তারা (জীবিকা অর্জনের জন্য বৃথা) চেষ্টা, সাধনা ও সংগ্রাম করে তাহলে বুঝতে হবে সক্ষম ও সম্পদশালিগণ তাদের দায়িত্ব পালন করে না এবং শেষ বিচারের দিনে আল্লাহ্ তাদের বিচার করবেন ও শাস্তি দেবেন ।' বিখ্যাত মুসলিম দরবেশ সমাজবাদী হযরত শাহ ওলি উল্লাহ দেহলভী বলেছেন ঃ 'ক্ষুধার্তকে খেতে এবং বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিতেই হবে । যারা অক্ষম, অংগহীন অথবা গুরুতর আহত হয়ে কাজ করতে অক্ষম হয়েছে, তাদেরকে রাষ্ট্র হতে ভরণ-পোষণ করতেই হবে ।' এটাই হলো যাকাতের মূল এবং মুখ্য উদ্দেশ্য । সমাজের কেউ অন্নহীন ও বস্ত্রহীন থাকবে না । তা থাকলে মনে করতে হবে সক্ষম ও সম্পদশালিগণ তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করে না ।

এক্ষেত্রে একথাও সুস্পষ্ট জেনে রাখা দরকার সক্ষম ও সম্পদশালীরা অক্ষম ও সম্পদহীনদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে যাকাত দান করে এর জন্য নিজেদের গর্বিত ও শ্রেষ্ঠ মনে করতে পারবে না । এটা আল্লাহ্‌তা'আলা কর্তৃক ন্যস্ত তাদের কর্তব্য । এটা তারা নিছক কর্তব্য ও দায়িত্ব হিসাবেই পালন করবে এবং তা করলে তারা আল্লাহ্‌তাছআলার দয়া ও অনুকম্পা পাবে । কোন প্রকার উপকার ও ফলের প্রত্যাশা করেও এটা করা চলবে না । আল্লাহ্‌র নির্দেশ এবং মানব-জাতির সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য নিছক কর্তব্য হিসাবেই তাদের এটা পালন করতে হবে । এর জন্য কোন কড়া আইন, পুলিশ বা

www.pathagar.com

সামরিক বাহিনীর প্রয়োজন হবে না। তারা আপনা হতেই এটা কর্তৃপক্ষের কাছে দান করবেন অক্ষম ও বিত্তহীনও এটা গ্রহণ করতে কোনরূপ দ্বিধা বা সংকোচ বোধ করবে না। নিছক আল্লাহ্‌র দান হিসাবেই এটা তারা গ্রহণ করবে এবং এর সদ্ব্যবহার সমাজের দায়িত্বশীল সদস্য হিসাবে গোটা সমাজের সমষ্টিগত কল্যাণে আত্মনিয়োগ করবে।

পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ 'হে মু'মিনগণ, যারা লোক দেখানোর জন্য মাল দান করে কিন্তু আল্লাহ্ এবং শেষ বিচারের দিনে বিশ্বাস করে না, তাদের মতো দয়াপরবশ হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মনে করে তোমাদের সাহায্য দানের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ করো না।' অক্ষম ও বিত্তহীনদের মনে যাতে নীচতা, হীনতা ও নিকৃষ্টতার ভাব উদয় না হয় তার জন্যও পরিশেষে জোর দেয়া হয়েছে। সাহায্য দাতার দান সম্পর্কে গর্ব অনুভব এবং প্রচার করলে তার সাহায্য দান ব্যর্থ হবে। এরূপ করলে এর কোন আধ্যাত্মিক অর্থই থাকবে না। এবং আল্লাহ্‌র কাছে এর দাম কানা- কড়িও হবে না। আত্মকেন্দ্রিক ও ধনতান্ত্রিক সমাজে নাম, যশ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠাবান হবার জন্য বহুল প্রশংসিত ও প্রচারিত দান-খয়রাতের সাথে যাকাত দানের কোন সম্পর্ক নেই। একজন অক্ষম ও বিত্তহীনের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর জন্য যাকাত দেন আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার এবং তাঁর অনুগ্রহ পাবার জন্য এবং আর অপর জন সমাজে প্রতিষ্ঠাবান হবার এবং রাজনৈতিক মতলব হাসিল করার জন্য দান-খয়রাত করেন। যাকাত দান—পরার্থপরতা এবং ব্যক্তিগত দান-খয়রাত স্বার্থপরতা। একটি প্রেম, প্রীতি, আন্তরিকতা, ভ্রাতৃত্ব, পরার্থপরতা, সমাজকেন্দ্রিক ও বিশ্ব-পালনের প্রবৃত্তি মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে, আর অপরটি স্বকীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক ও শোষণমূলক প্রবৃত্তি, মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে। এই দুটি প্রবৃত্তি পরস্পর বিরোধী এবং সৃষ্টির প্রথম হতে এ দু-প্রবৃত্তির ভেতরই লড়াই চলে আসছে। সমাজ ও পরিবেশে অহরহ যে রেষারেষি, হিংসা-দ্বেষ, কলহ-কোন্দল, বিবাদ-বিসম্বাদ, শ্রেণী-সংঘর্ষ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ আমরা দেখতে পাই তা মানুষের অন্তরে সদাসর্বদা অনুষ্ঠিত এই দু' প্রবৃত্তির লড়াইর বাইরের প্রকাশ মাত্র। লড়াই হয় মানুষের মনের গভীরে দুটি প্রবৃত্তির ভেতর, দুটি শ্রেণীর ভেতর নয়। ইসলামী পরিভাষায় এ দুটি প্রবৃত্তিকে নাফসানিয়াৎ বা স্বার্থপরতা বা আত্মকেন্দ্রিক বা শোষণমূলক প্রবৃত্তি এবং রব্বানিয়াৎ বা পরার্থপরতা বা

www.pathagar.com

সমাজকেন্দ্রিক বা বিশ্বাস পালন প্রবৃত্তি বলা হয় । যাদের ভেতর নাফসানিয়াৎ প্রবৃত্তি প্রবলতর তারা আত্মকেন্দ্রিক, ধনতান্ত্রিক ও শোষক এবং যাদের ভেতর রব্বানিয়াৎ প্রবৃত্তি প্রবল তারাই সমাজকেন্দ্রিক, সাম্যবাদী ও বিশ্বপালক বলে আমাদের চোখে ধরা পড়ে । এভাবে সমাজ ও পরিবেশের ভেতর শ্রেণী-বৈষম্য ও শ্রেণীসংঘর্ষ হচ্ছে বলে মনে হয় । কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই একথা বুঝতে যে কোন সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেও বিশেষ কঠিন হবে না যে, এটা বাইরের রূপ বা প্রকাশ মাত্র । আসল লড়াই হচ্ছে মনের গভীরে দু'টি প্রবৃত্তির ভেতর । এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা 'রব্বানিয়াৎ' নামক গ্রন্থে করা হবে । এখানে শুধু এটুকু বুঝলেই যথেষ্ট যে, মনের ভেতর এ দুই বিপরীতমুখী প্রবৃত্তির ভেতর অহরহ লড়াই হচ্ছে এবং আপনা হতে অক্ষম ও বিত্তহীনদের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর জন্য সাহায্য দানের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে মানুষের মনের এ দুই বিপরীতমুখী প্রবৃত্তির ভেতর এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন হচ্ছে যার ফলে সমাজ ও পরিবেশে কোনরূপ ভেদাভেদ ও শ্রেণী-বৈষম্য গড়ে উঠতে পারে না । মানুষের ভেতরে ভেদাভেদ ও শ্রেণী-বৈষম্য না থাকলে শ্রেণী সংঘর্ষের প্রশ্নই উঠে না । এ ভেদাভেদ ও শ্রেণী-বৈষম্য মানুষের নিজের গড়া এবং নিজ কর্মফল । শ্রেণী সংঘর্ষ আবার এর স্বাভাবিক পরিণতি ।

মানুষের নিজ কর্মফলেই আজ শ্রেণী-বৈষম্য ও শ্রেণী-সংগ্রাম বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক সত্যে পরিণত হয়েছে । ফলে দুনিয়ার মানুষ মোটামুটি দু'ভাগে বিভক্ত হতে চলছে ঃ সাম্যবাদী ও পুঁজিবাদী । সাম্যবাদিগণ মনে করেন, সর্বহারাদের সংঘবদ্ধ নেতৃত্বে শ্রেণী-হিংসা ও শ্রেণী-সংগ্রামের ভেতর দিয়ে সর্বহারাদের রাজ কায়েম করে সর্বশেষে শ্রেণীবিহীন প্রাকৃতিক সমাজ ও মানবগোষ্ঠী গড়ে তুলবেন । অপরদিকে পুঁজিবাদিগণ স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক,ধ নতান্ত্রিক ও শোষণমূলক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম রাখার জন্য ধন-সম্পদ ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন । ফলে দেশে দেশে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অশান্তির সূত্রপাত হচ্ছে। কিন্তু কেউ সত্যিকার ও চিরস্থায়ী শান্তির সন্ধান দিতে পারছে না এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কোন মতবাদ, সমাজ-বিধান মানুষকে চিরন্তন সুখ, শান্তি, উন্নতি, প্রগতি, ক্রমবিকাশ ও পূর্ণতা-প্রাপ্তির সন্ধান দিতে পারবেও না । চরম পরিতাপের বিষয় এই যে, মুসলমানগণও জীবন ও জীবনাদর্শ সম্পর্কে আজ কমবেশি এ

www.pathagar.com

দুটি বিপরীতমুখী পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবান্বিত । ফলে তারাও দিশেহারা বর্তমান জগতকে সঠিক পথ নির্দেশ করতে পারছেন না । একদল আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও ধর্মবিহীন আধুনিক সাম্যবাদের অন্ধ সমর্থক । মানুষের সমাজ-জীবনে এর কোন প্রয়োজনীয়তাই তারা মনে করে না । ধর্ম সম্পর্কে আধুনিক অর্থ, ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে ইসলামকে ভাল করে জানার, বোঝার এবং সঠিক অর্থ ও তাৎপর্য উপলব্ধি করে ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে এর বাস্তব প্রয়োগ ও ব্যবহার মানুষকে তার চিরন্তন সুখ, শান্তি, ক্রমোন্নতি, ক্রমবিকাশ ও পূর্ণতা-প্রাপ্তির দিকে কতখানি এগিয়ে নেবে তা নিরপেক্ষ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার না করেই ছুটে চলেছে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও দীনবিহীন আধুনিক সাম্যবাদের দিকে । অপরদিকে আর একদল জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক নাফসানি বা স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক, ধনতান্ত্রিক ও শোষণমূলক পাশ্চাত্য সমাজ, পরিবেশ ও দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে ইসলামের সঠিক ও যুগোপযোগী ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দুনিয়ার সামনে তুলে ধরতে পারছে না । এ উভয় দল মুসলমানই বস্তুবাদী । এছাড়া আরও দু'রকমের মুসলিম আছেন । তাঁরা প্রধানত অধ্যাত্মবাদী । বর্তমান দুনিয়া এবং এর বিভিন্ন মতবাদ ও সমস্যা সম্পর্কে সম্যক ও সত্য জ্ঞান না থাকার দরুন তাদের একদল ইসলামের শুধু আধ্যাত্মিক দিক্ নিয়েই ব্যস্ত রয়েছেন এবং অপর দল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ইসলামের যুগোপযোগী ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে বর্তমান জগতকে চিরন্তন সুখ ও শান্তির পথনির্দেশ করতে সক্ষম হন না । কিন্তু সুখের ও আশার কথা এই যে, সাধারণভাবে সমস্ত মুসলমান না হোক বিশেষভাবে মুষ্টিমেয় মুসলমান এদিকে চিন্তা-ভাবনা শুরু করছেন ।

আধ্যাত্মিক, ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা সমাজকেন্দ্রিক এর কোনটিকেই পৃথকভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করলে আমরা ইসলামের সত্যিকার অর্থ, তাৎপর্য ও সমাধান উপলব্ধি করতে পারবো না । তাই জীবন ও জীবনাদর্শ সম্পর্কে এ তিনটি দৃষ্টিভঙ্গির এক অপূর্ব সমন্বয় দেখতে পাই আমরা ইসলামের যাকাত দানের নির্দেশের ভেতর । এটা একই সাথে আধ্যাত্মিক, ব্যক্তিগত ও সমাজের সমষ্টিগত উন্নতি সাধন করে । তবে যাকাতের উদ্দেশ্য তখনই সম্পূর্ণ হাসিল হতে পারে যখন সমাজের সবার মনোভাব সেভাবে গড়ে উঠে । প্রত্যেক মানুষের মনের ভেতর দুটি বিপরীতমুখী প্রবৃত্তির ভেতর সমন্বয় সাধন হলে—তারা আপনা হতেই তাদের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর

www.pathagar.com

পর যা অবশিষ্ট থাকে তার সবটাই প্রয়োজনবোধে সমাজের সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য ব্যয় ও বিতরণ করবে। হযরত আবু বকর (রা) যেমন প্রয়োজনবোধে তাঁর যথাসর্বস্ব সবার সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য দান করেছিলেন, তেমনি সক্ষম সবাই প্রয়োজনবোধে তাঁদের সবকিছু আপনা হতেই সবার সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য ব্যয় ও বিতরণ করার জন্য প্রস্তুত থাকবেন। এরূপ মনোভাব যেদিন সবার মধ্যে গড়ে উঠবে, সেদিন আর কোন আইন-কানুন, সরকার ও রাষ্ট্রের প্রয়োজন থাকবে না। সেটাই হবে প্রাকৃতিক সমাজ বা মানবগোষ্ঠী। এ ধরনের সমাজ ও মানবগোষ্ঠীই গড়ে উঠেছিলো রসূলে করীম (সা)-এর জীবদ্দশায়। এটাই আদর্শ। এই আদর্শে পৌঁছার জন্য আজ বর্তমান জগতের আধুনিক সাম্যবাদিগণ চেষ্টা ও সংগ্রাম করছেন।

এরূপ মনোভাব যতদিন সবার গড়ে না উঠছে, ততদিন সরকার ও রাষ্ট্র কর্তৃক যাকাত দান নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করতে হবে। রসূলে করীম (সা)-এর ইন্তিকালের পর হযরত আবু বকর (রা) তাই ঘোষণা করেছিলেন ঃ 'আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, যারা সালাত কায়েম ও যাকাত দানের ভেতর কোনরূপ পার্থক্য করবেন আমি তাদের সাথেই যুদ্ধ করবো। যাকাত ধন-সম্পদের উপর ধার্য করা হয় ঃ হে আল্লাহ্ তাঁরা যা রসূলে করীম (সা)-কে দান করতেন তার চাইতে যদি একটি মেষ শাবকও কম দেন তা হলে এটি না দেয়ার জন্য আমি তাঁদের বিরুদ্ধেই জিহাদ করবো।' হযরত উমর (রা) বলেছেন ঃ 'আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি ! আল্লাহ্ আবু বকরের অন্তর খুলে দিয়েছিলেন। সুতরাং' আমি জানি যে, এটা সত্য' (বুখারী ২৪ঃ১)। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর বলেছেন ঃ 'মুসলিম রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক খলীফার কাছে যাকাত দান করতে হবে।' কেউ প্রশ্ন করেছিলেন ঃ 'যদি খলীফা এটার অপব্যবহার করেন ?' তিনি জবাব দিয়েছিলেন ঃ 'তা সত্ত্বেও তাঁর কাছেই যাকাত দান করো।' হযরত সাআদ বিন্ আবি ওয়াকাস্, আবু সাঈদ খুদরী এবং আবদুল্লাহ্ বিন্ উমর সবাই সমবেতভাবে আবু সালেহর এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন ঃ 'হ্যাঁ তাঁদের (খালীফাদের) কাছে যাকাত দান করো। কারণ এটাই সামাজিক নিরাপত্তার মূল আশ্রয় ও স্তম্ভ।' এদের সকলের কথা হতেও এক কথাই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, যাকাত আদায় ও দান রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হবে। সমাজের সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য কেউ যাকাত না দিলে তার বা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা হবে

www.pathagar.com

অর্থাৎ প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্র নির্ধারিত পরিমাণ যাকাত বাধ্যতামূলকভাবে আদায় করবেন ।

যাকাত আদায় ও বিতরণ করার সময় রাষ্ট্রের মূল ও মুখ্য উদ্দেশ্য হবে ব্যক্তি ও সমষ্টিগতভাবে আত্মার বিশুদ্ধিকরণ এবং দেহ ও ধন-সম্পদের বৃদ্ধি । তার জন্য আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসাবে খিলাফত বা মুসলিম রাষ্ট্র যে কোন ব্যবস্থা ও পন্থা অবলম্বন করতে পারে । মানুষ আপনা হতে আপন কর্তব্য সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে পালন করার মতো মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে না তোলা পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষের সেরূপ দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব গড়ে তুলে আদর্শতম মুসলিম বা শান্তিকামী প্রাকৃতিক সমাজ ও মানবগোষ্ঠী গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্র ও সরকার প্রয়োজনবোধে যাকাত আদায় ও বিতরণের জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন রসূলে করীম (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদার সময় যেভাবে যাকাত আদায় ও বিতরণ করা হতো তা তখনই কার্যকরী হবে, যখন প্রত্যেকটি মানুষ তখনকার আনসার ও মুহাজিরদের মতো সব সময় সবকিছু সবার সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য বিতরণ করতে আনন্দবোধ করবে ।

বর্তমানে সাধারণভাবে সব মানুষ এবং বিশেষভাবে মুসলমগণ ইসলামের মূল আদর্শ ও শিক্ষা হতে বহু দূরে সরে পড়েছে । মুসলমানগণ মুখে ইসলামের বুলি আওড়ালেও তাদের মন-অন্তর ইচ্ছা-আকাংক্ষা এবং কাজকর্ম ইসলামের আদর্শ ও নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় না । তারা স্বকীয় ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশে এতই বিভোর যে, দুস্থ মানবতার দুঃখ-দুর্দশা মোচন দূরের কথা তাদের প্রতি ফিরে তাকাবার অবসরও তাদের হয়ে উঠে না । খোলাফায়ে রাশেদার পর হতেই মুসলমানগণ ধীরে ধীরে ইসলামের মূল শিক্ষা ও সমষ্টিগত কল্যাণের কথা ভুলে বর্তমানে সম্পূর্ণ নাফসানি বা স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে । গোটা সমাজের কল্যাণ চিন্তা করার তাদের অবসর নেই । এমনি করে তারা নাফসানি বা স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক, ধনতান্ত্রিক ও শোষণমূলক পাশ্চাত্য মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে ধন-সম্পদ ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা মুষ্টিমেয় লোকের হাতে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে ।

আরও দুঃখের কথা এই যে, এর জন্য তারা ইসলামের দোহাই দিতে চেষ্টা করছেন । যারা ইসলামের দোহাই দিয়ে ধন-সম্পদ ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা মুষ্টিমেয় লোকের হাতে রাখার চেষ্টা করছেন ; তাদের কি জিজ্ঞাস করতে পারি

www.pathagar.com

প্রয়োজনবোধে হযরত আবু বকরের মতো তাদের কয়জন সবকিছু ধন-সম্পদ আপনা হতে সমাজের সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য ব্যয় ও বিতরণ করতে সক্ষম ? তাদের কয়জন সমাজের প্রতিটি লোক খেতে-পরতে পারলো কি-না তার খোঁজ-খবর রাখেন এবং তাদের অভাব-অনটন দূর করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেন ? এটা যে তাদের প্রথম, প্রধান এবং অপরিহার্য কর্তব্য তা কয়জনে বিশ্বাস ও কাজে পরিণত করে ? এ কর্তব্য পালন না করলে যে তাদের ইবাদত-বন্দেগী বৃথা সে কথাই বা কয়জনে ভেবে দেখেছেন ? না, তারা এসব অক্ষম ও সম্পদহীনদের অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্টের সুযোগ নিয়ে তাদের ঠকিয়ে নানারূপ ছল-চাতুরী বা ফাঁকিবাজী করে স্বকীয় ধন-সম্পদ দিন দিন বাড়িয়ে চলছেন ? এ সবের বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না । একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে সবার কাছে এটা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে, আল্লাহ্‌র দেওয়া প্রাকৃতিক সম্পদ এবং তা হতে মানুষের পরিশ্রমলব্ধ ধন-সম্পদের চরম অপব্যয় ও অসদ্ব্যবহার করার ফলেই মানুষের জীবনে আজ দেখা দিয়েছে চরম দুঃখ-দুর্দশা ও দুর্গতি । সমাজে উপস্থিত হয়েছে নানারূপ বিপর্যয় । এসব বিপর্যয়, দুঃখ-দুর্দশা ও দুর্গতি মানুষের নিজের গড়া—নিজ কর্মফল । মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসাবে আল্লাহ্‌র দেওয়া প্রাকৃতিক সম্পদ এবং তা হতে উপার্জিত অর্থের অপচয় ও অসদ্ব্যবহার করেছে । প্রতিনিধির কাজ হলো মুনিবের কাজ করা । আল্লাহ্‌র খলীফা বা প্রতিনিধ হিসাবে দুনিয়ার উপর আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ কাজ রবুবিয়াৎ বা বিশ্ব পালনেই হবে মানুষের শ্রেষ্ঠ কাজ, প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য । এই কর্তব্য সুষ্ঠু, সুন্দর ও সুচারুরূপে পালন করার জন্যই মানুষকে সৃজন করা হয়েছে । এই কর্তব্য পালনে আল্লাহ্‌র প্রতিভূ হিসাবে মুনিবের কাজ না করলে প্রতিনিধির প্রতিনিধিত্ব থাকে না । সুতরাং আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসাবে মানুষকে যেভাবে আল্লাহ্‌র দেয়া ধন-সম্পদ ব্যয় ও বিতরণ করতে বলা হয়েছে তা না করার দরুন তার প্রতিনিধিত্ব থাকতে পারে না । সে তার প্রতিনিধিত্ব হারিয়ে ফেলেছে নিজ কর্মফলে । তাই রাষ্ট্র সমষ্টিগতভাবে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসাবে গোটা সম্পদ ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য প্রয়োজন মতো সবার ভেতর বিতরণ করবেন । প্রত্যেকের দেহ, মন, আত্মা ও মস্তিষ্কের পূর্ণতম বিকাশের জন্য যতটা প্রয়োজন ততটাই সে পাবে । ব্যষ্টির উন্নতি ও বিকাশ সমষ্টির উন্নতি ও বিকাশকে ব্যাহত না করে সহায়তা করবে । সবাই সমভাবে প্রগতি, উন্নতি, ক্রমবিকাশ ও পূর্ণতা-প্রাপ্তির দিকে এগিয়ে চলবে ।

www.pathagar.com

রমযান মাস

বৈপ্লবিক দৃষ্টিতে সালাত ও যাকাতের অর্থ ও তাৎপর্য বুঝে স্বকীয় ও সমাজ-জীবনে রূপায়িত করতে হলে নিজের পরিবেশের ও সমাজের সাথে অহরহ লড়াই করতে হয়—নাফসানিয়াৎ ও রব্বানিয়াৎ নামক দু'টি বিপরীতমুখী প্রবৃত্তির ভেতর। রমযান মাসে তাকেই আরও কঠোরভাবে পালন করতে হয়। প্রতিদিন পাঁচবার সালাতে এবং বছরে একবার যাকাত দানের ভেতর দিয়ে যে ব্রত আমরা গ্রহণ করি—সদা সর্বদা সেই ব্রত ও শিক্ষাকেই জীবন ও সমাজে রূপ দেবার চেষ্টা করা উচিত। পাছে সে সাধনায় আমরা ব্যর্থ হই, সালাত ও যাকাতের শিক্ষাকে প্রতিনিয়ত জীবন ও সমাজের প্রতি ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে না পারি তাই রমযান মাসে কঠোর সংযম, ত্যাগ ও সাধনার ভেতর দিয়ে সেই মহাশিক্ষাই আমাদের স্বকীয় ও সমাজ-জীবনে গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বস্তুত পক্ষে সারাদিন পানাহার হতে দূরে থেকে উপবাস পালন করা এবং বেলা ডোবার পর আকন্ঠ ভোজন করা রোযার প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য নয়। রোযার মধ্যে নিহিত রয়েছে ব্যক্তিগত জীবনকে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পাপ তথা জঞ্জাল হতে মুক্ত করে আত্মশুদ্ধির মহা ইঙ্গিত—আর আছে খাদযুক্ত সোনাকে রমযানের কঠোর সংযম, ত্যাগ ও সাধনার অগ্নি পরীক্ষায় ফেলে খাঁটি সোনা করে তোলার মহা শিক্ষা। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য হতে—সকল প্রকার রিপুর তাড়না হতে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করাই রোযার শিক্ষা। সকল প্রকার কু-চিন্তা, কু-প্রবৃত্তি ও পাপ কাজ হতে দূরে থেকে একাগ্রচিত্তে ও নিবিষ্ট মনে আত্মশুদ্ধির সাধনা করাই মাহে রমযানের নির্দেশ। মোট কথা, অন্তর বাইর সমভাবে পাপমুক্ত হলে তবেই রোযার পরিপূর্ণ রূপ বিকাশ লাভ করে।

আমাদের ব্যক্তিগত ও সমাজ-জীবনে প্রতিনিয়ত পাপ জমা হচ্ছে। ঘুষ, রিশয়াত, জুয়োচুরি, ফেরেববাজী, চোরাকারবারী, মুনাফাখোরীর সমাজ-বিরোধী কাজ আজ সমাজ-জীবনকে গলা টিপে মারার উপক্রম করেছে। প্রতারণা এবং জালিয়াতিকে মূলধন করে আমরা রাতারাতি ধনকুবের হবার স্বপ্ন

www.pathagar.com

দেখছি—মুমূর্ষু ও ক্ষুধার্ত নর-নারীর মুখের গ্রাস, মৃত-প্রায় শিশুর এক ফোঁটা দুধ কেড়ে নিয়ে আমরা পৈশাচিক নৃত্য শুরু করেছি। এ সর্বগ্রাসী লোভ ও সমাজ-বিরোধী কাজের অবসান ঘটানোর জন্যই রমযান আসে। দারিদ্র-অভাব-অনাহারের যে কি ভয়াবহ যন্ত্রণা, সর্বহারার যে কি বুক ফাটা-আর্তনাদ, দুস্থ-মানবতার যে কি ফরিয়াদ তা সমাজের এ পারে মরা গাঙের বাঁধের মাঝেই গুমরে মরে, ওপারের উৎসবরত আরাম-আয়েশ ও ভোগবিলাসীদের মজলিসে তা পৌঁছতে পারে না। সাম্য, মৈত্রী ও শান্তির ধর্ম ইসলাম এ অসাম্য অনুমোদন করে না। দিনে পাঁচবার ধনী-গরীব, রাজা-প্রজা, ছোট-বড় ও শিক্ষিত-মূর্খ সবাই সমবেত হয় মসজিদে। কিন্তু এটা স্থান বিশেষের ভেতর সীমাবদ্ধ। রমযান মাসে এ সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব আরও ব্যাপকতরভাবে গোটা দুনিয়ার সর্বত্র অনুষ্ঠিত হয়। দিনে পাঁচবার সালাতে এক সাথে একই মসজিদে একই লাইনে উপবিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেকে প্রত্যেকের নিজ নিজ বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের খাবার খান। কেউ হয়তো পোলাও খাচ্ছেন, আর কারো হয়ত খাবারই জুটছে না। অক্ষম ও সম্পদহীনরা এমনি ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করে কিন্তু বিত্তশালীরা হয়তো এর খবরই রাখে না। এভাবে বিত্তশালী ও বিত্তহীনদের ভেতর এক বিরাট সামাজিক পার্থক্য গড়ে উঠে এবং রমযান মাসে সবাইকে উপবাস ব্রত উদ্‌যাপন করার ভেতর দিয়ে ক্ষুধার্তের যন্ত্রণা সবাইকে অনুভব করতে বাধ্য করে। তাই ধনীর কাছে রমযান বিশেষ একবাণী বহন করে আনে। এ বাণীর উদ্দেশ্য ঃ ধনীকে দারিদ্রের যন্ত্রণা উপলব্ধি করানো—গরীবের, ক্ষুধার্তের সকল অভাব অভিযোগ সম্পর্কে তাকে সচেতন করে তোলা; আরাম, আয়েশ ও ভোগবিলাসে নিমজ্জিত আত্মহারার জ্ঞান ফিরিয়ে আনা।

রমযানের এ কঠোর শিক্ষার প্রতি নজর রেখেই আজ সমাজের উঁচু স্তরের ভাগ্যবানদের রোযা রাখতে হবে। বস্তুত সমাজের সকল স্তরের মানুষের ভেতর আত্মচেতনার উন্মেষ সাধন করা—একই অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে এককে অপরের সকল অভাব-অভিযোগ ও চাহিদা সম্পর্কে সচেতন করে তোলাই রমযানের লক্ষ্য বা আদর্শ।

ব্যক্তিগত চিন্তা ও কাজের উপরই সমাজ-জীবনের বুনিয়াদ দাঁড়িয়ে আছে। সেই বুনিয়াদকে শক্তিশালী করতে হলে ব্যক্তিগত চরিত্র সুষ্ঠুরূপে গড়ে তুলতে হবে। পবিত্র রমযান আমাদের এই মহা শিক্ষা দিতেই আসে ঃ নিষ্কাম,

www.pathagar.com

নিষ্পাপ এবং নির্লোভ চরিত্রের দুর্ভেদ্য শক্তির উপরই মানবের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সত্তা, স্থায়িত্ব তথা ক্রমোন্নতি ও ক্রমবিকাশ নির্ভর করে। রমযান মাসকে এই আদর্শ চরিত্র গঠনের শিক্ষানবিশী কাল বলে গণ্য করতে হবে। নৈতিক চরিত্র গঠনের সাথে এটা আধ্যাত্মিক শক্তিও বৃদ্ধি করে। পবিত্র কুরআনে রমযান মাস সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ্‌র নৈকট্য বা সান্নিধ্য লাভের কথা বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছে ঃ 'সুতরাং তারা আমার ডাকে সাড়া দেবে (রোযা রেখে) এবং আমার উপর বিশ্বাস করে যেন আমার (নৈকট্য লাভ করার) পথ-প্রাপ্ত হয়' (ইঃ ১৮৬)। পানির নিচে অথবা বদ্ধ কোঠার ভেতরেও সে কিছু পানাহার করে না বা কোন খারাপ কাজ বা পাপচিন্তা করে না। কারণ সে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অনুভব করে। যখনই কোনো নতুন লোভ বা কামনা-বাসনা তার মনে উদয় হয়, সে মনে করে 'আমার সাথে আল্লাহ্ আছেন' এবং আল্লাহ্ 'আমাকে দেখেন' রমযান মাসে উপবাসের ভেতর দিয়ে আল্লাহ্‌র যে সান্নিধ্য লাভ হয়, তা অন্য সময় গভীর মনোনিবেশ ও কঠোর সাধনা দ্বারাও সম্ভবপর নয়। রমযানের এই মহা শিক্ষা গোটা বছর মনে রেখে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত ও প্রতি কাজে সে থাকবে খারাপ কাজ ও পাপ চিন্তা হতে বিরত এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করবে দুস্থ মানবতাকে সাহায্য করার।

রমযান মাসব্যাপী সন্ধ্যা বেলায় বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবেশীর ভেতর একতার বিনিময় এবং একসাথে বসে খাওয়া-দাওয়া, ফেৎরা আদায় করা এবং জামাতে তারাবীর সালাতের ভেতর দিয়ে সমষ্টিগতভাবে সমগ্র মানব সমাজকে সাংবৎসরকালের জন্য ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের গতিপথ নির্ধারণ করার মহান শিক্ষা দেয়। রমযান মাসের উপবাস করার পর ঈদের দিনে সত্যি মুসলমানদের মনে এক অপূর্ব বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও প্রেমের ভাব ফুটে উঠে। সেদিন যেন সবাই এক পরিবারভুক্ত বলে মনে হয়। আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে রমযান ও ঈদের এই মহান আদর্শকে ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে রূপায়িত করতে পারলে কি সুন্দর, সুখের ও শান্তির সমাজই না গড়ে উঠবে।

www.pathagar.com

হজ

প্রতি মহল্লায়, পাড়ায় ও গ্রামে দিনে পাঁচবার, সপ্তাহে একবার, মসজিদে ও বছরে দু'দিন ঈদের মাঠে স্থানীয়ভাবে মুসলমানগণ একত্রে সমবেত হয়ে পরস্পর পরস্পরের খোঁজ-খবর নেন এবং ভ্রাতৃত্বভাব গড়ে তোলেন। তেমনি প্রতি বছরে একবার সমগ্র দুনিয়ার মুসলমানদের একটি আন্তর্জাতিক মহাসভাই হলো হজ। খোলাফায়ে রাশেদার কালে বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তাগণ স্ব স্ব দেশ বা প্রদেশের কাজের ফিরিস্তি এবং হিসাব সবার সামনে দাখিল করতেন। দেশের জনগণের মত ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু করলে খলীফা তাদের শাসন ও সাবধান করতেন এবং অনেক সময় তাদের একেবারে বরখাস্ত করতেন। এটা হতে হজের রাজনৈতিক অর্থ ও তাৎপর্য অতি সহজেই অনুমিত হয়।

জাতি, বর্ণ ও পদমর্যাদাজনিত সমস্ত ভেদ-বৈষম্য দূর করে প্রেম, সাম্য ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের এরূপ মহান অনুষ্ঠান জগতের আর কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহ্‌তা'আলার পবিত্র ঘরের সামনে পৃথিবীর সমস্ত দেশ ও জাতির লোক এক ঐশ্বরিক পরিবারের সদস্য হিসাবে সমবেত হয়েই ক্ষান্ত হয় না, তাঁরা সবাই এমনই এক পোশাক পরিধান করেন যে, ছোট বড় বিচার করার কোন উপায়ই আর অবশিষ্ট থাকে না। বিরাট ও বিপুল বিশ্ব-জনতা একই পরিচ্ছদ পরিহিত, একই দিকে ধাবিত, সবার মুখে একই বাণী, 'আমরা এখানে, হে আল্লাহ্ আমরা এখানে তোমারই সামনে।' হজের ভেতর সব দেশ ও সব জাতির লোক একই ভাষায় কথা বলছে এবং একই পরিচ্ছদ পরিধান করছে—সাম্য ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের এমন অপূর্ব দৃশ্য আর কোথাও সম্ভবপর নয়। সবাই সমবেতভাবে অনুভব করেন যে, সব মানুষই সমান অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে সমানাধিকার নিয়েই মরে। হজের ভেতর দিয়ে দুনিয়ার মানুষকে সমস্ত ভেদ-বৈষম্য ভুলে ইসলামের প্রেম, সাম্য ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এক আদর্শ মানবগোষ্ঠী গড়ে তোলার মহান শিক্ষাই দেয়া হচ্ছে।

www.pathagar.com

পবিত্র হজের ভেতর আরো একটি বিশেষ শিক্ষার বিষয় রয়েছে । বিপুল জনতার ভেতর জাতি, বল ও পদমর্যাদাজনিত সমস্ত ভেদ-বৈষম্য ও পার্থক্য ভুলে সবাই আল্লাহ্‌র নৈকট্য অনুভব করেন এবং মনে করেন, যেসব বাধা মানুষকে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে দূরে রাখে তা সবই দূরীভূত হয়েছে এবং তারা সবাই সরাসরি আল্লাহ্‌র সামনে দণ্ডায়মান । অবশ্য মক্কা বা কাবা গৃহও বাস্তবে আল্লাহ্‌র ঘর নয় এবং এ কথাও সত্য যে, প্রত্যেক মুসলিম এ শিক্ষাই পেয়ে থাকে সুদূর পল্লীর কুঁড়ে ঘরের নিভৃত কোণে একাকী রাতের গভীর অন্ধকারে ; কিন্তু তবুও বিপুল জনসমুদ্রের ভেতর আরাফাতের ময়দানে আল্লাহ্‌কে আরো নিকটতর মনে করে । এ বিপুল জনতার প্রত্যেকেই সুদূরে অবস্থিত বাড়ি হতে একই উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে । জীবনে সব রকম ভোগ-বিলাস, আরাম-আয়েশ বা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের প্রতিবন্ধকতা থেকে সবাই বিরত থাকে । যিনি সাদাসিধে পোশাক পরিধান করেন তিনিই সব রকম খারাপ কাজ, পাপ-কথা ও চিন্তা এবং সব রকম বিবাদ-বিসম্বাদ, হিংসা-দ্বেষ ও কলহ-কোন্দল থেকে বিরত থাকেন । আরব দেশের ন্যায় মরুভূমিতে সফরকালে সব রকম দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে সবাই গভীর মনোনিবেশসহ হজ পালন করেন । সবাই সমবেতভাবে জীবনের ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে প্রকাশ্য ও সমবেতভাবে আল্লাহ্‌র কাছে আত্মনিবেদন করেন এবং আল্লাহ্‌কে স্মরণ করেন। কারো সাথে স্ত্রী থাকলেও কোনরূপ প্রেমালাপ করতে পারবেন না । কারো শত্রু থাকলেও তার সাথে তর্ক-বিতর্ক অথবা বিবাদ-বিসম্বাদ করতে পারবেন না । স্বামী-স্ত্রী, শত্রু-মিত্র, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, স্বদেশী-বিদেশী একই সাথে প্রকাশ্য ও সমবেতভাবে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করার প্রচেষ্টা আর কোন মতবাদ বা ধর্মে নেই । চরম আধ্যাত্মিকতাকেও এরূপে ইসলাম সমষ্টিগত রূপদান করে মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে সমষ্টিগত কল্যাণের প্রতি সবিশেষ জোর দিতে বলে ।

চরম পরিতাপের বিষয় এই যে, ইসলামের প্রত্যেকটি স্তম্ভের ভেতর আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক জীবনের উভয় দিকে চরম উন্নতি ও বিকাশের পূর্ণ ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও আমরা সব ভুলে গিয়েছি । আমরা শুধু খোলস, আকার ও কাঠামো নিয়ে ব্যস্ত। ইসলামের বিভিন্ন স্তম্ভ ও অনুষ্ঠানের সারবাণী ও মর্মকথা না বুঝে শুধু তার আনুষ্ঠানিক দিকটাই আমরা বড় করে দেখি। ইসলামের প্রত্যেক স্তম্ভ বা অনুষ্ঠান হতে এর সারবাণী বা প্রাণবস্তু 'হক্কুল

www.pathagar.com

এবাদ' বা রবুবিয়াৎ বা বিশ্বের সমষ্টিগত কল্যাণ বিতাড়িত হয়েছে বলে ইসলামের স্পন্দন নেই । এটা যেন প্রাণহীন অবস্থায় পড়ে আছে । এসব খোলস আকার বা বাইরের আনুষ্ঠানিকতা বাদ দিয়ে ইসলামের সারবাণীকে মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে ফুটিয়ে তুলতে হবে, তবেই দুনিয়ায় চিরন্তন সুখ ও চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে ।

www.pathagar.com

জিহাদ ও তবলিগ

সাধারণত জিহাদ অর্থে বাস্তব যুদ্ধ-বিগ্রহ বুঝলেও জিহাদের অর্থ অনেক ব্যাপক । জিহাদ শব্দটি আরবী 'জাহদ' অথবা 'জুহদ' অর্থাৎ যোগ্যতা, প্রচেষ্টা অথবা শক্তি হতে উৎপত্তি এবং জিহাদ এবং মুজাহিদা অর্থ শত্রুকে দমন করার জন্য স্বকীয় শক্তি ও ক্ষমতার প্রয়োগ ও ব্যবহার করা । রাঘিবের মতে জিহাদ তিন রকমের ঃ (১) প্রকাশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে (২) শয়তানের বিরুদ্ধে এবং (৩) নিজের সাথে সংগ্রাম করা । কারো মতে জিহাদ অর্থ ধর্মযুদ্ধ—অর্থাৎ অমুসলমানদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম । তৃতীয় দলের মতে জাহাদা শব্দের সত্যিকার অর্থ হলো স্বকীয় শক্তি, ক্ষমতা ও যোগ্যতার চরম প্রয়োগ করে সাধ্যমত চেষ্টা, সাধনা ও সংগ্রাম করা এবং এ সংগ্রাম হবে তিন রকমের তা আগেই বলেছি ঃ (১) প্রকাশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে (২) শয়তানের বিরুদ্ধে এবং (৩) নিজের রিপুর সাথে। শেষোক্ত দু'রকমের জিহাদ অহরহ চলছে আমাদের মনের গভীরে দু'টি বিপরীতমুখী প্রবৃত্তির ভেতর, আর প্রথম জিহাদ হলো বাস্তব পরিবেশের সাথে। বাস্তব পরিবেশের সাথে জিহাদের চরম পরিণতিই হলো যুদ্ধ । সুতরাং সংক্ষেপে বলতে গেলে জিহাদ দু'রকমের (১) নাফসের সাথে এবং (২) পরিবেশের সাথে।

নাফসের সাথে জিহাদ বড়ই কঠিন । রসূলে করীম (সা) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই নিজের নাফসের সাথে জিহাদ করাই শ্রেষ্ঠ জিহাদ ।' নিজের সব রমক কু-প্রবৃত্তিকে দমন করে স্বকীয় ইন্দ্রিয় ও রিপুকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করে নাফসকে আয়ত্তে আনার অর্থই হলো প্রথম জিহাদে জয়লাভ করা । বস্তুত এ জিহাদ প্রতিনিয়ত ঘটছে । এটা চিরন্তন । সৃষ্টির প্রথম হতে এ চিরন্তন লড়াই ও সংঘাতের ভেতর দিয়েই মানব-জাতি ক্রমবিকাশ এবং ক্রমোন্নতির দিকে এগিয়ে চলছে । এ চিরন্তন জিহাদ বা লড়াই চলতেই থাকবে । এর শেষ হলে যে মানব-জাতির ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতি শেষ হবে । একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে বাস্তব-জীবনে প্রতি কাজে, প্রতি ঘটনায়, প্রতি মুহূর্তে এটা আমাদের অনুভব হবে ।

www.pathagar.com

স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত, স্বার্থে পরার্থে সংঘাত, আদর্শে আদর্শে সংঘাত, মতে মতে সংঘাত, মতবাদে মতবাদে সংঘাত, মানুষে মানুষে সংঘাত, বাপ-মায়ে সংঘাত, পিতা-পুত্রে, মেয়ে-মায়ে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, জাতিতে জাতিতে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সংঘাত, পশুতে পশুতে সংঘাত, বস্তুতে বস্তুতে সংঘাত, সৃষ্টির আবহমানকাল থেকে চলে আসছে, চলবে। এর শেষ নেই, বিরাম নেই। এ সংঘাত বা দ্বন্দ্বের বস্তুতান্ত্রিক দিক এবং সমাজের ভেতর এর বাস্তব ও বাইরের প্রকাশই মার্কস্‌বাদে যথাক্রমে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ও শ্রেণী-সংগ্রাম রূপে বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে। কিন্তু সেখানেও এর শেষ হয়নি। মার্কস্‌বাদ জীবনের যে দিকটা প্রকাশ করেছে তা কতকটা সত্য ও খাঁটি হতে পারে, কিন্তু একমাত্র ও চূড়ান্ত নয়। আগেই বলেছি, শুধু বস্তুতে বস্তুতেই সংঘাত হয় না, আদর্শে আদর্শে এবং মতবাদে মতবাদেও সংঘাত হয়। অবিরাম চলছে এবং চিরকাল চলবে। তাছাড়া এক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেই শত শত প্রশ্ন জাগে, দ্বন্দ্ব শুরু হয়—কোন্‌টা চাই ; কোন্‌টা চাই না ; কি চাই কি চাই না ; কাকে চাই, কাকে চাই না ; এ পথে হাঁটবো, না ঐ পথে হাঁটবো ; এ কাজ না ঐ কাজ করবো ; এ বই পড়বো না ও বই পড়বো। এমনি জীবনের প্রতি ক্ষণে উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে, হাসতে, কাঁদতে, লিখতে, পড়তে, ভাবতে, চিন্তা করতে, কাজে কর্মে মনের ভেতর উঁকি মারে দুটি বিপরীতমুখী প্রবৃত্তি। এই দু'টি বিপরীতমুখী প্রবৃত্তির ভেতরই অহরহ সংঘাত বা দ্বন্দ্ব হচ্ছে। ইসলামী পরিভাষায় এ দু'প্রবৃত্তিকে নাফসানিয়াৎ বা স্বার্থপরতা এবং রব্বানিয়াৎ বা পরার্থপরতা বলে, তা আগেই বলেছি।

বস্তুত লড়াই হচ্ছে নিজের ব্যক্তিগত সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও সমগ্র মানব বা বিশ্বের সমষ্টিগত সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির ভেতর। ব্যষ্টিকে নিয়েই সমষ্টি। একের সাথে আর এক অবিচ্ছিন্ন। ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে যেমন সমষ্টি টিকতে পারে না, তেমনি সমষ্টিকে বাদ দিয়েও ব্যষ্টি টিকতে পারে না। ব্যষ্টির কল্যাণ সমষ্টির কল্যাণ এবং সমষ্টির কল্যাণও ব্যষ্টির কল্যাণ। তবুও এদের সংঘাত বা দ্বন্দ্ব কেন ? এর কারণ কি ? কারণ মানুষ স্বভাবতঃই স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে সমষ্টিগত কল্যাণের কথা ভুলে শুধু স্বকীয় সুখ, শান্তি, উন্নতি, প্রগতির ও সমৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করে। এ প্রবৃত্তি যাদের ভেতর প্রবল তারাই সমাজে কখনও আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক আবার কখনও বা অর্থনৈতিক শোষকরূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং সমাজের ভেতর নিয়ে আসে

www.pathagar.com

নানারূপ দুর্দশা ও দুর্গতি । ফলে শুরু হয় নানারূপ যুদ্ধ-বিগ্রহ, সংঘর্ষ ও সংঘাত । এর চুলচেরা হিসাব বা খতিয়ান কেউ করে না, কেউ খোঁজও রাখে না । কেউ খোঁজ করতে বা জানতে চেষ্টাও করে না । কিন্তু তাই বলে সংঘাত বন্ধ হয়নি, হতে পারে না, হবে না । কারণ এটা প্রকৃতি । কেউ অস্বীকার করলেই প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে না, কোনদিন হয়নি এবং কোনকালে হবেও না ।

এ সংঘাতের বাইরের রূপ বা প্রকাশ দেখে কেউ চমকে দাঁড়িয়েছে, কেউ নতুন সমাধান দিয়েছে, কেউ নতুন নতুন দর্শন বা মতবাদ তুলে ধরেছেন । এতে বর্ষার স্রোতের মতো মানবগোষ্ঠীর কতকাংশকে কতদূর কিছুকালের জন্য ভাসিয়ে নিয়ে গেছে । বর্ষার সময় নদীনালায় বহু জিনিস ভেসে যায় । যে নদীতে স্রোত বেশি সে বেশি বহন করে, যার স্রোত কম, সে কম বহন করে । কোনটা কিছু দিন পরে মরে যায় । আবার নতুন নালা বা নদীর উৎপত্তি হয় । জগতের অনেক বড় বড় নদী অনেক কাল ধরেই টিকে আছে । ধর্ম, আদর্শ ও মতবাদেরও একই দশা । সাধারণত মানুষ যে পরিবেশ ও সমাজে লালিত-পালিত হয় তার ছাপই তার চরিত্রে লাগে বেশি মাত্রায় । কিন্তু কেউ যদি তার ব্যতিক্রম করতে চায় তাহলেই তাকে স্বকীয় পরিবেশ ও সমাজের সাথে লড়াই করতে হয় । নদীর স্রোতও যদি চলার পথে কোন শক্ত বাধার সম্মুখীন হয় তবে সে দুর্বার এবং দ্বিগুণ শক্তিতে সে বাধা অতিক্রম করতে চেষ্টা করে, এর ফলে হয় সে পুনরায় মুক্ত ধারায় প্রবাহিত হবার সুযোগ পায়, নয়তো চিরকালের মতো মৃত্যুবরণ করে। বাধা যদি প্রবল হয়, অনতিক্রম্য হয়, যদি শক্ত মাটি, গাছ বা পাহাড়-পর্বত স্রোতের বেগকে উপেক্ষা করেও আকাশের দিকে গর্ব ভরে দাঁড়িয়ে থাকে মাথা উঁচু করে, তবে নদী হার মানতে বাধ্য হয়। তার গতির মোড় সে ফিরিয়ে নেয় অন্যদিকে । এ কারণেই যুগ যুগ ধরে হিমালয় পর্বত এবং তার সর্বোচ্চ শিখর মাউন্ট এভারেষ্ট বিশ্ব-বুকে সগৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে । যুগে যুগে চিন্তানায়ক ও আদর্শবাদী মহাপুরুষদের নতুন আদর্শ, নতুন মতবাদের ঠিক ঐ একই দশা হয়েছে ।

সুতরাং পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ ও আবেষ্টনীতে গা-ভাসা দিয়ে না চললে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অপমান, অত্যাচার, উৎপীড়ন সবকিছুর জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকতে হয় । চোখ বুঁজে এসব সইতে হয় । যত বাধা-বিঘ্ন, অত্যাচার-উৎপীড়নই জীবনে আসুক না কেন, তবুও মাউন্ট এভারেষ্টের মতো

www.pathagar.com

মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন ও কর্তব্য পালন করার জন্য নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা, সাধনা ও সংগ্রাম করতে হবে । তা হলে দুনিয়ার কোন শক্তিই তাদের রুখতে পারবে না । বাস্তবিক চেষ্টা ও সাধনা দ্বারা যাঁরা সত্যের সন্ধান পেয়েছেন তাঁরা কখনও এসব উৎপীড়ন এমনকি মৃত্যু ভয়ে পর্যন্ত ভীত না হয়ে নতুন উদ্যমে এগিয়ে চলেন পথের সব বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে ।

বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন জাতির ভেতর দু'-একজন মহাপুরুষ ও চিন্তানায়ক নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা ও কঠোর সাধনা দ্বারা সত্যের উপলব্ধি করে স্বকীয় সমাজ-জীবনে যেসব বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছেন, তা এখনও সবার পক্ষে সম্ভবপর । তাই এ সাধারণ চেষ্টা, সাধনা ও সংগ্রামকে ইসলাম সার্বজনীন রূপদান করেছে । ইসলাম তাই প্রত্যেক মানুষকে নিজের এবং নিজ পরিবেশের সাথে অহরহ জিহাদ করে মানুষের ব্যক্তি ও সমষ্টিগত কল্যাণকর কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে । স্বকীয় সমাজ ও পরিবেশের কাছে আত্মসমর্পণ না করে বিশ্বের সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য অবিরাম চেষ্টা ও সাধনা করার মহান শিক্ষাই পাই আমরা জিহাদের ভেতর ।

আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে প্রতি মুহূর্তে ঠিক এমনি জিহাদ করতে হয় । কিন্তু চরম পরিতাপের বিষয় এই যে, আমরা খোঁজ বা খবর না রেখে এবং এর একটা সুষ্ঠু, সুন্দর সমাধান বা সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা না করে কখনও বাপ-মায়ের, কখনও ভাইয়ের, কখনও বোনের, বংশের, পরিবারের, বন্ধুর, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর, সমাজের ও পরিবেশের আবেষ্টনীতে গা-ভাসা দিয়ে চলি । মন কি চায়, প্রাণ কি চায়, দেহ কি চায়, মস্তিষ্ক কি চায়, সমাজ কি চায় এবং পরিবেশ কি চায় এসব প্রশ্নে মন ও মস্তিষ্ককে চালনা করে কখনও তা সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাধান ও সমন্বয় সাধন করতে চেষ্টা করিনি । অনেক সময় মন একটা চায়, প্রাণ হয়তো আর একটা কিছু, দেহ হয়তো সম্পূর্ণ অন্য কিছু, মস্তিষ্ক আর কিছু ; কিন্তু আবেষ্টনীর চাপে সব মরে শুষ্ক কাঠ হয় । আবেষ্টনীর কাছে সব চেয়ে আগে আত্মসমর্পণ করে মস্তিষ্ক । মস্তিষ্ক খাসা খাসা যুক্তি নিয়ে এগিয়ে আসে—একি বলবে, ওকি বলবে, বাপ-মা, ভাই-বন্ধু, বংশ-পরিবার, সমাজ কি বলবে—মুহূর্তে সব আশা-আকাংক্ষা উড়িয়ে দেয় । আত্মসমর্পণকারী মস্তিষ্ক, দেহ মন ও প্রাণকে বঞ্চনা করে । এমনিভাবে যুগে যুগে পরিবেশ ও আবেষ্টনীর চাপে এবং সহজে আত্মসমর্পণকারী মস্তিষ্কের উর্বর যুক্তিতর্কের বহরের ফলে মানুষ আত্মপ্রবঞ্চিত হয়েছে, হচ্ছে, আরও

www.pathagar.com

হবে। আপনি হয়েছেন, আমি হয়েছি, সবাই হয়েছে। লাভ-লোকসানের জেরটা দেখুন, সতর্ক হউন, সাবধান হউন, সাহস করুন এবং আজই আপনি নিজের ও পরিবেশের জিহাদ শুরু করুন। মানুষ তা না করার ফলেই যুগে যুগে প্রবঞ্চিত হয়েছে—স্বাস্থ্য হারিয়েছে, সুখ হারিয়েছে, শান্তি হারিয়েছে। সমগ্র দুনিয়া আজ শান্তি শান্তি বলে হয়রান অথচ অশান্তি বেড়ে চলছে। সত্যের বুলি আওড়ালেও অসত্য ও মিথ্যার উপর সব কিছু দাঁড়িয়ে আছে। ধর্মের নামে অধর্ম, ন্যায়ের নামে অন্যায়, বিচারের নামে অবিচারের প্রহসন চলছে। আর কতকাল এ সব মিথ্যা মায়া-মরীচিকার পিছনে ঘুরে মরবো ? আর কতদিন এভাবে আমরা প্রবঞ্চিত হবো ? আর কতদিন এসব সভ্যতা ও প্রগতির প্রহসন চলবে ? এসব প্রশ্নের সত্যিকার মীমাংসা ও সমাধান করতে সকলের আগে প্রয়োজন নিজের সাথে নিরবচ্ছিন্ন জিহাদ করে স্রষ্টা ও সৃষ্টির উদ্দেশ্য, বিশ্বের ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতি সাধনের জন্য এসব সংঘাতের সুষ্ঠু ও সুন্দর সমন্বয় সাধনপূর্বক স্বকীয় কর্তব্য পালন করা। এটা করতে গিয়ে কোন বিপদ-আপদ বা বাধা-বিঘ্নের সামনে মাথা নত না করার মনোভাবই আমাদের গড়ে তুলতে হবে। বস্তুত এরূপ জিহাদী বা সংগ্রামী মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার উপরই নির্ভর করে আমাদের ভবিষ্যত।

মনের ভেতর অহরহ যে লড়াই হচ্ছে তারই বাইরের প্রকাশ আমরা দেখতে পাই সমাজ ও পরিবেশের ভেতর। পবিত্র কুরআনে বহুবার স্বকীয় শক্তি, ক্ষমতা ও যোগ্যতার যথাসাধ্য ব্যবহার ও প্রয়োগকেই জিহাদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ 'এবং যারা আমাদের (আল্লাহ্‌র) পথে যথাসাধ্য চেষ্টা সাধনা ও সংগ্রাম করে (জাহাদু) আমরা অবশ্যই তাদেরকে আমাদের পথে পরিচালিত করবো এবং যারাই সৎকাজ করেন আল্লাহ্ তাদের সাথেই আছেন' (২৯ ঃ ৬৯)। এর আগের আয়াতেই বলা হয়েছে ঃ 'এবং যারাই যথাসাধ্য চেষ্টা, সাধনা ও সংগ্রাম করে, সে তার নিজের আত্মার জন্যই তা করে অর্থাৎ নিজের আত্মার সুখ, শান্তি ও উন্নতির জন্য, কারণ আল্লাহ্ স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং দুনিয়ার প্রয়োজনের অনেক উপরে' (২৯ ঃ ৬)। এভাবে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত হতে একথা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, যথাসাধ্য চেষ্টা, সাধনা ও সংগ্রাম করে আল্লাহ্‌র পথে স্বকীয় জীবন পরিচালিত করে স্বকীয় সুখ, শান্তি, উন্নতি, প্রগতি, কল্যাণ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্যই জিহাদ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মক্কায় অবতীর্ণ আরও বিভিন্ন আয়াতে জিহাদের কথা উল্লেখ

www.pathagar.com

আছে ঃ 'এবং আল্লাহ্‌র জন্য এমন কঠোর সংগ্রাম করো, যা তাঁর প্রতি উপযুক্ত' (২২ ঃ ৭৮)। 'সুতরাং অবিশ্বাসীদের অনুসরণ করো না এবং তাদের বিরুদ্ধে বিরাটভাবে এটা দ্বারা সংগ্রাম করো,' (২৫ ঃ ৫২)। প্রথম আয়াতে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করার জন্য এবং দ্বিতীয় আয়াতে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার নির্দেশ বস্তুত ইসলামের আদর্শ তাদের ভেতর প্রচার করারই নির্দেশ। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করে স্বকীয় ইন্দ্রিয় ও রিপুকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করা এবং অবিশ্বাসী ও অত্যাচারীর বিরুদ্ধে জিহাদ করার নির্দেশই পবিত্র কুরআনে দেয়া আছে । অবিশ্বাস, অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রচার করে সত্য ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করবার প্রচেষ্টা করার দরুনই মুসলমানদের মক্কা হতে মদীনায় হিজরত করতে হয়েছিলো । কিন্তু মদীনায় হিজরত করার পরও যখন অবিশ্বাসী কাফিরগণ ক্ষান্ত না হয়ে মুসলমানদের আক্রমণ করলো তখন শুধু আত্মরক্ষার জন্যই কেবল বাস্তব যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হলো । মদীনায় অবতীর্ণ সুরাসমূহেও জিহাদ ব্যাপক অর্থে কাজ, কথা ও যুদ্ধ করার জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে ঃ 'হে পয়গম্বর, কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করো এবং তাদের নিকট নত হইও না এবং জাহান্নামই তাদের আশ্রয় স্থান এবং অমঙ্গলই তাদের নিয়তি' (৯, ৭৩)। এখানে শুধু কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদের সাথে সাথে মুনাফিকদের বিরুদ্ধেও জিহাদ করার জন্য কড়া নির্দেশ দেয়া হয়েছে । বস্তুত যারা মুখে বা নামে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়, অথচ কাজেকর্মে ইসলামের মূলনীতি ও আদর্শ বাস্তব জীবনে রূপায়িত করে না তাদের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করতে বলা হয়েছে । এ সংগ্রাম প্রয়োজনবোধে মুখে, কথায় ও কাজের ভেতর দিয়ে হতে পারে । অবশ্য এর চরম পরিণতি যুদ্ধ-বিগ্রহে রূপ নিতে পারে । সে যুদ্ধে, ধর্মী বা বিধর্মীর প্রশ্ন নেই । সে যুদ্ধ হবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে । পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে ঃ "ইসলাম ধর্ম প্রচারে বলপ্রয়োগ নেই ।" পবিত্র কুরআন এবং হাদীসের কোথাও একথা উল্লেখ নেই যে, বলপূর্বক সবাইকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে হবে । বিধর্মিগণ সত্য প্রচারে বাধা দিলে এবং মুসলমানদের আক্রমণ করলে রসূলে করীম বিধর্মীদের সাথে জান, মাল এবং জিহ্বা দ্বারা জিহাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন । পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ 'যারা তোমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য কঠোর সংগ্রাম করো এবং কোন

www.pathagar.com

অবস্থায়ই আক্রমণমূলক জিহাদে অবতীর্ণ হইও না এবং আল্লাহ্ আক্রমণকারীদের পছন্দ করেন না' (২ ঃ ১৯০)। এখানেও সুস্পষ্ট এই নির্দেশই দেয়া হয়েছে যে, মুসলমানগণ কখনও আক্রমণ করবে না কিন্তু যখন তাদেরকে কেউ বাধা দেয় অথবা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তবে তাদের পক্ষে জিহাদ করা অপরিহার্য কর্তব্য। আত্মরক্ষামূলক জিহাদই হলো আল্লাহ্র পথে পবিত্রতম জিহাদ। ইসলাম শুধু এরূপ জিহাদই সমর্থন করে।

সুতরাং জিহাদ বললে শুধু বিধর্মীদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং হত্যা-লুন্ঠন অথবা বলপূর্বক ধর্মপ্রচার মনে করা সম্পূর্ণ ভুল। জিহাদের অর্থ তা নয়। জিহাদের অর্থ প্রাণপণ চেষ্টা, সাধনা ও সংগ্রাম করা। কোন সদুদ্দেশ্যে কায়মনবাক্যে চেষ্টা করার নামই জিহাদ। জিহাদ তাই শুধু যুদ্ধ-বিগ্রহ বা হত্যা-লুন্ঠন নয়। বাক্য দ্বারা, লেখনী দ্বারা, মাল দ্বারা, জান দ্বারা নানা প্রকারেই জিহাদ করা যায়। সামান্য মুখের কথা হতে জীবনদান পর্যন্ত জিহাদের সীমানা। অন্যায়, অধর্ম ও সত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপন আদর্শ ও মতবাদকে জয়যুক্ত করার একনিষ্ঠ সাধনার নামই জিহাদ। জিহাদ তাই নিষ্ক্রিয়তা ও উদাসীনতার সম্পূর্ণ বিপরীত। জিহাদ কি এবং কি নয়, আল্লাহ্তা'আলা পবিত্র কুরআনে অতি সুন্দরভাবে তা ব্যাখ্যা করেছেন ঃ 'মুসলিমদের ভেতর যারা অক্ষতদেহে নিশ্চেষ্ট বসে থাকে এবং যারা নিজেদের মাল ও জান দ্বারা আল্লাহ্র রাহে প্রাণপণ চেষ্টা ও সাধনা (জিহাদ) করে, —উভয়ের মর্যাদা সমান নয়। আল্লাহ্ মাল ও জান দিয়ে জিহাদকারীদের অপর ব্যক্তিদের অপেক্ষা বহু গুণে উত্তম করেছেন এবং প্রত্যেককেই তিনি মঙ্গল করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং আল্লাহ্ নিশ্চেষ্ট ব্যক্তিদের অপেক্ষা মুজাহিদদের বিপুলভাবে পুরস্কৃত করবেন' (৫ ঃ ৯৫)।

'কাজেই ইসলাম প্রচার জিহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হতে পারে না ; বরং ইসলামের সংরক্ষণকে জিহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য বলা যেতে পারে। জিহাদ কোন সময়ই আক্রমণমূলক নয়—আত্মরক্ষামূলক। বিশ্ব-মানবের কল্যাণ ও শান্তির জন্যই জিহাদের ব্যবস্থা। অত্যাচার বা অনাচার থাকলেই জিহাদ, না থাকলে জিহাদ নেই। ইসলাম এনেছে বিশ্বশান্তির বাণী ; সকল জাতি ও সকল সম্প্রদায় আপন আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে পরস্পর শান্তিতে বাস করুক এটাই ইসলামের উদ্দেশ্য। এ শান্তি রাজ্য স্থাপনে বা সংরক্ষণে যখন বিঘ্ন জন্মে, তখনই হয় জিহাদের প্রয়োজন। আল্লাহ্র রাজ্যে সীমান্তরক্ষী সেনাদলই হচ্ছে

www.pathagar.com

জিহাদকারী বীর মুজাহিদ দল । বিধর্মীরা যখন অন্যায়ভাবে এ রাজ্য আক্রমণ করে, অথবা শান্তির ব্যাঘাত ঘটায়, তখনই ডাক পড়ে এই মুজাহিদ দলের । তারা তৎক্ষণাৎ ঘটনা স্থলে নেমে যায় এবং অনাচার নিবারণে সর্বপ্রকার চেষ্টা করে ; শান্ত কথায় না হলে অস্ত্র ধারণ করে । তারপর সে অনাচার থেমে যায়, সাথে সাথে জিহাদও থেমে যায় ! তা হলে দেখা যাচ্ছে, যে-সে যুদ্ধকেই জিহাদ বলে না । আল্লাহ্‌র জন্য না হলে কোন যুদ্ধই জিহাদ নয়—হয় না । বলা বাহুল্য এই 'আল্লাহ্‌র জন্য' মানেই হচ্ছে ধর্ম, ন্যায়, নীতি ও আদর্শের জন্য । কাজেই জিহাদের সাথে একটা পবিত্রতার ছাপ আছে । কোন যুদ্ধ জিহাদ কি-না, তা নিরূপিত হতে পারে তার অন্তর্নিহিত প্রেরণা ও উদ্দেশ্য দেখে। ব্যক্তি বা দলগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা নরহত্যা করলে তাকে জিহাদ বলা যেতে পারে না ।'

জিহাদ যে 'আল্লাহ্‌র জন্যই' করতে হয় পবিত্র কুরআনে তা স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করেছে ঃ 'আল্লাহ্‌র পথে, যুদ্ধ করো এবং জান যে আল্লাহ্ শ্রোতা ও জ্ঞাতা' (২ ঃ ২৪৪)। জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ 'তোমাদের এমন কোন কারণ থাকতে পারে যে তোমরা আল্লাহ্‌র পথে (ধর্ম, সত্য, ন্যায় ও আদর্শের পথে) যুদ্ধ করবে না এবং অসহায়া স্ত্রীলোক এবং বালক-বালিকাদের জন্য যারা বলে হে আমাদের প্রভু আমাদের এ শহর হতে দূরে নিয়ে যাও যার অধিবাসীরা অত্যাচারী এবং তোমার পক্ষ হতে আমাদের জন্য একজন অভিভাবক ও সাহায্যকারী দাও' (৪ ঃ ৫৭)। জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কত পবিত্র ও মহত । জিহাদে নেমেও মুসলমানরা যাতে বিধর্মীদের উপর অযথা অত্যাচার উৎপীড়ন না করে সে জন্য আল্লাহ্ বার বার সতর্ক করে দিয়েছেন ঃ 'তোমাদের সাথে যারা যুদ্ধ করে, তোমরাও তাদের সাথে যুদ্ধ করো ; কিন্তু সীমা লঙঘন করো না । কারণ আল্লাহ্ সীমা লঙঘনকারীদের ভালোবাসেন না' (২ ঃ ১৯০)। আর বিধর্মী হলেই যে নির্বিচারে তাদের সকলের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করতে হবে, তাও নয় । বিধর্মীদের ভেতর যদি কোন সম্প্রদায় বা জাতি মুসলমানদের সাথে কোনরূপ চুক্তি বা সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হয় অথবা কোনরূপ ক্ষতি না করে তাদের বিরুদ্ধে অসি ধারণ করতে নেই । তাই আল্লাহ্ বলেছেন ঃ '(অত্যাচারী মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো) কেবল তারা ছাড়া যাদের সাথে তোমরা কোন সন্ধি স্থাপন করেছ । তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করেননি অথবা তোমাদের বিরুদ্ধে অপর

www.pathagar.com

কাউকেও সাহায্য করেনি ; অতএব মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে তোমাদের সন্ধি-শর্ত পালন করো । নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরই ভালবাসেন যারা নিজের কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ' (৯ ঃ ৪)। জিহাদের অবস্থায়ও যদি কোন বিধর্মী কোন মুসলমানের শরণাপন্ন হয়, তবে তাকে আশ্রয় দিতে হবে অথবা তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিতে হবে । পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ 'বিধর্মীদের ভেতর যদি কেউ তোমাদের শরণাপন্ন হয়, তাকে আশ্রয় দাও—যে পর্যন্ত না সে আল্লাহ্র বাণী শোনে ; অতপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দাও । এরূপ করতে হবে, কেননা তারা ভ্রান্ত ও অজ্ঞ' (৯ ঃ ৬)। তবে বিধর্মীরা যদি প্রবঞ্চনা বা ধোঁকাবাজী দ্বারা মুসলমানদের কোনরূপ ক্ষতি করতে চায় এবং যদি নিশ্চিতরূপে বোঝা যায় তারা তাদের চুক্তি অনুসারে কাজ করবে না, তবে তখন মুসলমানেরাও নিজেদের চুক্তি বাতিল করে কাফিরদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে পারে । এ সম্পর্কে কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ 'যদি তোমরা আশঙ্কা করো যে, বিধর্মীরা বিশ্বাসঘাতকতা করবে তবে তোমরাও তাদের সাথে সেরূপ ব্যবহার করো । নিশ্চয় আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতকদের ভালবাসেন না' (৮ ঃ ৫৮)। রসূলে করীম (সা) বলেছেন ঃ 'যুদ্ধ ধোঁকাবাজীপূর্ণ।' তবে বিধর্মীদের অত্যাচার-উৎপীড়ন থেমে গেলে অথবা বিধর্মীরা সন্ধি করলে তখনই জিহাদ বন্ধ করতে হবে ঃ 'তাদের সাথে যুদ্ধ করো যে পর্যন্ত না অত্যাচার থেমে যায় এবং ধর্ম শুধু আল্লাহ্র জন্যই ; কিন্তু যদি তারা ক্ষান্ত হয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ দেখতে পাবেন তারা কি করে' (৮ ঃ ৩৯)। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হচ্ছে যে, জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অতি মহত এবং উহার বিধি-নিষেধও সত্যিকার মানব প্রেম দ্বারা উদ্বুদ্ধ ।

আল্লাহ্ ও রসূল জিহাদকে কোন্ চক্ষে দেখেন ? যারা জিহাদ করবে আল্লাহ্ তাদের কি পুরস্কার দেবেন ? অন্য কথায় জিহাদের মর্যাদা কতখানি ? সে কথাই এবার আলোচনা করা যাক । জিহাদ আল্লাহ্র কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ । আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'যারা বিশ্বাস করেছে এবং হিজরত করেছে এবং তাদের মাল ও জান দ্বারা আল্লাহ্র রাহে জিহাদ করেছে, তাদের সম্মান আল্লাহ্র কাছে অতি উঁচু এবং তারা সবচেয়ে লাভবান হবে' (২ ঃ ২৩)। অন্যত্র বলা হয়েছে, 'হে মুমিনগণ, আমি কি তোমাদের এমন একটি লাভজনক কাজে চালিত করব—যা তোমাদের কঠোর শাস্তি হতে মুক্তি দেবে ? তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ এবং রসূলের উপর ঈমান আনবে এবং তোমাদের মাল ও

www.pathagar.com

জান দ্বারা আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করবে ; এটাই তোমাদের জন্য মঙ্গল যদি তোমরা জানো ।' তিনি তোমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করবেন এবং জান্নাতে স্থান দেবেন—'যার নিম্নে নদীসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে এবং যার উদ্যানে অনন্তকাল স্থায়ী বাসগৃহ আছে। এটাই হচ্ছে সব চাইতে লাভজনক কাজ' (৬ ঃ ১০-১২)। শুধু একথা বলেই ক্ষান্ত না হয়ে জিহাদ করে যারা শহীদ হবে, তারা যে মৃত নয়, তারা যে অমর আল্লাহ্‌ তা পরিষ্কারভাবেই ঘোষণা করেছেন ঃ 'যারা আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করে শহীদ হয়েছে, তাদের মৃত বল না ; তারা চির জীবিত । কিন্তু তোমরা জানো না' (২ ঃ ৩৫)। আর জিহাদ করে যারা বিজয়ী হয়ে বেঁচে থাকে তাদের উভয় জীবনে লাভ । মরলে তারা শহীদের দরজা লাভ করবে এবং জীবিত থাকাকালেও তারা সম্মান ও পদমর্যাদার অধিকারী হবে । বিজয়ী মুজাহিদ দল 'গাজী' উপাধিতে ভূষিত হবে এবং জিহাদলব্ধ ধন-সম্পদ—এমন কি রাজ্যের অধিকারী হবে । এরূপে ইহকাল-পরকাল এবং দুনিয়া ও আখিরাত সর্বত্রই তারা লাভবান হবে । রসূলে করীম (সা) ও জিহাদকে তুল্য রূপেই মর্যাদা দান করেছেন । জিহাদ সম্পর্কে তার নির্দেশের তুলনা হয় না । তিনি বলেছেন ঃ (১) 'নিশ্চয় জান্নাতের দরজা তলোয়ারের ছায়াতলে অবস্থিত ।' (২) 'নিশ্চয় সৈন্যদের কাতারে দাঁড়ানো ষাট বছরের সালাতের চেয়েও উত্তম ।' (৩) 'যে কেহ জিহাদের কোন আঘাত না নিয়ে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করবে, তার অঙ্গে ত্রুটি আছে বলে মনে করতে হবে ।' (৪) তাঁর শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন—কতই না আমি ভালবাসি যে, আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করি এবং শহীদ হই, আবার জীবিত হয়ে জিহাদ করি এবং শহীদ হই ।'

'এরূপভাবেই আল্লাহ্‌র এবং তাঁর রসূল জিহাদকে মর্যাদা দিয়েছেন । জিহাদকে অতবড় মূল্য ও মর্যাদা দেয়া কি অন্যায় ও অসংগত হইয়াছে ? নিশ্চয়ই না । জিহাদ অপেক্ষা আর কোন্ পুণ্য কাজ—আর কোন্ মহৎ কাজ মানুষের জন্য থাকতে পারে ? অন্যায়, অধর্ম, দুর্নীতি, জুলুম, অসত্য ও অসুন্দরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা অপেক্ষা মানব-জীবনে আর কোন্ বড় কর্তব্য থাকতে পারে ? আল্লাহ্‌র রাজ্য কায়েম রাখার জন্য জান-মাল সবকিছু কুরবান করে দিতে পারলেই তো এ জীবন ধন্য হয় । সমস্ত পশুভাবের বিরুদ্ধে তনু-মন-প্রাণের এ বিদ্রোহ এ দৃঢ় সংকল্প—আল্লাহ্‌র উপর এ পরম নির্ভরতা ও আত্মসমর্পণ, ধন-জন,

www.pathagar.com

পুত্র-পরিবার সবকিছু পেছনে ফেলে আল্লাহ্‌র জন্য বিরাট আত্মত্যাগ কত বড় পুণ্য ও গৌরবের কাজ। এর মধ্যেই তো দেখি মানবের সর্বোত্তম জয় ঘোষণা। তুমি মুসলমান ? ইসলাম তোমার ধর্ম ? আল্লাহ্-রসূলকে তুমি ভালবাসো ? তার প্রমাণ কি ? তার প্রমাণ এই জিহাদ।' কাজে কাজেই যারা জিহাদ করে, তারাই যে আল্লাহ্‌র খাস বান্দা বা প্রতিনিধি এবং শুধু তারাই যে দুনিয়ার উপর আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বমূলক সমাজ ও শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার অধিকারী একথা বলাই বাহুল্য।

জিহাদের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য যে কত মহত এবং বিশ্বজনীন এবং মানব-জাতির সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য এর প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি তা একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই হৃদয়ঙ্গম হয়। পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ '(মুসলমানদের ভেতর) যাদের বিরুদ্ধে বিধর্মীরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তাদের যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হলো, কারণ তারা অত্যাচারিত হচ্ছে এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করতে সক্ষম—যারা অন্য কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতীত শুধু 'আল্লাহ্ আমাদের প্রভু' এই কথা বলার অপরাধে গৃহ হতে বিতাড়িত হয়েছে এবং যদি এরূপে আল্লাহ্ এক দলকে অপর দল দ্বারা বিধ্বস্ত না করতেন, তবে নিশ্চয়ই গির্জা, মঠ, মন্দির ও মসজিদ—যেখানে নিশিদিন আল্লাহ্‌র গুণগান ধ্বনিত হয়—সবকিছুই ধ্বংসপ্রাপ্ত হতো এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করবেন যারা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যকে জয়যুক্ত করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বলশালী এবং ক্ষমতাবান' (২২ ঃ ৩৯-৪০১)। স্রষ্টা ও সৃষ্টির উদ্দেশ্য সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য যারাই চেষ্টা, সাধনা ও সংগ্রাম করবে তারাই জয়যুক্ত হবে। কি চমৎকার আদর্শ। কত মহত ও সাধু এর উদ্দেশ্য। কিন্তু চরম পরিতাপের বিষয় এই যে, বিধর্মীরা জিহাদের কি জঘন্য মূর্তিই না জগতের সামনে তুলে ধরেছে। আর মুসলমানরাও এর সত্যিকার অর্থ ও তাৎপর্য উপলব্ধি করে ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে এর বাস্তব প্রয়োগ ও ব্যবহার করছেন না। ফলে মানুষের চরম দুর্দশা ও দুর্গতি দিন দিন বেড়েই চলেছে। রসূলে করীম (সা) বলেছেন ঃ 'আল্লাহ্‌র নামে এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য নিয়ে রসূলের ধর্মের জন্য অগ্রসর হও; দুর্বল ও বৃদ্ধকে অথবা শিশু ও স্ত্রীলোককে হত্যা করো না এবং তাদের সাথে প্রতারণা করো না। লুন্ঠিত দ্রব্য সংগ্রহ করো। লোকের মঙ্গল করো এবং তাদের প্রতি দয়া করো। কারণ আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন, যারা অপরকে দয়া করে।' শুধু হযরত মুহম্মদ কেন তাঁর ইন্তিকালের পর

www.pathagar.com

খলীফাগণও হযরতের আদর্শ ও নীতি পালন করে গিয়েছেন। সিরিয়া অভিযানে হযরত আবু বকর (রা) সেনাপতি ওসামা-বিন-জায়েদকে নিম্নলিখিত উপদেশ দান করেছিলেন ঃ "শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতা করো না। শত্রুকে অমানুষিকভাবে হত্যা বা অঙ্গহানি করো না, কোন শিশু, বৃদ্ধ অথবা স্ত্রীলোককে হত্যা করো না, খেজুর বনে আগুন দিও না বা খেজুর গাছ কেটে ফেলো না। নিজেদের খাদ্যের প্রয়োজন ব্যতীত কোন মেষ, গরু বা উট বধ করো না। পথিমধ্যে যদি কোন মঠ বা ভজনালয় দেখ নীরবে শান্তভাবে সেখান হতে চলে যাবে।"

জিহাদে নারীদেরও যোগদান করার অধিকার আছে। শিশু-বৃদ্ধ-নর-নারী নির্বিশেষে প্রত্যেক মুসলমানের জিহাদে সাহায্য করা ফরজ। যিনি যেরূপভাবে পারেন, তিনি সেরূপেই আল্লাহ্‌র উদ্দেশে বিশ্বের সমষ্টিগত কল্যাণ সাধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা, সাধনা ও সংগ্রাম করবেন—এটাই ইসলামের বিধান। কাজেই জিহাদের সময় নারীদের নিশ্চেষ্ট বসে থাকার কথা নয়। তারাও পুরুষের পাশে এসে দাঁড়াবে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে এবং প্রতি কাজে। যুদ্ধের ময়দানে তারা প্রধানত সেবা ও সাহায্য করবে। হযরত মুহম্মদ যখনই জিহাদে যেতেন তখনই কোন না কোন স্ত্রীকে সঙ্গে নিতেন এবং অপরাপর নারীদেরও যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দিতেন। নারীরা আহত বীরদের সেবা-শুশ্রূষা করতেন। রসূলে করীম (সা) বলেছেন ঃ 'তাঁরা (মেয়েরা) সৈন্যদের পানি পিলাতেন এবং আহতদের সেবা-শুশ্রূষা করতেন।' উম্মে আতিয়া বলেছেন ঃ 'আমি রসূলুল্লাহ্‌র সাথে সাতটি যুদ্ধে যোগ দিয়েছি। আমি সৈন্যদের পশ্চাতে থেকে তাদের মালপত্র দেখা-শুনা করতাম; তাঁদের জন্য খাবার তৈরি করতাম, আহতদের সেবা করতাম এবং রুগ্নদের শুশ্রূষা করতাম। বস্তুত জিহাদের জন্য যে কোন সাহায্যও জিহাদ। যে যুদ্ধে গেল, যে অন্ন দ্বারা, বস্ত্র দ্বারা, অর্থ দ্বারা সাহায্য করলো, সেবা ও শুশ্রূষা করলো, যে জিহাদের উপকরণ সংগ্রহ করে আনলো—প্রত্যেকের কাজই জিহাদের অন্তর্ভুক্ত এবং প্রত্যেকেই তার জন্য পুরস্কার পাবে।' পবিত্র কুরআনেও এ সম্পর্কে ঘোষণা রয়েছে ঃ 'যারা বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ্‌র রাহে ছুটে গিয়ে জিহাদ করে এবং যারা তাদের আশ্রয় দেয় বা সাহায্য করে—তারাই সত্যিকার মু'মিন এবং তারা ক্ষমা ও সম্মানজনক পুরস্কার পাবে' (৮ ঃ ৭৪)।

www.pathagar.com

জিহাদের ময়দানে কোন মুসলমান যাতে পশ্চাৎপদ না হয় বা পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করে, সে জন্য আল্লাহ্ বার বার সতর্ক করে দিয়েছেন ঃ 'হে মুমিনগণ, যুদ্ধপ্রয়াসী কাফিরদের সাথে যখন তোমরা মুকাবিলা করবে, তখন কিছুতেই তাদের পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না এবং সেদিন যে-কেহ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে, কেবলমাত্র তারা ছাড়া যারা সমর কৌশলের জন্য সাময়িকভাবে হটে আসবে অথবা পুনরায় আক্রমণের জন্য নিজ দলে ফিরে আসবে,—তারা নিশ্চয়ই আল্লাহ্র ক্রোধের পাত্র হবে এবং জাহান্নামই হবে তাদের বাসস্থান এবং নিশ্চয়ই এটা তাদের পক্ষে এক অমঙ্গলজনক নিয়তি' (৮ ঃ ১৫-১৬)। জিহাদের সময় মুসলমানরা যাতে কোন বিধর্মীকে বন্ধুরূপে বা পরিচালকরূপে গ্রহণ না করে, সে জন্য আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'মু'মিনগণ যেন মুসলমান ছাড়া অপর কোন বিধর্মীকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে' (৩ ঃ ২৭)। এর কারণস্বরূপ অন্যত্র আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'হে মুমিনগণ মুসলমান ছাড়া অপর কাউকে তোমরা তোমাদের বন্ধুস্বরূপ গ্রহণ করো না, কারণ তারা তোমাদের ক্ষতি করতে কুন্ঠিত হয় না এবং যা তোমাদের অনিষ্ট করে, তাই তারা চায় ; তাদের অন্তরে যা লুক্কায়িত আছে, তা আরো ভয়ানক । নিশ্চয়ই আমরা (আল্লাহ্) তোমাদের জন্য পরিষ্কার নিদর্শন দিয়েছি—যদি তোমরা বুঝতে পারো' (৩ ঃ ১১৭)। জিহাদের সময় অনেক দুর্বল চেতা ব্যক্তি এবং মুনাফিক দেখা যায় । আল্লাহ্ তাদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন । এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ 'মুনাফিক পুরুষ এবং মুনাফিক নারীদের এবং অবিশ্বাসীদের আল্লাহ্ জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন বলে ওয়াদা করেছেন ; এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট এবং আল্লাহ্ তাদের অভিশপ্ত করেছেন এবং তারা চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে' (৯ ঃ ৬৮৯)। রসূলে করীম (সা) বলেছেন ঃ 'যে কেহ জিহাদ করবে না অথবা অস্ত্রশস্ত্র জোগাবে না, অথবা মুজাহিদদের পরিত্যক্ত পরিবারবর্গকে সততার সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করবে না তাকে আল্লাহ্ রোজ কিয়ামতের আগে নিশ্চয়ই কোন না কোন মুসিবত-এ ফেলবেন ।' জিহাদের সময় মুসলমানগণ যাতে ধৈর্যের সাথে একতাবদ্ধ হয়ে থাকে এবং নিজেদের ভেতর বিভেদ সৃষ্টি না করে, সেজন্য আল্লাহ্ বিশেষভাবে মুসলমানদের সাবধান করে দিয়েছেন ঃ 'হে মুমিনগণ, যখন তোমরা কোন শত্রুদলের সম্মুখীন হও, তখন দৃঢ় হয়ে দাঁড়াও এবং আল্লাহ্কে বারে বারে স্মরণ কর, যাতে জয়ী হতে পারো এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে মান এবং পরস্পর ঝগড়া করবে না, কারণ, তা-হলে তোমরা ভেতরে ভেতরে দুর্বল হয়ে

www.pathagar.com

পড়বে এবং তোমাদের শক্তি চলে যাবে এবং 'ধৈর্যশীল হও, কারণ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন' (৮ ঃ ৪৫-৪৬)।

মুসলিম মুজাহিদদের আল্লাহ্ যে শুধু পরকালেই জান্নাত দান করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা নয় ; মুজাহিদদের তিনি যুদ্ধকালেও সাহায্য করবেন । আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'যখন তুমি (হযরত মুহম্মদ) আল্লাহ্র কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করলে, তখন তিনি তোমাকে উত্তর দিলেন ঃ আমি তোমাকে পর পর এক হাজার ফেরেশ্তা পাঠিয়ে সাহায্য করবো' (৮ ঃ ৯)। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ 'যখন তোমাদের প্রভু ফেরেশ্তাদের কাছে প্রকাশ করলেন যে, আমি তোমাদের সাথে আছি, অতত্রব মু'মিনদের নির্ভীক ও শক্তিশালী করো ; আমি কাফিরদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করবো' (৮ ঃ ১২)। আরও বলা হয়েছে ঃ 'অতএব তুমি তাদের হত্যা করনি, কিন্তু আল্লাহ্ তাদের হত্যা করেছেন এবং তুমি তাদের আঘাত করনি, কিন্তু আল্লাহ্ করেছেন' (৮ ঃ ১৭)। 'এবং জানো যে আল্লাহ্ মু'মিনদের সাথে থাকেন' (৮ ঃ ১৯)। 'আল্লাহ্ নিশ্চয়ই বদর যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছিলেন' (৩ ঃ ১২২)। 'হে নবী, আল্লাহ্ তোমার জন্য এবং তোমার উম্মতের জন্য যথেষ্ট' (৮ ঃ ৬৪)। এরূপে সদা সর্বদা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ ও সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ করলে মুসলমানেরা যে তাদের বহু গুণ অধিক শত্রু সেনাকে পরাজিত করতে পারে, আল্লাহ্ তাও সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন ঃ 'আপাতত আল্লাহ্ তোমাদের ভার লাঘব করে দিয়েছেন, কারণ, তিনি জানেন যে তোমাদের ভেতর দুর্বলতা আছে; অতএব যদি তোমাদের ভেতর একশ ধৈর্যশীল যোদ্ধা থাকে, তবে তারা দুইশ কাফিরকে পরাজিত করতে পারবে এবং তোমাদের ভেতর ঐরূপ এক হাজার যোদ্ধা থাকে, তবে তারা আল্লাহ্র হুকুমে দুই হাজার শত্রুকে পরাজিত করবে, এবং আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন' (৮ ঃ ৬৬)।

এ গেল দুর্বল অবস্থার কথা । দুর্বল থাকলেও মুসলমানরা তাদের দ্বিগুণ সংখ্যক শত্রু সেনার উপর জয়ী হতে পারে । কিন্তু নিজেদের ভেতর যদি কোন প্রকার দোষ-ত্রুটি না থাকে, তবে মুসলমানরা দশগুণ বেশি সেনাকেও অনায়াসেই পরাজিত করতে পারে ঃ 'হে নবী, মু'মিনদের যুদ্ধে উৎসাহিত করো, যদি তোমাদের ভেতর বিশজন ধৈর্যশীল যোদ্ধা থাকে, তবে তারা দুইশ কাফিরকে পরাজিত করবে; যদি তোমাদের ঐরূপ একশ থাকে তবে তারা এক হাজার কাফিরকে পরাজিত করবে, কারণ তারা অজ্ঞ' (৮ ঃ ৬৫)।

www.pathagar.com

এভাবে মহানবী হযরত মুহম্মদ (সা) আরবের অশিক্ষিত এবং অর্ধসভ্য যাযাবর বেদুঈন জাতির ভেতর এই জিহাদী বা সংগ্রামী মনোভাব গড়ে তুলেই দুনিয়ায় অপূর্ব বিপ্লব সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যারা সদা সর্বদা কলহ-কোন্দল, বিবাদ-বিসম্বাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, অন্যায়-অবিচার এবং দুর্নীতির ভেতর ডুবেছিলো, তারাই তৌহিদ-বাণীতে দীক্ষিত হয়ে এমন এক দুর্ধর্ষ সংগ্রামী এবং সামরিক জাতিতে পরিণত হলো দুনিয়ার ইতিহাসে যার নজির নেই। ভয়-ভীতি বলে কোন কিছুই তাদের মনে ছিলো না। তাদের সবাই জিহাদে যোগদান করার সুযোগ পেলে নিজেকে ধন্য মনে করতো। কখনও কাউকে কোন বিশেষ কাজ বা কারণ বশত অথবা মদীনা শহর রক্ষার জন্য জিহাদে যোগদান করতে নিষেধ করলে এটা তার বিশেষ বদনসীব বলে মনে করতো। এটা যে শুধু বয়স্ক পুরুষদের ভেতরই এক উগ্র প্রাণ-মাতানো উন্মাদনার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলো তা নয়, ছেলেমেয়ে, বালক-বৃদ্ধ, সমাজের সর্ব স্তরের, সর্ব শ্রেণীর লোকের ভেতর এমন এক অভূতপূর্ব প্রেরণার সৃষ্টি হয়েছিল, যার কথা ভাবলে সত্যি বিস্ময়কর মনে হয়। মা-ছেলেকে, বোন-ভাইকে, স্ত্রী-স্বামীকে, বাপ-ছেলেকে স্বহস্তে জিহাদী বেশে সজ্জিত করে জিহাদে যোগদান করার জন্য পাঠিয়ে দিতেন। জিহাদে যাবার সময় সবাই শহীদ হবার মনোভাব নিয়েই যেতেন। শহীদ হলে জীবন ধন্য মনে করতেন এবং তার আত্মীয়-স্বজন, বাপ-মা, ভাই-বোন, এমনকি স্ত্রীও আনন্দে উৎফুল্ল হতেন। অনেক স্ত্রী এবং মাকে তার ছেলে বা স্বামী শহীদ হয়নি শুনে মর্মাহত হয়ে ঘরে ফিরতে দেখা গেছে। কোথায় সে মা, সে বোন, সে স্ত্রী এবং সে বাপ—যারা এমনি করে ন্যায় ও সত্যের জন্য মানবতার কল্যাণ-সংগ্রামে স্বকীয় ছেলে, ভাই বা স্বামীকে হাসিমুখে জিহাদ করার জন্য এবং অন্যায়-অবিচার, অত্যাচার, উৎপীড়ন, অধর্ম, অসত্য, মিথ্যা, ফাঁকিবাজী, ধাপ্পাবাজী, আরামপ্রিয়তা, স্বেচ্ছাচারিতা, বিশ্বাসঘাতকতা, দুর্নীতি, ঘুষখোরী ও চোরাকারবারী প্রভৃতি সমাজবিরোধী কাজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য পাঠাবেন ? কোথায় সে ভাই, সে পুত্র, সে বাপ বা সে স্বামী যারা প্রিয়জনকে ত্যাগ করে ন্যায়, সত্য এবং মানব-কল্যাণের জন্য লড়াই করতে হাসিমুখে অগ্রসর হবে ?

মানুষের এরূপ মনোভাব একমাত্র দারুল-ইসলাম বা ইসলামী পরিবেশেই গড়ে ওঠা সম্ভবপর। বিরুদ্ধ পরিবেশে মানবের দেহ, মন, আত্মা ও মস্তিষ্কের চরম উন্নতি ও পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। মানুষ পরিবেশের দাস একথা

www.pathagar.com

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও স্বীকার করেন । তাই বিরুদ্ধ পরিবেশে পূর্ণ ইসলামী মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমাজ-বিধান গড়ে তোলা সম্ভব নয় । বিরুদ্ধ পরিবেশ বা দারুল হরবের পরিবর্তে ইসলামী পরিবেশ বা দারুল ইসলাম কায়েম করার জন্য প্রত্যেক মুসলমানকে জিহাদ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে । বস্তুত দারুল হরবে প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে জিহাদ করা প্রথম, প্রধান এবং অপরিহার্য কর্তব্য । আর জিহাদের অবস্থায় মুসলমানদের সামনে শহীদ বা মৃত্যু এবং গাজী বা বিজয়ী হবার প্রতিজ্ঞা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই—থাকতে পারে না । সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তা'আলার উপর অটল বিশ্বাস এবং মরার বা জয়লাভ করার উদগ্র বাসনা নিয়ে ন্যায়, সত্য এবং বিশ্বের সমষ্টিগত কল্যাণ সাধন করার জিহাদে অবতীর্ণ মুজাহিদদের পরাজিত করতে পারে এমন শক্তি কার বা কাদের আছে ?

তাই যেদিকে মুসলমানরা গিয়েছে সেদিকেই তাদের জয়লাভ হয়েছে । দেখতে দেখতে অতি অল্প সময়ের ভেতর সমগ্র দুনিয়াকে বিস্মিত করে আধা জাহানের উপর ইসলামী বিশ্বভ্রাতৃত্ব কায়েম সম্ভবপর হয়েছিলো একমাত্র এই জিহাদী বা সংগ্রামী মনোভাবের জন্য । জিহাদের প্রবৃত্তি এবং মনোভাব সবার ভেতর কি অভূতপূর্ব সাড়া এনে দিয়েছিলো এবং প্রাণমাতানো উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিলো; তা একটি সামান্য ঘটনা হতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে । একটি অপরিণত বয়স্ক বালক, জিহাদে যোগদান করার জন্য হযরত মুহম্মদ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হলো । মাপে প্রয়োজন মোতাবেক নয় বলে রসূলে করীম (সা) তাকে জিহাদে নেয়া চলবে না বলে নির্দেশ দিলেন । কিন্তু বালকটি জিহাদে যোগদান করার জন্য এমনি উতালা ও উৎসাহিত হয়েছিল যে, মাপে যাতে কম না হয় তজ্জন্য সে তার নিজের পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর করে দাঁড়ালো এবং এভাবে জিহাদে যোগদান করলো । একবার ভেবে দেখুন যদি এমনি জিহাদী বা সংগ্রামী মনোভাব আমরা জনসাধারণের ভেতর জাগরূক করতে পারি তাহলে কি অসাধ্য সাধনই না সম্ভব হবে । সব দেশের জনগণ এর জন্য তৈরী । এখন সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং শক্তিশালী আন্দোলনের মারফত এদের ভেতর সত্যিকার সংগ্রামী মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে হবে এবং ন্যায়, সত্য ও মানব-কল্যাণের সুমহান আদর্শে অনুপ্রাণিত করে ধীরে ধীরে কিন্তু সুনিশ্চিতরূপে মানবের ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতির সাধারণ নিয়মানুসারে চিরন্তন জিহাদ বা সংগ্রামের ভেতর দিয়ে সমগ্র বিশ্ব ও মানবগোষ্ঠীকে সমষ্টিগত সুখ, শান্তি, উন্নতি, প্রগতি, কল্যাণ, সমৃদ্ধি ও পূর্ণতা-প্রাপ্তির দিকে

www.pathagar.com

এগিয়ে নিতে হবে।

জিহাদের সাথে সাথে তাই আমাদের প্রচার করতে হবে—কি আমরা করতে চাই, কি আমাদের আদর্শ ? মুজাহিদ হিসাবে আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রভাবান্বিত নাফসানি বা স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক, ধনতান্ত্রিক, শোষণমূলক জরাজীর্ণ, ঘুণ-ধরা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র এবং তার পরিবেশকে ভেঙ্গে চুরমার করবো এবং মুবাল্লিগ বেশে আমরা গড়বো সত্যিকার মুসলিম বা শান্তিকামী এমন এক আদর্শ সমাজ ও পরিবেশ যেখানে দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন, অন্যায়-অবিচার, অত্যাচার-উৎপীড়ন চিরতরে বিদায় নেবে—সমগ্র দুনিয়ায় চিরন্তন ও চিরস্থায়ী সুখ ও শান্তি বিরাজ করবে—দুস্থ মানবতা হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচবে এবং ধীরে ধীরে পূর্ণতা-প্রাপ্তির দিকে এগিয়ে চলবে। এক কথায় মুজাহিদ বেশে ভাঙ্গবো আর মুবাল্লিগ বেশে গড়বো—এটাই হবে আজ প্রত্যেক মানুষের জীবনের মূলমন্ত্র।

এই ভাঙ্গা-গড়ার কাজ আবহমানকাল হতে চলে আসছে এবং যুগ যুগ ধরে চলবে। ভাঙ্গা-গড়ার এই চিরন্তন লড়াই—এটার নামই জিহাদ। সুতরাং ক্ষণস্থায়ী এবং কোন বিশেষ অবস্থা ও সময় ছাড়া জিহাদ জায়েজ নয় বলে মনে করে যারা নিশ্চেষ্ট হয়ে পরিবেশের উপর সবকিছু ছেড়ে দিয়ে বসে থাকে তারাই আজ দুনিয়ার এই চরম দুঃখ-দুর্দশা, দুর্গতি ও অশান্তির জন্য দায়ী। মানুষের মনের গভীরে অনুষ্ঠিত এবং এর বাইরের প্রকাশ সমাজ ও পরিবেশের ভেতর এই জিহাদ বা সংগ্রাম চিরন্তন। এর বিরাম নেই, শেষ নেই। রসূলে করীম (সা) বলেছেন ঃ 'জিহাদ সব সময়ই জারি আছে।' একটু গভীরভাবে এবং মনোনিবেশ সহকারে স্রষ্টা, সৃষ্টি, সৃষ্ট জীব এবং বিশেষ করে মানব-জাতির ক্রমবিকাশের ধারা সুনিপুণভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করলে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে, যে যুদ্ধ বিগ্রহ, বিবাদ, বিসম্বাদ, স্বার্থের সংঘাত ও শ্রেণীসংগ্রাম আমাদের চোখের সামনে প্রতিনিয়ত অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা হলো সত্যিকার জিহাদ বা সংঘাতের বাইরের প্রকাশ মাত্র। সত্যিকার জিহাদ হচ্ছে প্রত্যেকের মনে ভালমন্দ, শোষণ ও পোষণ, স্বার্থপর ও পরার্থপর এবং আত্মকেন্দ্রিক ও সমাজকেন্দ্রিক দু'টি প্রবৃত্তির ভেতর—দু'টি শ্রেণীর ভেতর নয়। মানুষের মনের গভীরে এবং সমাজ ও পরিবেশের ভেতর অনুষ্ঠিত মানুষের বাঁচার ও ক্রমবিকাশের এ চিরন্তন জিহাদ বা সংঘাতের চিরন্তন শান্তি বা সমন্বয় সাধনই—স্রষ্টা, সৃষ্টি ও ইসলামের মূল ও মুখ্য উদ্দেশ্য।

www.pathagar.com

এ চিরন্তন শান্তি বা সমন্বয় সাধনের জন্য প্রতিনিয়ত, প্রতি ঘটনায়, প্রতি অবস্থায়, প্রতি কাজে, প্রতি ক্ষেত্রে প্রাণপণ চেষ্টা, নিরবচ্ছিন্ন সাধনা এবং কঠোর সংগ্রাম করা, মানুষের প্রথম, প্রধান এবং অপরিহার্য কর্তব্য। কলেমার উপর বিশ্বাস স্থাপন, সালাত কায়েম, যাকাত দান, রোযা রাখা এবং হজ গমনের ভেতর ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে মানুষের জীবন ও জীবনাদর্শ সম্পর্কে গড়ে ওঠা মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে ভিত্তি করে আদর্শতম সমাজ, রাষ্ট্র ও মানবগোষ্ঠী গড়ে তুলতে হলে, জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে মুজাহিদ বেশে, যা-কিছু সম্বল তা নিয়েই কাজ শুরু করতে হবে, লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে চেষ্টা করতে হবে। কোন অবস্থায়ই মানুষ হতাশ হবে না, নিরাশ হবে না, ভয় পাবে না, ভীত হবে না। কারণ চেষ্টা, সাধনা ও সংগ্রাম করলে মানুষ যা-কিছু চায় তাই সে পেতে পারে। মানুষের কাছে অসম্ভব বলে কিছু নেই। কঠোর কর্তব্যপরায়ণ—নিঃস্বার্থ কর্মী এবং সংযমী আর ধৈর্যশীল মুজাহিদ হিসাবে সদা সর্বদা চেষ্টা, সাধনা ও সংগ্রাম করলে প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি কাজেই সে হবে জয়ী। এর সাথে চাই অবিভাজ্য মনোনিবেশ, গভীর একাগ্রতা, অনমনীয় সাহস, স্থির ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, তীব্র আকাংক্ষা এবং সবল ও সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস। সে নিজের উপর কোন অবস্থায়ই আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে না। পথ যতই দুর্গম হোক, পর্বতসম বাধা-বিঘ্ন আসুক, সারা দুনিয়া তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াক তবুও সে প্রাণপণ চেষ্টা, নিরবচ্ছিন্ন সাধনা এবং কঠোর সংগ্রাম করে সফলকাম হবে। সত্যের জয় হবে, সত্যের আলো দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়বেই—এ বিশ্বাস নিয়েই সে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে। মানুষ একবার যদি জিহাদের সত্যিকার অর্থ ও তাৎপর্য উপলব্ধি করে এবং নিজের ভেতরের সুপ্ত ও লুক্কায়িত প্রতিভাকে তার প্রতি কাজে পূর্ণভাবে বিকশিত করে স্বকীয় নাফস্ ও পরিবেশের সাথে অবিরাম চেষ্টা, সাধনা ও সংগ্রাম করে তাহলে ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে তার শক্তি ও প্রতিভার চরম বিশ্বাস সাধন হবে এবং দুনিয়ায় চিরন্তন সুখ ও শান্তি কায়েম হবে।

—সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য—

---

*'রব্বানিয়াৎ' নামক গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

www.pathagar.com

স্বীকার

১. 'দি হলি কোরআন' — আল্লামা ইউসুফ আলী
২. 'দি হলি কোরআন' — মওলানা মুহম্মদ আলী
৩. কোরআন শরীফ—মওলানা আকরম খাঁ
৪. বংগানুবাদ কোরআন শরীফ—মওলবী মুহম্মদ নকীবউদ্দীন খাঁ
৫. 'দি রিভলিউশনারী ক্যারেক্টার অব কলেমা'—আবুল হাশিম
৬. ইসলাম ও কমিউনিজম—কবি গোলাম মোস্তফা
৭. বিশ্বনবী—কবি গোলাম মোস্তফা
৮. 'প্যান-ইস্‌লামিজম এ্যাণ্ড বলশেভিজিম'—সৈয়দ মুসিহর হোসন কিদওয়াই
৯. 'এলামায়ে রব্বানিয়াৎ'—আল্লামা আজাদ সোবহানী ও আবুল হাশিম
১০. 'কুনিয়াতে দীন'—আল্লামা আজাদ সোবহানী
১১. 'দি রিলিজিয়ন অব ইসলাম'—মওলানা মুহম্মদ আলী
১২. 'আল-হাদিস' (মেস্‌কাতুল মুসাবিহ্‌)—এফ. করিম
১৩. 'ম্যানুয়াল অব্‌ হাদিস' — মওলানা মুহম্মদ আলী
১৪. 'ইকনমিক্‌স্‌ অব্‌ ইসলাম'—শেখ মাহমুদ আহমেদ
১৫. 'পাবলিক ফিন্যান্স'—এম. এ. সিদ্দীকী
১৬. 'ইস্‌লাম এ্যাণ্ড সোসালিজম'—মীর্জা মুহম্মদ হোসেন
১৭. 'প্রাক্‌টিস্‌ অব্‌ জাকাত' — মওলবী আলী নেওয়াজ
১৮. ইসলাম ও জেহাদ—কবি গোলাম মোস্তফা
১৯. 'দি রিকনস্ট্রাকসন অব রিলিজিয়াস থট্‌ ইন ইস্‌লাম'—ইকবাল
২০. 'দি মুজাদ্দিদস্‌ কনসেপসন অব তৌহীদ' — ডক্টর বুরহান আহমেদ ফারুকী, এম. এ. পি এইচ. ডি
২১. 'মুহম্মদ'—গোলাম সরওয়ার
২২. 'স্পিরিট অব্‌ ইসলাম' — সৈয়দ আমীর আলী
২৩. 'হিস্টরী অব্‌ দি স্যারাসিনস্‌'—সৈয়দ আমীর আলী
২৪. 'ক্যাপিটাল'—কার্লমার্কস্‌ ।
২৫. 'দি স্টরি অব ফিলসফি'—উইল ডুর‍্যাণ্ট

www.pathagar.com

২৬. 'দি হিস্টরী অব ওয়েস্টার্ন ফিলসফি'— রাসেল
২৭. মার্ক্সীয় দর্শন— সরোজ আচার্য
২৮. 'সোসাল থিংকিং' অধ্যাপক লেভি
২৯. শ্রীকৃষ্ণ— শ্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ
৩০. 'গীতা এক্সপ্লেইনড' মহারাজ
৩১. 'এসে অন্ গীতা'— শ্রী অরবিন্দ
৩২. গীতাঞ্জলী— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

ইফাবা—৯২-৯৩—প্র/২৯৯৮ (উ)—৫২৫০

www.pathagar.com